# প্রেয়সী

সুবোধ ঘোষ

ক্যালকাটা পাবলিশার্স
১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলিকাতা-১২

শ্রেয়সী ॥ সুবোধ ঘোষ

এই লেখকের

ভারতপ্রেম কথা

সু জা তা

পুরনো নামটা আজও আছে, যদিও পুরনো রূপটা আজ আর নেই। জায়গাটার নাম রসিকপুর; এবং কমল বিশ্বাসের এই বাড়িটা হলো রসিকপুরের সেই রাজবাড়ি; লোকের চোখে যে বাড়ি দু'শো বছরের একটা করুণ বিদ্রূপের অবশেষ বলে বোধ হয়। গলিত পলিত ও কুশ্রী; প্রকাণ্ড ধ্বংসস্তূপের মত দেখতে এই বাড়িকে রাজবাড়ি বললে ঠাট্টা করা হয়। পুরনো নামের জেরটুকু শুধু মর-মর হয়ে বেঁচে আছে। বাকি সবই প্রায় ধুলো হয়ে গিয়েছে।

ঠাকুরদালানের ভিতের গায়ে কষ্টিপাথরের উপর শ্লোক লেখা আছে, দু'শো বছর আগে বিশ্বাসকুলগৌরবমিহির দেবদ্বিজসেবা-পরায়ণ সৌভাগ্যলক্ষ্মীকরুণাকরচ্ছায়াসেবিত শ্রীঅনিরুদ্ধ বিশ্বাস এই রাজবাড়ি নির্মাণ করেছিলেন। রসিকপুরের সেই রাজবাড়ির অর্ধেক ইঁট কমল বিশ্বাসের বাপের আমলেই বিক্রি হয়ে গিয়েছে। ঐ যে যশোর রোড, যার উপর দিয়ে আজ ধাবমান অটোমোবিলের অবিরাম হর্নের শব্দ শোনা যায়, সেই রোডের উপরের আস্তরণ খুঁড়ে ফেললে আজও দেখা যাবে, রসিকপুরের ভাঙ্গা রাজবাড়ির ইঁট বিছাই হয়ে রয়েছে।

দূরে নয় যশোর রোড। দূরে নয় লোনা বাগজলা, যেখানে আজ কাচড়া দাম ঠেলে জলকরের জেলেরা ডিঙ্গি চালায়, আর জলের উপর লগির বাড়ি মেরে মাছের ঝাঁকগুলিকে খাটিয়ে ছুটিয়ে পুষ্ট ক'রে তোলে। নতুন নতুন অনেক কলোনি গড়ে উঠেছে সেই পুরনো রসিকপুরের আশে পাশে। কলোনির পথে পথে বিজলী বাতি জ্বলে; এমন কি ধানক্ষেতের উপর দিয়ে যে-সব

ছোট ছোট রাস্তা চলে গিয়েছে, তারও পাশে পাশে সরু লোহার খুঁটিতে বিদ্যুতের বাতি আলো ছড়ায়। রাতের বেলাতেও সখের মাছধরার দল পথের পাশের জলায় কচুরিপানা সরিয়ে কালো জলে ছিপ ফেলে বসে থাকে। চ্যাং মাছের দল টোপের গায়ে ঠোকর দেয়। কখনও বা বঁড়শি-গাঁথা হয়ে ছোট কেঠো ছিপের এক টানে উপরে উঠে আসে।

বেলগাছিয়া দূরে নয়, দমদমও দূরে নয়, পাতিপুকুরের বাগানবাড়িগুলি তো একেবারেই কাছে। আধুনিক কলকাতার ধোঁয়াটে বাতাসের চক্র থেকে খুব সামান্য দূরে এই রসিকপুরেও আজ তিনটি কারখানার চিমনি থেকে কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী সকাল-সন্ধ্যা বাতাস কালো করে। তবু পাখির ডাকের সাড়া আজও এখানে আছে। সকালে কোকিল ও কালো ময়না, দুপুরে ঘুঘু, আর শেষরাতে চোখ-গেল। পথের ধারে বুনো ফুলের গন্ধে আজও রাতের বাতাস ঝাঁজাল হয়। দমদমের হাওয়াই বন্দরের মাটিতে নামবার আগে বিমানগুলি ঠিক এই রসিকপুরের ধানক্ষেতের মাথার উপর এসে কাত হয়ে বাঁ-দিকে মোড় ঘোরে। বিমানের গম্ভীর গুঞ্জন হঠাৎ ছন্নছাড়া হয়ে আর বড় কর্কশ হয়ে রসিকপুরের কানে বাজে। ক্লান্ত মানুষের মাঝরাতের ঘুমের সুখ, কিম্বা অলস মানুষের হালকা দিবানিদ্রার সুখ, বিমানের ঐ কর্কশ শব্দের আঘাতে দুই সুখের আবেশই যখন তখন ভেঙ্গে যায়।

আষাঢ় মাসের শেষের দিকে যখন আকাশের মেঘ প্রথম গলে গিয়ে অঝোর ধারায় বৃষ্টি ঝরায়, আর ঠাণ্ডা বাতাসের ঝড়ে নারকেলের মাথাগুলি বেশ উতলা হয়ে দুলতে থাকে, সেই সময় এই ভাঙ্গা ময়লা ও শ্রীহীন বাড়িটাকেও বড় সুন্দর দেখায়। দিনের বেলায় এই বাড়িটা দেখলে পড়ো-বাড়ি বলে মনে হয়। বিশ্বাস হয় না, এই বাড়ির ভিতরে কোন প্রাণ বাস করে। একটা প্রাণহীন জীর্ণতার বিরাট স্তূপের মত পড়ে আছে বাড়িটা।

এদিকে ওদিকে ফাটল-ধরা এক একটা বারান্দার কিনারার থামগুলি দাঁড়িয়ে আছে। থামের মাথা থেকে ছাদের ভার খসে গিয়ে আর গুঁড়ো হয়ে নীচে ঝরে পড়েছে। ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইঁটের সেই সব স্তূপের উপর আগাছার ভিড় সবুজ হয়ে রয়েছে। সেই সবুজের মধ্যে রঙীন প্রজাপতির শরীর সন্ধান ক'রে বেড়ায় লিকলিকে চেহারার কালো সাপ।

দেখে বোঝা যায়; ওদিকে একটা নহবতখানা ছিল। নহবতখানার উপরটা একেবারে আধখানা হয়ে ভেঙ্গে গিয়েছে। সিঁড়িরও অর্ধেকটা নেই। সিঁড়ির পাশে আলকুশীর ঝোপ, তার কাছে একটা গভীর গর্ত। ভরা দুপুরে, যখন সব সাড়া শব্দ মরে গিয়ে বেশ একটা নিঝুম গম্ভীরতা চারদিকে থমথম করে, তখন একজোড়া খাটাসের মুখ ঐ গর্তের ভিতর থেকে বাইরে উঁকি দিয়ে অলসভাবে তাকিয়ে থাকে।

দেউড়িও ছিল, এবং মনে হয়, সেই দেউড়ির পাশে পাহারাদার পাইকদের কুঠুরি ছিল। দেউড়ির ফটকে দরজা নেই; পালেস্তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। কুঠুরিগুলির ভিতরে ভয়ানক মশার ভিড়, দিনের বেলাতেও সেই মশার ঝাঁকের তীব্র গুঞ্জন শোনা যায়।

বড় বড় ঘরগুলির এক একটা কংকাল শুধু দাঁড়িয়ে আছে। তার মধ্যেই মরা মানুষের মুখের হাসির মত হেসে রয়েছে এক একটা রঙীন ইঁটের চিহ্ন। নক্সা আঁকা আর ফুলবাহারের কাজ করা সেই সব ইঁট, যেগুলি একদিন এই সব ঘরের কার্নিশের শোভা হয়ে ফুটে থাকতো।

বাগানটার চেহারাই বা আকারে ও প্রকারে কি কম যায়? নেই নেই ক'রেও অনেক কিছু আছে। শুধু নারকেল আর সুপুরি নয়; বড় বড় কনকচাঁপা আছে। আছে বড় বড় অর্জ্জুনের সাদাটে ধড়; এখনও টান হয়ে সোজা দাঁড়িয়ে আছে গাছগুলি এবং সে

গাছে প্রথম বর্ষার জলে হাজার হাজার মঞ্জরীও মনের আহ্লাদে ভিজে যায়।

পুকুরটাও প্রকাণ্ড। শালুকের আশে পাশে জলপিপি ঘুরে বেড়ায়, কেয়ার ঝোপে ডাহুক ডাকে। ভাঙ্গা ঘাটের ইঁট দু'পাশের কাদার উপর পড়ে আছে। তবুও কয়েকটা সিঁড়ি আজও বেঁচে আছে। পুকুরের জলে বড় বড় চিতল হাবুডুবু খেয়ে আর ঘাই মেরে ঘুরে বেড়ায়। কুচো মাছের ঝাঁক ভয় পেয়ে ছটফটিয়ে শালুকের পাতার উপর আছড়ে পড়ে। হঠাৎ কোথা থেকে একটা মাছরাঙা এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে শালুক পাতার উপর ঠোকর হেনে পালিয়ে যায়।

অনেকগুলি বড় বড় আঙ্গিনা পার হয়ে একটা ছোট আঙ্গিনা, সেই আঙ্গিনার পাশে একটা দোলমঞ্চ আছে, এবং এখনো খুঁজলে এই দোলমঞ্চের কোন ফাটলে পুরনো দিনের আবিরের গুঁড়ো হয়তো দেখতে পাওয়া যাবে। এখানে এসে দাঁড়ালে বুঝতে পারা যায়, সত্যিই কয়েকটা প্রাণ আজও বাস করে এই বাড়িতে। এই আঙ্গিনার চারদিকের বারান্দাটা অটুট আছে। ঘরগুলির দরজায় আজও কাঠ আর চৌকাঠ আছে, এবং গৃহস্বামী কমল বিশ্বাস আজও এই আঙ্গিনার এক কিনারায় চৌকির উপর বসে আম-কাঁঠালের ছায়ার দিকে তাকিয়ে তামাক খান; হুঁকোর নলচে অর্ধেক আছে, অর্ধেক নেই!

ঠাকুরঘর নামে ছোট দালানটা এই বারান্দারই দক্ষিণ দিকে আজও দাঁড়িয়ে আছে, যদিও তার রূপ একেবারে অটুট আর অক্ষত নয়। ঠাকুর দালানের নাটমণ্ডপটি ভেঙ্গে ঝরে গিয়েছে। কিন্তু বিগ্রহের ঘরটা ভাঙ্গেনি। দালানের মেঝেটা বিক্ষত, পুরনো দিনের রঙীন পাথরের কুচিগুলি কে জানে কবে মেঝের বুক থেকে সরে গিয়েছে। ঠাকুর দালানের থামগুলি বড় মসৃণ, অনেক তেল-সিঁদুরের ছাপ আজও লেগে আছে। জ্যোৎস্নার রাতে এই

ঠাকুর দালানটাকে আজও বড় সুন্দর দেখায়। শুধু সুন্দর নয়, বড় মোহময়।

এই বাড়ির যিনি প্রভু, পয়ষট্টি বছর বয়সের ঐ কমল বিশ্বাস, তাঁর চেহারাটা বয়সের ভারে যত চিন্তার ভারে তার চেয়েও বেশি বুড়ো হয়ে গিয়েছে। আগে জ্যোৎস্নার রাতে তাঁর চোখে ঘুম আসতো না; আজকাল অন্ধকারের রাতেও হঠাৎ ঘুম ছেড়ে উঠে বসেন। নিজের হাতেই তামাক সাজেন। তারপর হয় আঙ্গিনার এক কোণে বসে, কিংবা ঘরেরই জানালার কাছে, কিংবা বাইরের বারান্দার উপরে বসে অপলক চোখ মেলে ঠাকুর দালানের ঐ থামগুলির দিকে তাকিয়ে থাকেন।

আজ কিন্তু সন্ধ্যা থেকেই ছটফট করছেন কমল বিশ্বাস। এবং একটু রাত হতেই ঘরের বারান্দা থেকে নেমে, অন্ধকার দিয়ে তৈরী একটা নীরব শ্বাপদের মত আস্তে আস্তে হেঁটে ঠাকুর দালানের বারান্দার উপরে এসে বসে পড়েন।

তবে কি তাঁর আহত জীবনের সব ক্ষতের জ্বালা নিয়ে, শেষবারের মত সব আক্রোশ নিয়ে এই ভাঙ্গা-বাড়ির অভিশাপকে একটা থাবা দিয়ে আঁকড়ে ধরে মরিয়ে দিতে চান কমল বিশ্বাস? নইলে আজ হঠাৎ এমন ক'রে রাতের শ্বাপদের মত ওৎ পেতে বসে থাকেন কেন?

কিংবা ঘুমিয়ে পড়তে চান? কমল বিশ্বাসের শ্রান্ত ক্লান্ত জীবনটা সব চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে এইবার জিরোতে চায়?

অথবা জাগা চোখেই একটা স্বপ্ন দেখতে চান কমল বিশ্বাস? ঠাকুর পদ্মনাভ ইচ্ছে করলেই তো আজ কমল বিশ্বাসকে একটা স্বপ্ন দিয়ে দেখিয়ে দিতে পারেন, ঐ তো ওখানে, যেখানে একটা শক্ত শাবল দিয়ে মাত্র চার হাত গভীর গাঁথুনি উপড়ে ফেললেই দেখা যাবে যে……।

চোখের উপর হাত বুলিয়ে ঠাকুরদালানের থামগুলির দিকে তাকিয়ে থাকেন কমল বিশ্বাস।

পর পর এবং দুই সারি অনেকগুলি থাম। মোট কুড়িটা। যেন পুরনো এক ইতিহাসের কোন প্রতিশ্রুতির দেহরক্ষীর মত নীরবে দাঁড়িয়ে রয়েছে থামগুলি। বাড়ির কর্তা কমল বিশ্বাস জানেন, এবং তাঁর স্ত্রী সুধাময়ীও জানেন, বিশ্বাস বংশের সেই বনেদি গর্বের এই ভাঙ্গাচোরা ও শ্রীহীন চেহারার বাড়িটা বাইরের লোকের চোখে যতই মূল্যহীন বলে মনে হোক না কেন, কিন্তু সত্যই মূল্যহীন নয়। এই ভয়ানক জীর্ণতা ও রিক্ততা বাড়িটার একটা ছদ্মবেশ মাত্র। বিশ্বাস বংশের সাতপুরুষ আগের সেই বিরাট সৌভাগ্যের কিছু সঞ্চয়, অন্তত পাঁচ কলস সোনার মোহর এই ঠাকুর দালানেরই কোন না কোন থামের বুকের ভিতর লুকনো আছে। আজ ঐ বিশ্বাস মশাই, কমলবাবু যাঁর নাম, যিনি প্রায় কুড়ি বছর আগে বুকের ব্যথায় কাহিল হয়ে দমদমের স্কুল-মাস্টারির কাজটাও ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছেন, তিনি নিজের কানে তাঁর ঠাকুরদাদাকে বলতে শুনেছিলেন, এই বাড়ির ইঁটের আড়ালে লুকানো সেই সোনার গল্প। কমলবাবুর বয়স তখন নিতান্তই অল্প, সন্ধ্যা বেলা ঠাকুরমা'র কোলের উপরে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন সেই দশ বছর বয়সের কমল বিশ্বাস। কিন্তু ঠাকুরদা'র গম্ভীর গলার স্বর শুনে ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল। ঠাকুরমা'র কাছে এসে চাপা গলায় বলছিলেন ঠাকুরদাদা—গল্প নয় গো গল্প নয়। একেবারে খাঁটি সত্যি কথা। পাঁচটি কলস ভরা সোনার মোহর এই থামগুলির কোন না কোন থামের কাছে মাটির নীচে লুকনো আছে। কিন্তু দুর্ভাগ্য এই যে···।

ঠাকুরমা বললেন—কি ?

ঠাকুরদা—সেই পুঁথিটাই হারিয়ে গিয়েছে, যে পুঁথিতে লেখা ছিল, ঠিক কোন্ দিকের কোন্ থামের কাছে, মাটির কত নীচে সোনাগুলি লুকনো আছে।

ঠাকুরমা—সত্যিই এরকম কোন পুঁথি ছিল তো ?

ঠাকুরদা—নিশ্চয়ই ছিল। আমিও ছেলেবেলায় দেখেছি, সেরেস্তা ঘরে একটা কুলুঙ্গিতে পেতলের তারে জড়ানো ছোট একটা পুঁথি ছিল। তা ছাড়া…।

ঠাকুরমা—কি ?

ঠাকুরদা—তা ছাড়া আমি কতবার স্বপ্ন দেখেছি, ঐ বিগ্রহ পদ্মনাভ বলেছেন, চিন্তা করিস না কালিদাস, তোর পাঁচপুরুষ আগের সৌভাগ্যের সোনা ঠাকুরদালানের থামের কাছেই আছে। আমি থাকতে কোন চোরের সাধ্যি নেই যে চুরি ক'রে নিয়ে যেতে পারবে।

আজকের কমল বিশ্বাসের বয়স পঁয়ষট্টি বছর হলেও দশ বছর বয়সে শোনা সেই গল্পটা আজও তিনি ভুলতে পারেন নি। তা ছাড়া কমল বিশ্বাসের বয়স যখন বাইশ বছর, যখন ঠাকুরদা আর ঠাকুরমা দুজনের কেউই আর এই জগতে ছিলেন না, তখন এক সন্ধ্যায় মা'র কান্নার শব্দ শুনে পা টিপে টিপে মা'র ঘরের কাছে গিয়ে আড়ালে দাঁড়িয়ে এই গল্পটাকেই আর একবার নিজের কানে শুনেছিলেন।

হঠাৎ বাবাকে চাকরিটা হারাতে হয়েছিল। বড় সাহেব রাগ ক'রে বাবাকে এক মাসের মাইনে দিয়ে হঠাৎ বিদায় ক'রে দিলেন। পঞ্চাশ টাকা মাইনের চাকরি, কিন্তু সেই চাকরিটাই যে সেদিনের এই বাড়ির সব প্রাণগুলিকে বাঁচিয়ে রাখবার একমাত্র উপায় ছিল।

মা'র মাথায় হাত বুলিয়ে বাবা কথা বলছিলেন—চিন্তা করবে না, ভাবনা করবার বা ভয় পাবার কিছু নেই। চাকরি গিয়েছে তো কি হয়েছে ? তার জন্যে আমরা কাঙ্গাল হয়ে যাব না।

—তার মানে ? আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করেছিলেন।

বাবা উত্তর দিলেন, আস্তে আস্তে চাপা গলায় গভীর বিশ্বাসের এক অদ্ভূত কাহিনী শোনালেন। ছ'পুরুষ আগের সৌভাগ্যের একটা কাহিনী, পাঁচ কলস সোনা ঠাকুরদালানের কোন থামের কাছে মাটির নীচে লুকিয়ে আছে।

এই গল্প গল্প নয়। তার প্রমাণ আছে। বাবা নিজের চোখে কতবার মাঝরাতের অন্ধকারের মধ্যেই দেখেছিলেন, ছায়ার মত কে যেন একজন মস্ত বড় বল্লম হাতে নিয়ে ঠাকুরদালানের বারান্দায় ঘুরে বেড়াচ্ছে।

—যদি অবস্থা সেইরকমই হয়, যদি দেখি টাকার অভাবে ছেলে মেয়েগুলোর পেটের ভাত যোগাড় হচ্ছে না, তবে···। বলতে বলতে বাবার চোখ ছুটো যেন দপ ক'রে জ্বলে উঠেছিল।—তবে ঠাকুরদালানের ঐ থামগুলিকে উপড়ে ফেলে···।

বলতে গিয়ে হঠাৎ থেমে গিয়েছিলেন বাবা। কেমন যেন বিমর্ষ হয়ে পড়েছিলেন। তারপর নিজের মনেই বিড় বিড় করেছিলেন—হ্যাঁ, একটা অসুবিধা অবশ্য আছে। ঠিক কোথায় যে সোনাগুলি লুকনো আছে তা তো জানা নেই। ঠাকুরদালানের সব থাম ভাঙ্গতে আর মাটি খুঁড়তে কম ক'রেও হাজার টাকা খরচ করতে হবে।

আরও কিছুক্ষণ চুপ ক'রে ভেবেছিলেন বাবা। তারপরেই আবার উত্তেজিত স্বরে বলে উঠলেন।—তার জন্যও ভাবনা করি না। দক্ষিণ দরজার বাগানটাকে বেচে দিয়ে অন্তত হাজার ছু-এক টাকা পাওয়া যাবে। তাই দিয়ে ভাগ্য পরীক্ষা করবো। সব থাম ভেঙ্গে ফেলবো।

মা আশ্বস্ত হলেন কিনা বোঝা গেল না, কিন্তু কমল বিশ্বাস দেখতে পেয়েছিলেন, বাবা তাঁর মনের পরিপূর্ণ বিশ্বাসের আবেগ তাঁর ছু' চোখের উপর ঢেলে দিয়ে ঠাকুরদালানের থামগুলির দিকে তাকিয়ে আছেন।

দক্ষিণ দরজার বাগানটা বেচবার জন্য চেষ্টা করবার আগেই মরে গেলেন বাবা। সেদিনের সেই বাইশ বছর বয়সের কমল বিশ্বাস তাঁর বাবার ঐ চোখের দৃষ্টি দেখে সত্যিই কোন বিশ্বাসের আবেগ গ্রহণ করতে পেরেছিল কি না, সে-কথা আজ আর মনে পড়ে না। কিন্তু আজকের কমল বিশ্বাস সন্দেহ করেন, হতেও পারে তো, একেবারে অবিশ্বাস করা উচিত নয়। বরং, জোর ক'রে বিশ্বাস করতেই চেষ্টা করেন, সাতপুরুষ আগের সৌভাগ্যের সোনা আজও হাতের কাছেই আছে। ভাবনা করবার কিংবা ভয় পাবার কিছু নেই। গল্পটা বোধহয় শুধু গল্প নয়।

অন্ধকারের রাতে অনেকবার ঠাকুরদালানের দিকে তাকিয়েছেন বিশ্বাস মশাই, আজকের কমলবাবু। কোন জায়গায় প্রহরীর দেহ দেখতে পাননি ঠিকই, কিন্তু অনুভব করেছেন, চারদিকের বাগানটাই যেন কেমনতর একটা আবেশে থমথম করে। জোনাকির দল ভুলেও ঠাকুরদালানের কাছে উড়ে আসে না। মাঝরাতে যদি ঝড় আসে, তবে এক গাদা আমের মঞ্জরী কিংবা বকুলের কুঁড়ি শুধু ছিটকে এসে ঠাকুরদালানের বারান্দায় ছড়িয়ে পড়ে। মনে হয়, চারদিকের গাছপালাগুলিও জানে, ঠাকুরদালানের এই বারান্দাটা হলো বিচিত্র এক সৌভাগ্যের কিংবদন্তী দিয়ে গাঁথা একটা স্বপ্নের বেদী।

এমন একদিন ছিল, যেদিন এই গল্পটাকে সোজা অবিশ্বাস করতেই কমল বিশ্বাসের ভাল লাগতো। বয়স তখন ত্রিশের বেশি নয়, সামান্য কিছু পুঁজি নিয়ে একটা রপ্তানি কারবারে নেমেছিলেন। এক বছরেই হাজার দশেক টাকা লাভ হয়েছিল। কী দুরন্ত খাটুনিই না খাটতে হয়েছিল! কিন্তু তবু জীবনটা একটুও ক্লান্তি অনুভব করেনি। বরং আরও বড় আশার জোর পেয়ে বুকের দম যেন বেড়ে গিয়েছিল। মনে হয়েছিল, ঐ সব সোনার কিংবদন্তী হলো দুর্বল মানুষের দুর্বল কল্পনার ছলনা।

যাক, সেদিন আর নেই। অতীতের সেই অহংকেরে অবিশ্বাস মরে গিয়েছে। আজ বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করে কমলবাবুর, বাপ-পিতামহের সেই বিশ্বাস অলীক নয়, অবাস্তবও নয়।

কিন্তু সাতপুরুষের জীবনের স্মৃতি আর সৌভাগ্যের কিংবদন্তী নিয়ে আজও এই ধ্বংসের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে ঐ যে ঠাকুরদালানের থামগুলি, তারা কি কমল বিশ্বাসের অদৃষ্টকে কোন দিন অনুগ্রহ করবে না? অনেকবার ইচ্ছা ক'রে স্বপ্ন দেখতে চেষ্টা করেছেন কমল বিশ্বাস, এবং বেশ সুন্দর একটা আশ্বাসের স্বপ্ন একবার দেখেওছিলেন। যদি টাকার অভাবে এই বাড়ির অদৃষ্টে কোনদিন কোন অপমানের আশংকা ঘনিয়ে আসে, তবে সেইদিন বিগ্রহ পদ্মনাভ করুণা করবেন। কোথায় লুকিয়ে আছে সাতপুরুষ আগের সঞ্চয় সেই সোনার মোহর ভরা কলস, তার সন্ধান পেয়ে যাবেন কমলবাবু, সন্ধান পাইয়ে দেবেন ঠাকুর পদ্মনাভ। ঠাকুরঘরের ভিতরে আজও রয়েছে, ঐ যে, সাতপুরুষের সেই গৃহদেবতা, আট ইঞ্চি লম্বা কষ্টি পাথরের ছোট মূর্তিটি।

আজ রাত জেগে ঠাকুরদালানের বারান্দার উপরে বসে এই কথাই ভাবতে থাকেন কমলবাবু; সেই আশংকা কি সত্যিই আজও ঘনিয়ে ওঠেনি? ঠাকুর পদ্মনাভ কি দেখতে পাচ্ছেন না, টাকার অভাবে এই বাড়ির সাতপুরুষের কঠিন গর্বের উপর যে একটা অপমানের আঘাত আছড়ে পড়বার জন্য উদ্যত হয়েছে?

ভাবনাগুলি মাথার ভিতরে বাজতে থাকে। চোখ দুটো অলস হয়ে মুদে আসতে থাকে। কমল বিশ্বাসের প্রাণটাও যেন সাড়া হারিয়ে এই রাতের স্নিগ্ধ অন্ধকারের মধ্যে ডুবে যায়।

রাজবাড়ির ভাঙ্গা ইঁটের স্তূপের উপর আলকুশীর ঝোপের আড়ালে তখন ঝিঁঝিঁর ডাক চড়া সুরে মুখর হয়ে উঠেছে। যশোর রোডের উপর দিয়ে মোটর গাড়ির চোখের আলোকের

ছুটাছুটিও অনেক কম হয়ে এসেছে। রাত এগারটা বোধ হয় বেজে গিয়েছে। দত্তবাগানের ব্রিজের উপর দিয়ে একটা মালবাহী ট্রেনের মন্থর ঘর্ঘর ধীরে ধীরে টেনে-টেনে চলে গেল আর মিলিয়ে গেল।

ধড়ফড় ক'রে নড়ে বসেন কমল বিশ্বাস। তন্দ্রাটাই হঠাৎ ছটফট ক'রে ভেঙ্গে গেল। দু'হাতে চোখ ঘষে আতঙ্কিতের মত গলার স্বর কাঁপিয়ে কমলবাবু ডাকেন—শিগগির এস সুধা। একটা কথা শুনে যাও।

ঘরের ভিতর থেকে আতঙ্কিতের মত উত্তর দেন সুধাময়ী—আসছি।

কমলবাবুর স্ত্রী সুধাময়ী, মোমের মত সাদা যাঁর শরীরের রং, এবং মোমের পুতুলের মত হালকা যাঁর চেহারা। সিঁথিতে বড় বেশি চওড়া করে সিঁদুর লেপে দেন, এবং চওড়া লালপেড়ে শাড়ি পরেন। কমল বিশ্বাসের বাপ চার বছর ধরে সারা নদীয়া আর যশোর ঢুঁড়ে ছেলের জন্য পাত্রী সন্ধান করতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত এই সুধাময়ীকেই পেয়েছিলে, কারণ সত্যিই দুধে-আলতা রং বলতে যা বোঝায়, সেই রকম রং ছিল সুধাময়ীর। আজ অবশ্য সুধাময়ীকে দেখে মনে হয় যে, দুধে আলতায় যেন প্রচণ্ড একটা ঝগড়া হয়ে গিয়েছে। দুধের সাদাটুকু মোমের মত সাদা হয়ে গায়ে ধরে আছে, এবং আলতার লালটুকু পালিয়ে গিয়েছে। সুধাময়ীর চুলেও পাক ধরেছে, কিন্তু কমলবাবুর মাথার মত সাদা হয়ে যায়নি। শাঁখা আছে সুধাময়ীর হাতে; ঢলঢল করে শাঁখা। মনে হয়, সুধাময়ীর রোগা রোগা দুটো হাত একসঙ্গে ঐ শাঁখার ভিতর দিয়ে পার হয়ে যেতে পারে।

ডাক্তার বলেছেন, এনিমিয়া। সুধাময়ীর শরীরে রক্তের ভয়ানক

অভাব ঘটেছে। অভিযোগটা ঠিকই। একেবারে রক্তশূন্য নয়। আজই সকালে ঘুঁটেওয়ালি যখন পাওনা পয়সা চাইতে এসে পয়সা পেল না, তখন কেমন যেন মুখ বেঁকিয়ে আর ভুরু পাকিয়ে আশ্চর্য হয়ে বলেছিল।—সে কি গো রাজবাড়ির বউ, সাত দিনের মধ্যে সাত আনা পয়সা দিতে পারলে না?

ঘুঁটেওয়ালির কথা শুনে সুধাময়ীর সেই মোমের মত সাদা মুখের চেহারাটাও হঠাৎ যেন লালচে হয়ে উঠেছিল, বোধ হয় বুকের ভিতরে এক ঝলক রক্ত লাফিয়ে উঠেছিল। হয় লজ্জা, নয় ধিক্কার, কিংবা নিজেরই উপর একটা অভিশাপের বর্ষণ; যে কারণেই হোক, আজও সুধাময়ীর সাদটে চেহারা মাঝে মাঝে যেন একটা আহত অভিমানের ব্যথায় লালচে হয়ে ওঠে। তাই সন্দেহ হয়, এখনও কিছু রক্ত আছে ঐ শরীরের ভিতরে।

ঘরের ভিতর থেকে বের হয়ে এলেন সুধাময়ী, এবং এত রাত্রে কমলবাবুর মুখ থেকে এত গম্ভীর একটা আহ্বান শুনতে পেয়েও কিছুমাত্র বিস্মিত হন না। সব সময় চিন্তা করছে, কপালের রেখা কুঁচকে রয়েছে, একটা বিনিদ্র মানুষের ডাক। প্রায় প্রতি রাত্রেই এইরকমই নিশির ডাকের মত একটা অপার্থিব ডাক শুনতে তাঁর অন্তরাত্মা অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে। কিন্তু কমলবাবুর গলা থেকে এরকম আতঙ্কিত স্বরের আহ্বান কোনদিন শুনতে পাননি সুধাময়ী। কেন ডাকছেন কমলবাবু, কিসের জন্য ভয় পেয়েছেন, অনুমান করতে পারেন না।

কমলবাবু তাঁর শীর্ণ মুখটাকে গম্ভীর ক'রে বললেন—একটা স্বপ্ন দেখলাম সুধা। মনে হচ্ছে, ঠাকুর পদ্মনাভই স্বপ্নটা দেখালেন।

সুধাময়ী চমকে ওঠেন—অলক্ষুণে স্বপ্ন নয় তো?

কমলবাবু—জানি না। মোটের ওপর বোঝা গেল, কমল বিশ্বাসের ওপর ঠাকুরের দয়া আছে।

সুধাময়ীর উদ্বেগ এইবার শান্ত হয়ে যায়। কমলবাবুর কথায় আশ্বস্ত হয়ে, আবার নিজেই কমলবাবুকে আশ্বাস দেন।—সে কথা কি আর বলতে হয়!

কমলবাবু—মনে হলো, কে যেন বলছে, তুই যা করছিস তাই করে যা কমল বিশ্বাস। সোনা-টোনার ভরসায় চুপ ক'রে বসে থাকিস না, তাহলেই ঠকবি।

বলতে বলতে হেসে ফেলেন কমলবাবু।—ভেবেছিলাম, রামকানাইকে না ঠকিয়ে অন্য কোন উপায় হয় তো হবে। কিন্তু হবে না সুধা। ঠাকুরের ইচ্ছেই যে তা নয়।

ভীরু চোখ তুলে তাকিয়ে গুনগুন করেন সুধাময়ী—যা ইচ্ছে হয় কর। আমাকে জিজ্ঞেসা করে লাভ কি?

চেঁচিয়ে ওঠেন কমলবাবু—বেশি ভালমানুষী দেখিও না সুধা। তোমার ছেলে আর মেয়ের মতলবের কাছে আমি হার মানবো না। আমি গরীব বলে আমার সাতপুরুষের সম্মান ওরা এত সহজে লোপাট ক'রে দেবে, সেটি হতে দিচ্ছি না।

ভয় পান সুধাময়ী, এবং সেই ভয় সহ্য করতে না পেরে হাঁসফাঁস ক'রে ভয়ে ভয়ে বলেন—কিসের মতলব? কি করেছে তোমার ছেলে আর মেয়ে? সাতপুরুষের সম্মান লোপাট ক'রে দেবে ওরা, কি ভয়ানক সন্দেহ করছো তুমি!

কমলবাবু—সন্দেহ নয়। আমি জানি।

সুধাময়ী—কি?

কমলবাবু—তোমার ছেলে আর মেয়ে দুজনই সর্বনাশের পথে যাবার জন্য তৈরী হয়েছে।

সুধাময়ী—কখ্খনো না। হতে পারে না। তুমি রাগের মাথায়⋯।

কমলবাবু—চুপ কর সুধা।

চুপ করেন সুধাময়ী। এবং কমলবাবুও তাঁর শীর্ণ মুখের

ভিতরে যেন এক ফালি হাসি গিলে ফেলে প্রশ্ন করেন—তুমি সোনার গল্পটাকে সত্যিই খুব বিশ্বাস কর সুধা ?

সুধাময়ী—তুমি বিশ্বাস কর বলেই বিশ্বাস করি।

কমলবাবু হাসেন—আমার বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয়েছিল, এই মাত্র। কিন্তু এইবার ঠাকুর যেন নিজেই জানিয়ে দিচ্ছেন যে, বিশ্বাস করবার দরকার নেই।

সুধাময়ী নীরব হন। কমল বিশ্বাসের গলার স্বর ঘড়ঘড় করে।—ত্রিশ বছর ধরে যা ক'রে এসেছি, তাই আবার করতে হবে। উপায় নেই সুধা।

সুধাময়ী—আমি বলি, তুমি আর এই ভাঙ্গা-কপাল সংসারের জন্য চিন্তা করো না। কোন চেষ্টাও করতে হবে না। যা হবার হয়ে যাক, তুমি জিরোও।

কমলবাবু—আমার কর্তব্য শেষ হোক, তারপর জিরোব। ভয় পেয়ে পিছিয়ে যাবার মানুষ আমি নই। তুমি জান, আমার বয়সটাই শুধু বুড়ো হয়েছে, আমার বুদ্ধি একটুও বুড়ো হয়নি।

সুধাময়ী—বুঝলাম না, কি করতে চাও তুমি ?

কমলবাবু—ওরা যেন ভাল থাকে, সে ব্যবস্থা করতেই হবে। ওদের ভাল করতেই হবে। যেমন করে পারি। টাকা পয়সা নেই বলে ঘাবড়ে যাবার মানুষ আমি নই।

সুধাময়ী—যা ইচ্ছে হয় কর। কিন্তু এখন শুতে যাও।

কমলবাবু—ভুলে যাচ্ছ কেন, আজই যে এলাহাবাদের পার্থবাবুর আসবার কথা।

হ্যাঁ, আজই সেই ভদ্রলোকের পৌঁছে যাবার কথা। এলাহাবাদ থেকে আসবেন ভদ্রলোক, সোজা আকাশপথে আসবেন, এবং যদি তেমন কোন অসুবিধা না হয়, তবে দমদম থেকে সোজা এসে এই বাড়িতেই উঠবেন। এলাহাবাদের পার্থবাবু; যাঁর ছেলে অজিতনাথ আজ পাঁচবছর হলো ফিলসফির প্রফেসর

হয়ে এখন পাঁচশো টাকা মাইনে পায়। রসিকপুরের বিশ্বাস বাড়ির অপূর্ব সুন্দরী মেয়েকে ছেলের বউ ক'রে নিতে রাজি হয়েছেন। কোন দাবি নেই, কিন্তু কমলবাবু নিজের ইচ্ছা মতোই যা কিছু দেবেন, তা যেন বিশ্বাস-বাড়ির বনেদি সম্মানের এবং পার্থবাবুর মত কুটুম্বের সম্মানের হানিকর না হয়।

কিন্তু এই দাবিহীন দাবির মূল্য যে অন্তত দশটি হাজার টাকা, এই বাস্তব সত্যটি অনুমান করতে পারেন কমলবাবু। চুপ ক'রে বসে ভাবতে ভাবতে এই বাস্তব সত্যটাও স্মরণ করতে পারেন যে, আজ এক বছরের মধ্যে একসঙ্গে এক'শো টাকার চেহারা দেখবারও তাঁর সুযোগ হয়নি। এবং ভাবী কুটুম্ব পার্থবাবু যদি সত্যিই এই রাত এগারটায় সোজা এখানে এসে ওঠেন, তবে তাঁকে সাধারণ ভদ্রতার রীতি অনুযায়ী দুটো ভাল জিনিস খাইয়ে আপ্যায়ন করবার জন্য অন্তত যে দশটা টাকা দরকার হবে, তা'ও হাতে নেই।

সত্যিই কি পার্থবাবু সোজা এখানে এসে উঠবেন? প্রশ্নটার কুলকিনারা করতে পারেন না কমলবাবু। চিন্তার ভারে মাথাটা যেন তাঁর হাতে ধরা হুঁকোর নলের উপর আরও অলস হয়ে নেতিয়ে পড়ে। বুকের ভিতর নিঃশ্বাসটাও ভয় পেয়ে ছটফট করে। আস্তে আস্তে একটা হাত তুলে, হাতের পাঁচটা শীর্ণ আঙ্গুল টান ক'রে চিরুনির মত টেনে টেনে মাথার সাদা চুলগুলিকে শুধু এলোমেলো করতে থাকেন কমলবাবু। বেলঘরিয়াতে পার্থবাবুর এক ভাগ্নে থাকে, মস্ত বড় তার বাড়ি। সেখানে গিয়ে উঠলেই তো পার্থবাবুর পক্ষে ভদ্রতার পরিচায়ক হয়।

সুধাময়ী—মনে হচ্ছে, পার্থবাবু আজ আর আসবেন না।

কমলবাবু—বেশ তো, না হয় কালই আসবেন। তার পর?

সুধাময়ী—তার পর আর কি? বাসুকে দেখুক, তারপর আশীর্বাদ করুক, তার পর···।

সুধাময়ীর মুখেই কথাটা আটকে যায়, এবং তিনিও বুঝতে পারেন যে, তারপরের সমস্যাটাই হলো আসল সমস্যা। বিয়ের খরচের জন্য অন্তত যে, হাজার দশেক টাকার দরকার হবে, সে টাকা আসবে কোথা থেকে?

কমলবাবু বলেন—এইবার বুঝতে পারছো তো সুধা, আগে অতীনের বিয়ে না দিলে বাসুর বিয়ে দেবার কোন উপায়ই হতে পারে না। আমার পথে এস এবার।

সুধাময়ী কমলবাবুর কাছে সরে এসে চাপা গলায় বলেন—একটু আস্তে কথা বল। অতীন বোধহয় এখনও ঘুমোয়নি। ওর কানে এসব কথা গেলে শেষে কোন উপায়ই আর করা যাবে না।

অতীনের কানে যেন কথাটা কোন মতেই না যায়। চাপা স্বরে আলোচনা করেন কমলবাবু ও সুধাময়ী। আলোচনাটা যেন ভয়ানক একটা ষড়যন্ত্রের মত ফিসফিস করে।

অনেক দিন থেকে, প্রায় এক বছর হলো অতীনের বিয়ের জন্য এক পাত্রীকে দেখে রাখা হয়েছে, পাত্রীর মামা রামকানাই বাবুর সঙ্গে অনেক আলোচনাও হয়েছে। টাকাপয়সা আছে রামকানাইবাবুর; সেগুন কাঠের কারবারী, খড়দহ গঙ্গার ধারে মস্ত বড় বাড়ি। এহেন বড়লোকের একমাত্র ভাগ্নী, কেতকী যার নাম, এই বছরেই বি-এ পরীক্ষা দেবে যে মেয়ে, তাকে ছেলের বউ ক'রে ঘরে আনতে বড় লোভ হয়, কারণ রামকানাইবাবু বলছেন যে, তিনি নগদে ও অলঙ্কারে দশ হাজার টাকা দেবেন। তা ছাড়া আর সব দান সামগ্রী তো আছেই।

সুধাময়ী বলেন—ওরা এত সহজে এরকম খরচ করতে রাজি হয়ে গেল কেন, তাই ভাবছি। ইচ্ছে করলে অতীনের চেয়ে ভাল পাত্র কি ওরা পেতে পারে না?

কমল বিশ্বাস হাসেন—না।

সুধাময়ী—তার মানে?

কমল বিশ্বাস—তার মানে, ওরা বিশ্বাস করেছে যে, রসিকপুরের এই ভাঙ্গা রাজবাড়ির সিন্দুকে এখনও নেই নেই ক'রেও দু' লাখ টাকার সোনা আছে, পাঁচ কলস মোহর মাটিতে পোঁতা আছে।

সুধাময়ী—কি আশ্চর্য, এরকম গল্প লোকে এত সহজে বিশ্বাস করে?

কমলবাবু আবার হাসেন। তীক্ষ্ণ হাসি, এবং অন্ধকারের মধ্যেও তাঁর চোখ দুটো যেন ধূর্তবিড়ালের চোখের মত জ্বল জ্বল করে। গলার একটা রুক্ষ কাশির শব্দ চেপে আস্তে আস্তে বলেন—বিশ্বাস কি করতো? বিশ্বাস করানো হয়েছে? বাগবাজারের ভটচাজ্জিকে দিয়ে গল্পটা ওদের কানে পৌঁছিয়ে দিয়েছি। বিয়ে যদি হয়, আর নগদে ও অলঙ্কারে সত্যিই দশ হাজার টাকা দেয়, তবে ভটচাজ্জিকে দু'শো টাকা দালালি দিতে হবে। ভটচাজ্জির সঙ্গে এই চুক্তি করতে হয়েছে।

শুনে স্তব্ধ হয়ে থাকেন সুধাময়ী, যেন তাঁর ঐ রোগা ও মোমের মত সাদা শরীরটা চমকে ওঠবারও শক্তি হারিয়েছে।

কমলবাবু—তা ছাড়া আর একটা খবরও ওদের জানিয়েছি। অতীন শিগগিরই এক বছরের জন্য বিলেত যাবে একটা পরীক্ষা দিতে। ফিরে এসে খুব ভাল মাইনের চাকরি করবে।

সুধাময়ী—এটা তো মিথ্যে কথা।

হঠাৎ রাগ করে চেঁচিয়ে ওঠেন কমলবাবু—হোক মিথ্যে কথা।

তারপরেই সাবধান হয়ে, এবং গলার স্বর নামিয়ে আস্তে আস্তে বলতে থাকেন কমল বিশ্বাস—ধরে নিলাম, এবাড়ির সোনা-টোনা সবই মিথ্যে। কিন্তু সোনার গল্পটা তো মিথ্যে নয়। আমি সেই গল্পটাকেই কাজে লাগিয়েছি। একটা গল্পের জোরে যদি এত বড় একটা কাজ হাসিল হয়, তবে সেটা কি আমার দোষ হলো সুধা? যারা বিশ্বাস করে, তারা দোষী নয়?

সুধাময়ী—ভগবান জানেন।

কমলবাবু—তাছাড়া, অতীন নিজেই একদিন আমার কাছে গল্প করেছে, এক বছরের জন্য বিলেতে থেকে তারপর একটা পরীক্ষা দিয়ে পাশ করতে পারলে ভাল চাকরি পাওয়া যেত। আমি রামকানাইকে ডাহা মিথ্যা কথা বলিনি সুধা।

সুধাময়ী—যাকগে, এখন কি ঠিক করেছ বল ?

কমলবাবু—ভাবছি, নগদ আরও একহাজার দাবি করবো। যদি আপত্তি করে তবে আর কিছু বলবো না। রামকানাইবাবুর ভাগ্নীর সঙ্গে অতীনের বিয়েটা চুকিয়ে দিতে চাই।

সুধাময়ী আবার হঠাৎ বোবার মত নীরব হয়ে কি যেন ভাবতে থাকেন। তার পরেই মনে হয়, তাঁর বুক ঠেলে ক্ষীণ পাঁজরগুলিকে কাঁপিয়ে একটা ফোঁপানির শব্দ ঠেলে ঠেলে উঠতে চাইছে।

কমলবাবু বিচলিত ভাবে প্রশ্ন করেন—কি হলো সুধা ? ওরকম করছো কেন ?

সুধাময়ী—মেয়েটি কি খুব কালো ?

কমলবাবু—হ্যাঁ···কিন্তু···তেমন কিছু নয়··কিইবা এমন কালো।

সুধাময়ী—নাক মুখ চোখ দেখতে কেমন ?

কমলবাবু—ভালই তো···তার···মানে···কিইবা এমন খারাপ ?

সুধাময়ী—স্বাস্থ্য ?

—ওঃ, চমৎকার স্বাস্থ্য। বলতে গিয়ে কমলবাবুর শীর্ণ গলার স্বর উল্লাসে যেন লাফিয়ে উঠে প্রশংসা করে।—এমন স্বাস্থ্য কদাচিৎ দেখতে পাওয়া যায়।

রাত দুপুরের নীরবতা আর অন্ধকারের মধ্যে ফাটলধরা বারান্দার এক কোনে বসে রসিকপুরের রাজবাড়ির এক অদ্ভুত চক্রান্তের পিতা ও মাতা তাঁদের রিক্ত ও নিঃস্ব সংসারের একটা অসহায়তার নিষ্পত্তি করবার মত একটা উপায়

খুঁজে বের করেন। রাজি হয়েই আছেন কমলবাবু, রাজি হন সুধাময়ী। আগে অতীনের বিয়ে দিয়ে টাকা যোগাড় করা হোক, তারপর সেই টাকা দিয়ে বাসুর বিয়ের খরচ মেটানো যাবে। যদি কাল আসেন পার্থবাবু, আসবেন নিশ্চয়, তবে একেবারে দিন ঠিক করেও ফেলতে হবে।

সুধাময়ী বলেন—যাক, সমস্যা মিটে গেল, এবার শুতে যাও।

কমল বিশ্বাসের গলার স্বর রুষ্ট সরীসৃপের নিঃশ্বাসের মত ফোঁস ক'রে বেজে ওঠে—না।

সুধাময়ী—কেন?

কমলবাবু—সমস্যা মিটে যায় নি।

সুধাময়ী—কিন্তু এখানে শুধু বসে থেকে···।

কমল বিশ্বাস—হ্যাঁ, এখানেই আজ আমাকে শ্মশান-পিশাচের মত জাগা চোখ নিয়ে বসে থাকতে হবে।

রসিকপুরের ভাঙ্গা রাজবাড়ির চারটি প্রাণের মধ্যে দুটি প্রাণ এই মাঝরাতের প্রহরে জাগা চোখে ষড়যন্ত্র করে, এবং আর দুটি প্রাণ তখন অন্য দুটি ঘরের ভিতরে গভীর ঘুমে স্বপ্ন দেখছে। কমলবাবু আর সুধাময়ী, বাপ ও মা, দুজনেই জানেন, কেমন ওদের স্বপ্ন। এবং জানেন বলেই আবার দু'জনের কপালে চিন্তার রেখা কুঁচকে ওঠে।

আজে বাজে কোন মেয়েকে বিয়ে করতে রাজি নয় অতীন। এবং বাসনা অর্থাৎ বাসুও সে-রকম মনের মেয়ে নয়, যে-মেয়ে একটা আজে-বাজে মানুষকে স্বামী হিসাবে পেলে সেই অদৃষ্টকে শান্তভাবে মেনে নেবে কিংবা সুখী হবে। কমলবাবু জানেন, সুধাময়ী জানেন, তাঁদের ছেলে আর মেয়ে দুজনেই তাদের জীবনের সব চেয়ে বড় যে সাধের স্বপ্ন পুষে রেখেছে

সে স্বপ্নের মধ্যে কোন নিঃস্ব রিক্ত দরিদ্র ও কুশ্রী মানুষের ছায়াও নেই। মনের মত না হলে ঐ দু'জনের কেউই বিয়ে করবে না। ওদের শিক্ষা, ওদের রুচি, ওদের আশা আর স্বপ্ন, সবই এমন কাউকে বরণ করে নেবার জন্য তৈরী হয়ে আছে, যাকে বরণ করতে পারলে, ওরা মনে করে, ওদের রূপের গুণের আর স্বপ্নের অসম্মান হবে না।

বাসনা দেখতে সুন্দর, বেশ সুন্দর। লেখা-পড়ার দিকে ঝোঁকও আছে খুব বেশি। থাকলে হবে কি? ঐ ম্যাট্রিক পাশ করবার পর মাত্র পাঁছটি দিনের মত কলেজে পড়বার সুযোগ হয়েছিল। তারপর আর নয়।

একদিন কলেজ থেকে ফিরে এসে, এবং মনে মনে নিজের জীবনটাকেই ধিক্কার দিয়ে বিছানার উপর লুটিয়ে পড়েছিল বাসনা। সেদিনই কলেজে পড়বার আশা মন থেকে উপড়ে ফেলে দিতে হয়েছিল। কারণ? কলেজে যাবার মত সাজ করবার, অর্থাৎ ভাল একটা রঙীন শাড়ি পরবারও সামর্থ্য নেই যে মেয়ের, সে মেয়ের পক্ষে কলেজে পড়া উচিত নয়। ক্লাসেরই কোন্ এক বান্ধবী একটা ঠাট্টা করেছিল, এবং সেই ঠাট্টা সহ্য করতে পারেনি বাসনা।

—শুনেছি, তুমি নাকি রসিকপুর থেকে পড়তে আস?

বাসনা বলে—হ্যাঁ।

—এত দূর থেকে?

—হ্যাঁ, তবে মোটর বাসে এলে সামান্য দূরে কিই বা আসে যায়?

—বাসে চড়ে আসো নাকি?

—হ্যাঁ।

—কি আশ্চর্য, আমি মনে করেছিলাম, নিজেদের মোটর গাড়িতে আসো।

—ভুল মনে করেছিলে।

—তাই তো···।

—কি ?

—এখন বুঝতে পারছি, রসিকপুরের রাজবাড়ির মেয়ে কেন এরকম একটা···।

—কি ?

—সত্যি ভাই, এরকম একটা বাজে, তা'ও আবার আধময়লা শাড়ি তোমাকে একটুও মানায় না।

এই ঘটনার বয়সটাও প্রায় সাত বছর। আজ বাসনার সুন্দর চেহারাটা পঁচিশ বছর বয়সের সীমানা পার হয়ে ছাব্বিশে পা দিয়ে যেন আরও সুন্দর হয়ে আর ভরাট হয়ে রূপের জ্যোৎস্না ছড়ায়। ভাঙ্গা রাজবাড়ির পুকুরের ভাঙ্গা সিঁড়ির কাছে যখন একলা বসে কাপড়-চোপড় সাবানকাচা করে বাসনা, তখন ওর চেহারাটাকে আরও অদ্ভুত দেখায়। হঠাৎ মনে হয়, যেন পুরাকালের কোন রাজপুত্রীকে কেউ চুরি ক'রে নিয়ে এসে এখানে দাসী ক'রে রেখেছে।

শুধু মনে হবে কেন ? এইরকম একটা কথা একদিন মুখ খুলে বলেই ফেলেছিলেন মনুমাসি, সুধাময়ীর বড়দি। পূজার সময় একদিনের জন্য এই রসিকপুরে বেড়াতে এসে বোনের একমাত্র মেয়ে এই বাসনার দশা দেখে আক্ষেপ করেছিলেন মনুমাসি, এত রূপ, এমন সুন্দর মেয়েটা, সত্যিই সুধা, তোদের ঘরে এই মেয়েকে পাঠিয়ে বড় ভুল করেছেন ভগবান।

মনুমাসির কথা শুনে চমকে উঠেছিল বাসনা, এবং ঘরের ভিতরে এসে দরজা বন্ধ করে অনেকক্ষণ ধরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের এই চেহারাটাকেই দেখেছিল। এবং মনুমাসির কথাগুলিকে স্মরণ করতে গিয়ে বুঝতে পেরেছিল বাসনা, ভগবানও অবিচার করেন।

মনে মনে অস্বীকার করেন না সুধাময়ী, যদিও বড়দির অভিযোগটা সহ্য করতে গিয়ে তাঁর মোমের মত সাদা চেহারাটা থর থর করে কেঁপে ওঠে আর মুখের উপর একটা লালচে জ্বালা ফুটে ওঠে। কিন্তু বড়দি তো অন্যভাবেও কথাটা বলতে পারতেন! যদি মেয়েটাকে এতই সুন্দর করেছিলেন ভগবান, তবে এই বাড়ির সিন্দুকে বিশটা হাজার টাকাও জমতে দিলেন না কেন? তা হলে তো বাসনাকে আজ আর পুকুরঘাটে বসে কাপড় কাচতে হতো না। এইখানেই তো অবিচার হয়েছে। এরকম ভয়ানক একটা দারিদ্র্য দিয়ে এই সংসারটাকে এত বড় শাস্তি ভগবান কেন যে দিচ্ছেন, এবং তাতে ভগবানের কি যে লাভ হচ্ছে, এই প্রশ্ন না ক'রে বড়দি সোজা এই বাড়ির দারিদ্র্যকে ধিক্কার দিয়ে বসলেন।

বড়দির কথা ছেড়েই দেওয়া যাক, তিনি এই বাড়ির দীনতা আর রিক্ততার উপর যত খুশি ইচ্ছে রাগ করতে পারেন, কারণ তিনি নিজে শুধু তাঁর টাকার জোরেই তাঁর পাঁচটি কালো-কালো, রোগা-রোগা আর বেঁটে-বেঁটে মেয়েকে বড়-বড় ঘরে বিয়ে দিতে পেরেছেন। তাঁর পাঁচটি জামাই যেমন ভাল রোজগেরে, তেমনি দেখতে সুন্দর। কিন্তু···কিন্তু সুধাময়ী জানেন, এবং কমলবাবুও তাঁর এই জীবনটাকেই চোরের মত অপরাধী বলে মনে করেন, কারণ তাঁদের ছেলে আর মেয়েও যে এই বাড়ির দারিদ্র্য এবং এই শ্রীহীন ভাঙ্গা-চোরা অদ্ভুত দশার উপর রাগ আর অভিমান করতে একটুও দ্বিধা করে না।

শ্রাবণের ধারায় স্নান ক'রে রসিকপুরের এই রাজবাড়ি যতই স্নিগ্ধ হয়ে উঠুক না কেন, এই বাড়ির মেয়ের নতুন চোখে এই বাড়ির জন্য কোন স্নিগ্ধতার আবেশ জাগে না! ভাঙ্গা

ইটের কতগুলি স্তূপের জন্য কতটুকুই বা মায়া থাকতে পারে? এই ভাঙ্গাবাড়িটা যে অহরহ একটা দীনতার জীবন, মন্দ ভাগ্য আর রিক্ততার দুঃখ স্মরণ করিয়ে দেয়। ক্ষমা করতে পারে না সহ্য করা দূরে থাক; চলে যেতে হবে, আর বেশি দিন এই অভিশপ্ত সংসারের কুঠুরির মধ্যে পড়ে থাকতে হবে না, এই আশা নিয়ে বড় হয়ে উঠেছে, এই বাড়ির মেয়ের জীবন। কিন্তু এই আশাটাও যে একটা ছলনা। মেয়ের বিয়ে দেবার সাধ্য নেই এই বাড়ির বাপের।

ছেলেবেলার কথা ধরতে নেই, তখন এই আলকুশীর ঝোপের কাছে কাদা ভরা গর্তের মধ্যে লুকিয়ে থাকা গোসাপটাকেও দেখতে কত ভাল লাগতো। চৈত্র মাসের সন্ধ্যায় কনকচাঁপা ঝরে পড়তো মাটিতে, খুবই ভাল লাগতো সেই ফুল কুড়িয়ে নিয়ে পূজো পূজো খেলা করতে। আজও তো সেইরকমই সবুজ টিয়ার ঝাঁক এসে বাগানের পেয়ারা খেয়ে চলে যায়, এবং দেখতে যদিও আজ একটুও ভাল লাগে না, কিন্তু একদিন দু'চোখ ভরে দেখে দেখেও যে মনের সুখ পূর্ণ হতো না। কিন্তু এই সবই শৈশবের একটা বোকা মনের ভালোলাগার ব্যাপার। সত্যি কথা হলো, আজ বেশ একটু ঘৃণাই হয়। গান এত ভালবাসে যে বাসনা, এবং ছেলেবেলাতে গলা খুলে কতই না গান এই ভাঙ্গা বারান্দায় বসে যে মেয়ে গেয়েছে, সে মেয়ে আজ আর ভুলেও কোন গান গায় না। আকাশে সোনার থালার মত চাঁদ জেগে উঠলেও না, কিংবা হেমন্তের ভোরের আকাশে সিঁদুরে রং সোনালী হয়ে উঠলেও না। বাসনার চেহারা, বাসনার বয়স, বাসনার নিঃশ্বাসগুলিও যেন অভিমানে ও অভিযোগে ক্ষুব্ধ হয়ে রয়েছে।

বাসনার মুখ থেকে এমন কথাও হঠাৎ এক-এক সময় যেন রুষ্ট ধিক্কারের মত ফেটে পড়েছে—শুনেছি আগে নাকি

মেয়েকে আঁতুড় ঘর থেকেই তুলে নিয়ে গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দেবার নিয়ম ছিল মা ?

সুধাময়ী ভীতভাবে বলেন,—হ্যাঁ, গল্পে পড়েছি, ঐ রকম কুসংস্কার অনেক মানুষ মানতো।

বাসনা বলে—তোমাদের কালে নিয়মটা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল কেন ?

সুধাময়ী—তার মানে ?

বাসনা—নিয়মটা থাকলে ভালই ছিল।

সুধাময়ী বলেন—বলে নে, যা মন চায় তাই বলে নে বাসু, ভিখিরীর মত গরীব বাপ-মা পেয়েছিস, তাই কথাগুলি এত সহজে বলতে পারলি।

এহেন অভিমানিনী মেয়েকে যোগ্য পাত্রের হাতে সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্ত হবার মত একটা উপায় এতদিনে খুঁজে পাওয়া গিয়েছে। তবু কমল বিশ্বাস ছটফট করছেন কেন ? এবং রাত জেগে বসে থাকেন কেন ?

সুধাময়ী বলেন—রাত হয়েছে, এবার শুতে যাও। আর চিন্তা করবার কিছু নেই।

কমলবাবু হাসেন—তুমি অনেককিছু জেনেও অনেক কিছু জান না সুধা, তাই তোমার পক্ষে আমার মত রাতজাগা পিশাচের মত প্রতিজ্ঞা নিয়ে বসে থাকবার আর চিন্তা করবার দরকার হয় না। তাই ওকথা বলতে পারছো।

সুধাময়ী আতঙ্কিতের মত তাকান—কি জানি না ?

কমলবাবু—আমার বিশ্বাস, আজই রাত্রে তোমার বড় ননদের সেই সুপুত্রটি, সেই রতন এখানে চুরি করবার জন্য গাড়ি নিয়ে হাজির হবে।

ভয় পেয়ে ডুকরে ওঠেন সুধাময়ী—রতন ? রতন কেন আসবে ? এখানে এসে কি চুরি করবে রতন ?

কমলবাবু—তুমি কি স্বপ্নেও ভাবতে পার যে, একবছর ধরে রতনের কাছ থেকে তোমার মেয়ের কাছে চিঠি আসছে, আর তোমার মেয়েও খুশি হয়ে রতনের চিঠির উত্তর দিচ্ছে ?

আরও আতঙ্কিত হয়ে চেঁচিয়ে ওঠেন সুধাময়ী—রতন ? কি সর্ব্বনাশের কথা ! রতন যে বাসুর আপন পিসতুত দাদা হয় সম্পর্কে ; ছাব্বিশ বছরের ধিঙ্গি মেয়ে কি তা জানে না ?

চোখ ছলছল করেন সুধাময়ী এবং একই সুরে আবার আক্ষেপ করেন—রতনকেও বলিহারি, পাগলেরও এমন চরিত্র হয় না। ছি ছি।

কমলবাবু—ছি ছি কর তোমার মেয়েকে, যে মেয়ে পাগল হয়েছে ; প্রতিজ্ঞা ক'রে রতনকে চিঠি দিয়েছে যে, রতন যদি ওকে বিয়ে করতে রাজি না হয়, তবে আত্মহত্যা ক'রে ভালবাসার অপমানের জ্বালা দূর করবে।

—ছি-ছি-ছি। বলতে বলতে আঁচল তুলে চোখ মোছেন সুধাময়ী।

কমলবাবু—রতন কি করে জান তো ?

সুধাময়ী—না।

কমলবাবু—চা-বিস্কুটের একটা দোকান করেছে। তাতে কি রোজগার হয় জানি না। কিন্তু রেস খেলে মাঝে মাঝে টাকা পায়, আর সাহেবী সাজ সেজে একটা মোটর সাইকেলে ঘুরে বেড়ায়।

সুধাময়ী—এত অহংকেরে মেয়ে, গরীব লোককে এত ঘেন্না করে যে মেয়ে, তার মনের এ দশা হলো কেমন ক'রে, আশ্চর্য।

কমলবাবু—আমি একটুও আশ্চর্য হয়নি সুধা। আমার চেয়ে একটু কম গরীব হলেই বড়লোক হয়ে গেল। অন্তত তোমার মেয়ে বোধ হয় তাই মনে করে। তা না হলে···।

সুধাময়ী—কি ?

কমলবাবু—একটা চিঠিতে বাসুকে ভালবাসা জানিয়ে রতন লিখেছে, তোমার জন্য একটা উপহার কিনেছি বাসনা। এক শো ছাপ্পান্ন টাকা দাম, একটা সোনার হেয়ারপিন, সুন্দর দুটি বর্মা রুবি বসানো। আমি চাই নিজের হাতে এই হেয়ারপিন তোমার খোঁপায়···বল কবে আসবে আমার উপহার নিতে।

সুধাময়ী—আবার গলার স্বর চেপে গুনগুন ক'রে কাঁদতে থাকেন। কমলবাবু বলেন—এখানে থেকে আমাকে বিরক্ত না ক'রে তুমি বরং শুতে যাও।

সুধাময়ী বলেন—না।

ছেলে অতীন বিশ্বাসও কি তার এই সাতপুরুষের ভিটাকে কোনদিন ভাল চোখে দেখতে পেরেছে? কোনদিনও না, ছেলেবেলার কথা অন্য কথা, তখন এই ভাঙ্গা বাড়ির একটা কাঠবিড়ালীকেই কত বড় সম্পদ বলে মনে হতো। কিন্তু আজ এই প্রকাণ্ড ও প্রায় ধ্বংসস্তূপের মত দেখতে, আধ-মরা ও আধ-বাঁচা বাড়িটাকে একটা শ্মশানের টুকরো বলে মনে হয়। যেন একটা আপমানের কুণ্ড, আর বেশি দিন এখানে থাকলে অতীন বিশ্বাসের মত শিক্ষিত ও সুন্দর চেহারার জীবন যেন জোঁক আর শেওলার কামড়ে পচে যাবে। রসিকপুরের রাজবাড়ির ছেলে, এই পরিচয়টা কারও কাছে প্রকাশ করাই একটা অপমান। শুনলেই লোকের চোখে যেন একটা ঠাট্টার আমোদ চমকে ওঠে। লোকে জানে, রসিকপুরের রাজবাড়ির বর্তমান মালিক যিনি, তিনি হলেন দমদমের এক স্কুলের প্রাক্তন মাস্টার, যিনি বেশ মোটা একটা ফাণ্ডের হিসেব গোলমাল ক'রে দিয়ে, আর বুকের ব্যথার ছুতো ক'রে কাজ ছেড়ে দিয়েছিলেন। দমদম আর ব্যারাকপুরের আদালত মহলে ঐ কমল বিশ্বাসকে কে না চেনে? এমন চমৎকার মিথ্যে সাক্ষী আলিপুরের বটতলাতেও পাওয়া যায় না। পুরো পনরটা

বছর শুধু এই চমৎকার মিথ্যে সাক্ষীর কারবার ক'রে বেশ দু'পয়সা রোজগার করেছেন। কিন্তু এখন আর পারেন না, কারণ বয়সের জন্য লোকটার স্মরণশক্তি ঢিলে হয়ে গিয়েছে। কিন্তু তা বলে দমে যান নি। আজও শুধু ধার আর ধূর্ততা করে পেট চালিয়ে যাচ্ছেন।

কমল বিশ্বাসের ছেলে বলে নিজের পরিচয় দিতেও বাধে, এবং অতীনের মত ছেলের মনের এই বাধাটাকে নিন্দা করা যায় না। সত্যিই, দু'টো টাকা বাগাবার জন্য কি না করতে পারেন কমল বিশ্বাস? এত বয়স হয়েছে, বয়সের ভারে জীর্ণ হয়ে গিয়েছে শরীরটা, মাথার সব চুল সাদা, তবু যে-কোন মিথ্যা কথা অক্লেশে বলে দিতে বুড়োমানুষটার বিবেকে একটুও বাধে না। বিবেক আছে কি? সন্দেহ করে অতীন। লজ্জা অনুভব করতে হয়, এবং মাঝে মাঝে একলা ঘরের নিভৃতে যখন নিজের জীবনের আশা ভরসাগুলির হিসেব নেবার চেষ্টা করে অতীন, তখন লজ্জা পায়। তার শিক্ষা বিদ্যা ও ত্রিশ বছর বয়সের এই শরীরটাও যে এই বাড়ির ত্রিশ বছরের ধূর্ততা নীচতা দীনতার কাছে ঋণী। এম-এ পাশ করেছে অতীন এবং আজ একটা চাকরিও করছে। কিন্তু মাঝে মাঝে গভীর ক্ষোভের জ্বালায় মনের ভিতর যেন একটা বিদ্রোহ জ্বলে ওঠে—এমন লেখা-পড়া না শেখাই উচিত ছিল।

অতীনের পড়ার খরচ যোগাড় করবার জন্য ঐ কমল বিশ্বাস কিনা কাণ্ড করেছেন! শুধু প্রতিবেশীদের কাছে নয়, দূর-সম্পর্কের আত্মীয় আর কুটুম্বদের কাছে গিয়েও একটা মস্ত গল্পের ফাঁদ পেতে কিছু টাকা হাতড়ে নিয়ে এসেছেন। ঐ যে, যে মনুমাসি সেদিনও একবার এসে ঘুরে গিয়েছেন, তিনিও রেহাই পাননি। অতীনের ম্যাট্রিক পরীক্ষার সময় ফী যোগাড় করবার ধান্দায় এদিক-ওদিক দুদিন ঘোরাঘুরি ক'রে আর ব্যর্থ হয়ে সোজা

মন্নুমাসির কাছে গিয়ে একটা গল্প ফেঁদেছিলেন কমলবাবু—ব্যারাকপুরে এক সাহেবের সুন্দর একটা বাড়ি বড় অল্প দামে বিক্রি হয়ে যাচ্ছে বড়দি। বাজার দর অনুসারে ষোল হাজার টাকা দাম হয়। কিন্তু সাহেব আমাকে বলেছেন, মাত্র পাঁচ হাজার পেলেই তিনি খুশি। বাড়িটা আপনার জন্য ধরে রাখবো নাকি বড়দি ?

মন্নুমাসি চেঁচিয়ে ওঠেন—নিশ্চয়, নিশ্চয়।

—তাহলে কিছু বায়না করুন। অন্তত শ পাঁচেক টাকা।

মন্নুমাসির কাছ থেকে সেই যে পাঁচ'শ টাকা হাতে নিয়ে চলে এলেন কমলবাবু, তারপর থেকে এই সাতবছরের মধ্যে মন্নুমাসি তাঁর টাকা আর ফেরত পেলেন না। সাহেবটাই ঠগ, টাকাটা বাগিয়ে নিয়ে হঠাৎ বিলেত চলে গেল, এই মিথ্যা গল্পের জোরে এবং সাত বছর ধরে শুধু আক্ষেপ ক'রে ক'রে মন্নুমাসিকে ভুলিয়ে রেখেছেন কমলবাবু।

এই তো রসিকপুরের রাজবাড়ির বাপ। এহেন মানুষের উপর অতীনের মত ছেলের পক্ষে কতটুকুই বা শ্রদ্ধা থাকা সম্ভব ?

শ্রদ্ধা দূরে থাক, আজ যে সত্যিই এহেন মানুষকে বেশ ভয় করতে হচ্ছে। কারণ, আজ অতীনের জীবনটাই কমল বিশ্বাসের দাবির সম্মুখে এসে পড়েছে। বড় কঠোর দাবি। এতদিন ধরে খাইয়ে-পরিয়ে মানুষ করেছি, এখন ঋণ শোধ কর, দাবিটা সোজা কথায় এই রকমেরই। বড় হয়েছে, চাকরি করছে অতীন, এই সবই যে এই ভাঙ্গাবাড়ির একটা ধূর্ত অন্তরাত্মার স্বার্থপর করুণার কীর্তি। এবং, সত্যিই, অতীনের চাকরির দুটো মাস পার হতে না হতে সোজা দাবি ক'রে বসে আছেন কমলবাবু, এইবার যেমন করে পার বাসুর বিয়ের খরচটা যোগাড় কর অতু। আমার বুকে আর দম নেই।

মাত্র এক'শ দশ টাকা মাইনের একটা চাকরিকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও স্বীকার করেছে অতীন। এই চাকরি তার জীবনে কাম্য

নয়। এই ভাঙ্গা রাজবাড়ির ক্ষুধিত অন্তরাত্মার সব দাবি মেটাবার জন্য এই চাকরি ধরেনি অতীন। মানুষের মত সেজে বাইরের সভ্য সংসারে ঘোরা-ফেরা করতে হলে যা না হলেই নয়, সেই তু-চারটে ভাল পোষাক, তু-চারটে ক্লাবের চাঁদা, ক্রিকেটের সীজন টিকিট, মাঝে মাঝে চীনা রেস্তোরাঁতে লাঞ্চ, তাও যে এই এক'শ দশ টাকায় কুলোয় না।

তবে আশা আছে, ভাল একটা সার্ভিস পাবার সুযোগ দেখা দিয়েছে এবং এক বছরের মত বিলেতে গিয়ে একটা পরীক্ষা দেবার দরকারও হতে পারে। যদি সে আশা ব্যর্থ হয়, তবেই বা কি আসে যায়? কাজরী চৌধুরীর মত মেয়ের ভালবাসা অতীনের টাকা থাকা বা না-থাকার উপর নির্ভর করে না। সে মেয়ে অতীনের জন্যই অতীনকে ভালবাসে। অগর ফিরদৌসে বা রুয়ে জমিনস্ত, যদি ভূ-লোকে কোথাও স্বর্গ থাকে, তবে সে স্বর্গ হলো বিনা সর্তে ভালবাসাবাসির একটি ঘর। অতীন জানে, তার জীবনটা আর রসিকপুরের এই রাজবাড়ির ভাঙ্গা ইটের কারাগারে বন্দী হয়ে থাকবে না। নিজের মনের মত একটি ভালবাসার ঘর নিজের হাতে গড়ে নিতে পারবে অতীন।

কিন্তু সে সুযোগ দেবে কি এই বাড়িটা? কমল বিশ্বাস আর সুধাময়ী?

এরা সে সুযোগ দেবে না, দিতে পারে না। অতীনকে নিজেরই মনের জোরে এদের নাগাল থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে চলে যেতে হবে। কাজরী চৌধুরী যদিও চিরকাল অপেক্ষা করতে রাজি আছে, কিন্তু কোন সন্দেহ নেই, অতীনের সঙ্গে একটি ভালবাসার ঘরে ঠাঁই নিতে পারলে নিশ্চিন্ত হয়ে আরও সুখী হবে কাজরী, এবং অতীনও নিশ্চিন্ত হবে। কাজরী চৌধুরী সব সময়েই প্রস্তুত, শুধু অতীন যে-কোন একটি দিনে প্রস্তুত হলেই হয়, তবে সেদিনই বিয়ে হয়ে যেতে পারে।

কয়লাঘাটের জাহাজ আফিসে যে চাকরিটা করে কাজরী, সে চাকরিটা মাইনের দিক দিয়ে অতীনের ঐ সেলসম্যান্‌গিরির চেয়ে ভাল। মারোয়াড়ির অটোমোবিল শো-রুমে নতুন সেলস্‌ম্যান অতীনের মাইনের প্রায় দু'গুণ মাইনে পায় জাহাজ অফিসের সেকেণ্ড ক্লার্ক কাজরী চৌধুরী। সুতরাং দু'জনে যদি এক ঠাঁই হয়, তবে দু'জনের রোজগারের টাকাও এক ঠাঁই হবে, এবং চলে যাবে দিন; টাকায় বড়লোক হবার জন্য যারা স্বপ্ন দেখে না, যারা শুধু ভালবাসায় বড় হবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছে, তাদের পক্ষে ঐ টাকাতেই সুখী হতে কোন অসুবিধা নেই।

চন্দননগর থেকে প্রতিদিন সকাল ন'টা পঁয়ত্রিশের লোক্যাল ট্রেনের একটি মেয়ে-কামরার জানালা দিয়ে সুন্দর একটি মুখ উঁকি দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকে, সে মুখ হলো কাজরী চৌধুরীর মুখ। সে মুখের সুন্দরতাও একটা রহস্য। কেন যে কাজরী চৌধুরীর মুখটা দেখতে এত সুন্দর বলে মনে হয়, বোঝা যায় না। ঐ চোখ ঐ নাক, ঐ ঠোঁট, কোনটিই নিখুঁত নয়। ঐ মুখের রং ফরসা হলেও সেটা অসাধারণ রকমের কিছু নয়। কিন্তু সব মিলিয়ে বেশ একটু অসাধারণ সেই রূপ, জ্যোৎস্না রাতের বনের ঝড়ের মত। কিছু নেশা, কিছু পিপাসা, কিছু বেদনা, সব একসঙ্গে মিলে মিশে হেসে উঠলে যেমন হয়, প্রায় তেমনই। কাজরী চৌধুরীর মুখের সুন্দরতা যেন তপ্ত শোণিতের আবেদন। ছোট একটা হাসির শিহর সব সময় থমকে থাকে সেই মুখে, স্নিগ্ধতার প্রলেপের মত। কাজরী চৌধুরীর সুন্দর মুখের এই স্নিগ্ধতার প্রলেপ মিথ্যে ক'রে দিয়ে গনগনে আগুনের আভার মত একটা রক্তিম বিহ্বলতা যেদিন প্রথম ফুটে উঠেছিল, সেদিন আর কেউ নয়, ঐ অতীন বিশ্বাসই কাজরীর চোখের সামনে একা দাঁড়িয়েছিল।

পার্ক ষ্ট্রীটের সেই মারোয়াড়ির অটোমোবিল শো-রুমের পাশেই যে বিরাট একটা বারান্দা সেই বারান্দায় ছবির প্রদর্শনী

খুলেছিল কলকাতার এক শিল্পোৎসাহী সমিতি, গ্রেট আর্ট সোসাইটি। সে সমিতির পেট্রন অসিত দত্ত ছিলেন কাজরীদের চন্দননগরের বাড়ির নিত্য সন্ধ্যার চা-এর অতিথি। তিনিই খুব পীড়াপীড়ি করেছিলেন, তাই কাজরী চৌধুরীকে ঐ প্রদর্শনীর অরগ্যানাইজিং সেক্রেটারি হতে হয়েছিল।

প্রদর্শনী যেদিন শেষ দেখা দিয়ে বন্ধ হয়ে যাবে, সেই দিন। প্রদর্শনীতে দর্শকের সমাগম ছিল না। সন্ধ্যার আলো জ্বলে উঠতেই একজন মাত্র দর্শক আনমনার মত হেঁটে হেঁটে প্রদর্শনীর ভিতরে ঢুকতেই একটু কৌতূহলী হয়ে আগন্তুকের মুখের দিকে তাকিয়েছিল অর্গানাইজিং সেক্রেটারি কাজরী চৌধুরী।

—আসুন, কাছে এগিয়ে যেয়ে ভদ্রতা করতে গিয়েই থমকে দাঁড়ায় কাজরী চৌধুরী। অপলক চোখে আগন্তুকের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। লজ্জা, হ্যাঁ লজ্জাই বটে, কিন্তু অদ্ভুত এক পিপাসাতুর লজ্জা, কাজরী চৌধুরীর মুখটা গনগনে আগুনের আভায় রঙীন হয়ে ওঠে। সেই আগন্তুক হলো অতীন বিশ্বাস।

অ্যাপোলোর ছবি নয়, অ্যাপোলোর জীবন্ত যৌবন যেন প্রদর্শনীর ঘরে ঢুকেছে। দেখতে কী ভয়ানক সুশ্রী এই ভদ্রলোক! কাজরীর সেই তপ্ত মুখচ্ছবির দিকে তাকিয়ে অতীন বিশ্বাসেরও মনে হয়েছিল, তার ত্রিশ বছর বয়সের সবচেয়ে বড় আশা আজ ধন্য হয়ে গেল।

আলাপ হতে দেরি হয়নি, এবং সে আলাপ একেবারে নিবিড় ও মধুর হয়ে উঠতে একঘণ্টারও বেশি সময় লাগেনি। কাজরীই অনুরোধ করেছিল, তবে চলুন, যদি সন্দেহ না করেন, আমাকে একেবারে চন্দননগর পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসবেন।

কাজরীদের চন্দননগরের বাড়ি, বাড়ির উপরতলার যে বারান্দায় বসলে কনভেন্টের গির্জাটাকে স্পষ্ট দেখা যায়, সেই বারান্দায় বসে চা খেয়ে ফিরে চলে এল অতীন।

বাড়ি ফিরতে রাত হয়েছিল অতীনের ; ঘুমোবার জন্য অনেক চেষ্টা করলেও সে-রাতে ঘুম আসেনি। রসিকপুরের ভাঙ্গাবাড়ির একটা ছোট ঘরের বদ্ধতা বড় দুঃসহ মনে হয়েছিল। অনেকক্ষণ ধরে, প্রায় রাত দুপুর পর্যন্ত পুকুরঘাটের সিঁড়িতে বসে আর দূরের কারখানার সারি সারি চিমনির ছায়াময় লম্বা লম্বা শরীরগুলির দিকে তাকিয়ে থেকেও চোখ দুটো ক্লান্ত হয়নি। বুঝতে পেরেছিল অতীন, ঘুমোতেই ইচ্ছে করছে না। কাজরী চৌধুরীর খোঁপার গন্ধ বুকের কাছে লেগে রয়েছে। অদ্ভুত, কাজরী চৌধুরীর প্রাণ যেন যুগ যুগ ধরে অতীনেরই প্রতীক্ষায় ছিল! একটি দিনেই পরিচয়ের পর তিনটি ঘণ্টাও পার হয়নি, চা-এর আসর থেকে অতীনকে বিদায় দিতে গিয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে সেই আলোর সামনেই অনায়াসে একটি পরম উপহার আশা ক'রে অতীনের মুখের কাছে মুখ তুলে তাকিয়েছিল কাজরী।

—কাল আবার দেখা করবেন, প্রতিজ্ঞা করুন অতীনবাবু। কাজরীর সেই অনুরোধের ভাষা অতীনের বুকের ভিতরে ঝংকার দিয়ে বাজে, তাই ঘুম আসে না। মনে পড়ে অতীনের, কথা দিয়ে এসেছে অতীন—দেখা করবো। আপনি না বললেও দেখা করতাম।

সেদিন অফিস থেকে বাড়ি ফিরে এবং বড় বেশি খুশি মনে কাজরী চৌধুরীকে একটা চিঠি লিখবার জন্য মাত্র কলম তুলেছিল অতীন, কমলবাবু এসে বললেন—এইবার আর দেরি করতে পারি না অতু।

অতীন—কিসের দেরি ?

কমলবাবু—বাসুর বিয়ে দিতে আর দেরি করা উচিত নয়।

অতীন—বিয়ে দিন তা'হলে। দেরি করতে বলছে কে ?

কমলবাবু তাঁর রোগা গলাটাকে টান ক'রে দুটি চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে অতীনের মুখের দিকে সোজা তাকিয়ে বলেন—তুমি খরচটা দিতে দেরি না করলেই হয়।

অতীন—আমি খরচ দেব কোথা থেকে ?

কমলবাবু—যেখান থেকে পার।

অতীন—এরকম কথার কোন মানে হয় না।

কমলবাবু—খুব হয়। তোমাকে মানুষ করার জন্য আমি যেখান থেকে পারি আর যেমন ক'রে পারি টাকা যোগাড় করিনি ?

কমল বিশ্বাসের চোখ দুটো জ্বলছে বলে মনে হয়। ছেলের কাছ থেকে সুদ সুদ্ধ ঋণ আদায় করবার প্রতিজ্ঞা নিয়ে দাঁড়িয়েছেন সেই মানুষ, যে মানুষ এর আগে কোনদিন এক গেলাস জল চেয়েও ছেলেকে খাটাননি। অতীনও বোধ হয় ভুলে যায়নি যে, এই কমল বিশ্বাসই একদিন জ্বর গায়ে নিয়ে তার ছেলের ময়লা ধুতি পুকুর ঘাটে নিয়ে নিজের হাতে কাচাকাচি করেছেন, তবু ছেলেকে ময়লা ধুতি পরতে বাধ্য করেন নি। নিজের হাতে ময়লা ধুতি কাচতে গেলে অতীনের সময় নষ্ট হবে, সেই সময়টুকু পড়লে কাজ দেবে, এই নীতি যে মানুষের জীবনে সেদিনও সজীব ছিল, তিনিই আজ কঠোর মহাজনের মত সুদ সুদ্ধ পুরনো ঋণের শোধ দাবি করছেন, এটা বোধ হয় অতীনের কল্পনাতেও ছিল না। তাই আশ্চর্য হয় অতীন, ভয় পায় এবং ঘৃণাও করে। যে বস্তুকে এই বাড়ির স্নেহ বলে মনে হয়েছিল, এবং একেবারে ন্যায্য প্রাপ্য বলে মনে হয়েছিল, সেই বস্তু যে একটা আগাম দাদন মাত্র, এত স্পষ্ট ক'রে এই সত্য আগে উপলব্ধি করতে পারেনি অতীন।

সেদিনের সেই ঘটনাকে সেখানেই থামিয়ে দিয়েছিলেন সুধাময়ী, আর বেশি গড়াতে দেননি। বাপের দাবির উত্তরে আর কোন কথা বলতে পারেনি অতীন। সুধাময়ীও ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে ভয় পেয়েছিলেন। বাপের কথা শুনে ভয় পেয়ে আর আশ্চর্য হয়ে কি-রকম কালো হয়ে গিয়েছে ছেলের মুখটা। এরকম চাপ দিলে ঐ ছেলে কি আর এই বাড়িতে টিকে থাকতে পারবে ?

কমলবাবুকে আড়ালে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে সুধাময়ী বলেছিলেন—ওরকম একটা অত্যাচারীর মত শক্ত ক'রে কথা বল কেন? ছেলেটা যে ভয় পেয়ে পালিয়ে যাবে।

ভুরু কুঁচকে চিন্তা করেছিলেন কমলবাবু। হ্যাঁ, তাইতো, ছেলেটা যদি পালিয়ে যায়, এবং এই বাড়ির ছায়ার কাছেও আর ফিরে না আসে, তবে তো কোন উপায়ই থাকবে না। কিছুই আদাই করা যাবে না। উলটে চিরকালের মত নিজেই জব্দ হয়ে যাবেন।

এই সবই চিন্তা করা আছে, এবং সমস্যাটাকে খুব ভাল করেই বুঝে রেখেছেন এই ভাঙ্গা রাজবাড়ির কমল বিশ্বাস ও তাঁর স্ত্রী সুধাময়ী। ছেলেকে ক্ষেপিয়ে রাগিয়ে আর বিগড়ে দিয়ে নয়, বেশ বুঝিয়ে সুঝিয়ে বাগে আনতে হবে, যেন এই বাড়ির দাবিকে একটু মায়ার চোখে দেখতে শেখে অতীন, এবং সাহায্যও করে।

রাত ভোর হতে এখনও বাকি আছে। এলাহাবাদের পার্থবাবু হয়তো ভোর হতেই দেখা দেবেন, এবং বাসনার বিয়ের তারিখটাও ঠিক ক'রে ফেলা হবে। হয়তো বাসনাকে আশীর্বাদ করে যাবেন পার্থবাবু। কিন্তু তারপর?

সেই প্রশ্ন। তারপর টাকা আসবে কোথা থেকে? সুধাময়ী বলেন—তুমি যে সেদিন ছেলেটার ওপর মিছামিছি জুলুম করলে···।

কমলবাবু—মিছামিছি কেন?

সুধাময়ী—এইতো একবছর হয়নি, একটা চাকরি মাত্র ধরেছে, এরই মধ্যে বাসুর বিয়ের খরচ যোগাবার মত টাকা কোথায় পাবে অতীন?

কমলবাবু—তা কি আমি আর জানি না। ওর সে সাধ্যি নেই জানি। সেই জন্যেই তো চাপ দিয়েছি।

সুধাময়ী—বুঝলাম না।

কমলবাবু বিরক্ত হয়ে বলেন—বুঝতে এত দেরি কর কেন?

আস্তে আস্তে, প্রায় ফিসফিস ক'রে সুধাময়ীর কানের কাছে কথা বলতে থাকেন কমল বিশ্বাস। একটা কঠোর চক্রান্তের ভাষা সেই শেষ রাতের অন্ধকারে গোপন সাপের উল্লাসের মত যেন হিসহিস করে। সুধাময়ী একবার ফুঁপিয়ে উঠতে চেষ্টা করেন। কমলবাবু প্রায় ধমকের মত শক্ত স্বরে সাবধান ক'রে দেন—উপায় নেই সুধা, একটু শক্ত হতেই হবে।

সমস্যার সমাধানের পথ বোধ হয় এতক্ষণে খুঁজে পাওয়া গেল। পুকুরের দিক থেকে নারকেলের বাগানের মাথার উপর দিয়ে খুব জোরে হাওয়া ছুটতে শুরু করেছে। তারা আছে আকাশে। তবু অনেক দূরে একটা কাকও যেন ডাকছে। সুধাময়ী বলেন—তুমি এবার শুতে যাও।

কমলবাবু—কেন ?

সুধাময়ী—সবই তো ঠিক হয়ে গেল। আর চিন্তা করবার, এরকম রাত জেগে বসে থাকবার দরকার কি ?

কমলবাবু ভ্রুকুটি করেন—দরকার আছে। তোমার ছেলে আজ এই ভোরেই পালিয়ে যাবার জন্য তৈরী হয়ে আছে।

আতঙ্কিতের মত তাকিয়ে থাকেন সুধাময়ী—সে কি ?

কমলবাবু—হ্যাঁ, আজই কলকাতার কয়লাঘাটের এক জাহাজ অফিস থেকে মেয়েলি হাতের লেখা একটা চিঠি অতীনের কাছে এসেছে। একজন তাকে আজই চন্দননগরে গিয়ে দেখা করতে বলেছে, তারপর সেখান থেকে দুজনে মিলে…কি যেন কথাগুলি …কিরকম একটা কাব্যি ক'রে লিখেছে যে…তারপর দুজনে এই জগতের এক গোপন নীড়ের ভিতরে গিয়ে স্বর্গ রচনা করবে।

সুধাময়ীর মুখটা করুণ হয়ে কাঁপতে থাকে। সেই সঙ্গে বুকের ভিতর থেকে যেন একটা আর্ত ধিক্কার ঠেলে ওঠে—ছি ছি, এমন কথাও শুনতে হলো।

কমলবাবু হেসে ওঠেন—কিছু ভেব না সুধা। আমি তোমার ছেলেকে আটকে রাখতে পারবো। আমি জানি, এসব ছেলেকে কোন্ মন্তরে আটকে রাখতে হয়। তুমি শুধু বসে বসে দেখ।

ভাঙ্গা রাজবাড়ির চেহারাটা শেষ রাতের অন্ধকারে কেমন যেন বীভৎস রকমের দেখায়। পুবের আকাশটা মাত্র সামান্য একটু ফিকে হয়েছে। কিন্তু সারা বাগান জুড়ে অন্ধকারটা আরও নিরেট হয়ে রয়েছে। ঠাকুরদালানের থামগুলিকেও কালো কালো অন্ধকারের দানবের মত দেখায়।

আজই অতীনের ঘরের টেবিলের উপর থেকে একটা চিঠি তুলে নিয়ে পড়তেই যে রহস্যটার আঁচ ক'রে ফেলেছেন কমলবাবু, সেই রহস্যেরই উপর যেন প্রতিশোধ তোলবার জন্য তৈরী হয়ে রাত জাগছেন। এই ভাঙ্গাবাড়ির উপর এই বাড়িরই ছেলের মনে কোন মায়া নেই কেন? এই বাড়ির একটা বুড়ো আর বুড়ি, যারা এই বাড়িরই বাপ ও মা, তাদের জন্য অতীনের মনে বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা নেই কেন, সেটা কমল বিশ্বাসের জানা আছে; তিনি মর্মে মর্মে জানেন। বুড়ো বাপ ও মা এদের কাছে আবর্জনা মাত্র, যদি সেই বাপ ও মায়ের সিন্দুকে কিছু সোনা রুপো না থাকে, যদি কোন ব্যাঙ্কের খাতায় সেই বাপ ও মায়ের নামে কিছু জমা না থাকে। বাড়িটাও যদি আস্ত থাকতো, এবং উঠানের আশেপাশে ঐ আলকুশির জঙ্গল না থেকে একটা টেনিস লন থাকতো আর বাতি জ্বলতো, যদি ঐ দেউড়িটা পচে গলে না গিয়ে তার দরজার কাছে কমল বিশ্বাস নামে এই বাপ মানুষটার একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকতো, তবে অতীনের মত ছেলে এই বাড়ির ধুলোয় মাথা ঠেকাতে একটুও দেরি করতো না।

কিন্তু রাগ করলেও মনে মনে যেন একটা ধূর্ত হাসি হাসেন

কমলবাবু। আজ একটি মন্তরে ঐ ছেলের মাথার ভিতরে এমন শ্রদ্ধার উৎসাহ ঢুকিয়ে দেবেন যে, এই ভাঙ্গা দালানের সিঁড়িটাকে ঢিপ ক'রে প্রণাম ক'রে ফেলবে অতীন। এবং আশ্চর্য নয়, কমল বিশ্বাসের এই জীর্ণ চেহারাটার দিকে ভক্তিভরা চোখ তুলে তাকিয়েও থাকবে। পালিয়ে যাবার সাধ্য হবে না।

আসছে একটি ছায়া। আস্তে আস্তে ঘরের ভিতর থেকে বের হয়ে সেই ছায়া হনহন ক'রে অনেকখানি এগিয়ে এসে ঠাকুর-দালানের বারান্দার উপর দাঁড়ায়। সিগারেট ধরায়। সেই ছায়ার হাতের দেশলাই ফস ক'রে জ্বলে উঠতেই দেখতে পান কমলবাবু, হ্যাঁ, অতীন দাঁড়িয়ে আছে, হাতে ছোট একটা ব্যাগ।

কিন্তু সেই মুহূর্তে অতীনের হাতটাও যেন ভয় পেয়ে চমকে উঠে জ্বলন্ত সিগারেট ছুঁড়ে ফেলে দেয়। চেঁচিয়ে ওঠে অতীন—কে ? কে ওখানে বসে।

কমলবাবু বলেন—কাছে এসে শুনে যা অতীন।

কমলবাবুর কাছে এগিয়ে এসে অতীন স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, যেন প্রেত দেখা ভয়ের আবেশ অভিভূত একটা মূর্তি। কমলবাবু বলেন—এভাবে জুতো পায়ে দিয়ে ঠাকুরদালানের বারান্দার উপর হাঁটাহাঁটি করিস না বাবা। ক্ষতি হবে, তোরই ক্ষতি।

ক্ষতি হবে ? তার মানে পাপ হবে বলে ভয় দেখাচ্ছেন বাবা। বিগ্রহ পদ্মনাভ বিরূপ হবেন। অতীনের মনের ভিতরেও একটা ক্রুদ্ধ তুচ্ছতা যেন ধিক্কার দিয়ে ওঠে। কমল বিশ্বাস নামে এই লোকটা জীবনে কোন্ মিথ্যার সাহায্য না নিয়েছে ? ঠাকুর পদ্মনাভের উপর লোকটার কী গভীর শ্রদ্ধা ! এবং এই ঠাকুরের দয়ার উপর বিশ্বাস রেখে মানুষকে ঠকাতে এক মুহূর্তও বিচলিত হয় না যে লোক, সেই লোকই অতীনকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে যে, ঠাকুরদালানের বারান্দায় জুতো পায়ে দাঁড়ালে পাপ হয়।

কমলবাবু বলেন—কোনদিন তোকে যে-কথা বলিনি, সে কথা

আজ বলে ফেলছি অতীন। মনে হয়েছে, এইবার বলে ফেলাই ভাল, কারণ আমার যে আর বেশি দিন নেই।

চুপ করলেন কমলবাবু; শেষ রাতের আবছায়াময় স্তব্ধতা আর নারকেল বাগানের অদ্ভুত এক বিলাপের মত ঝড়ের শব্দ যেন দুঃসহ রহস্য হয়ে অতীনের কৌতূহল শিউরে তোলে।

কমলবাবু গলার স্বর চেপে, ধীরে ধীরে, ভাবাবেশে বিভোর সাধকের মত বিড়বিড় ক'রে বলতে থাকেন—এই রাজবাড়ি আজও সত্যিই রাজবাড়ি। এই ঠাকুরদালানের থামের ভিতর তোর আট পুরুষ আগের যত সোনা লুকানো আছে।

—কে বললে? চেঁচিয়ে ওঠে অতীন।

কমলবাবু—তোর ঠাকুরদা। এই বংশের নিয়ম, ঐ পদ্মনাভের আদেশ, এই সোনার সন্ধান ঠিক সময় বুঝে বংশের বড় ছেলেকে জানিয়ে যেতে হয়।

অতীন—তুমি কি সত্যিই বিশ্বাস কর যে…।

কমলবাবু—বিশ্বাস? বিশ্বাস অবিশ্বাসের কথা তুলছিস কেন অতীন? বিশ্বাস করলেই আছে; অবিশ্বাস করলে নেই।

থরথর করে অতীনের বুকের ভিতরটা, কানের পাশে ঘামের বিন্দু ফুটে ওঠে। গলার কাঁপুনি থামাবার চেষ্টা ক'রে অতীন বলে—আশ্চর্য, অদ্ভুত কথা বলছো তুমি!

কমলবাবু—যা বলবার বলেছি, এখন বিশ্বাস করা আর না করা তোমার দায়িত্ব। আমার মনে হয়, যে সোনা সাতপুরুষের কোন কাজে লাগলো না, সেই সোনা আটপুরুষের একজনের জীবনে কাজে লাগবে।

হেঁট মাথা হয়ে কি যেন ভাবে অতীন। তারপর কমলবাবুর ঐ শান্ত ও বিশ্বাসকঠিন মুখটাকে ভাল ক'রে দেখবার চেষ্টা করে! তারপর আস্তে আস্তে ঘরের দিকে ফিরে যায়।

ফিরে যেতে যেতে একবার থমকে দাঁড়ায় অতীন। মুখ ফিরিয়ে তাকায়, এবং বেশ একটু উদ্বিগ্ন স্বরে বলে—তুমি এভাবে রাত জেগে বড় অন্যায় করছো। এরকম করলে তোমার ঐ রোগা শরীর আর ক'দিন টিকবে ?

চলে যায় অতীন। কমল বিশ্বাসের বুকের পাঁজরগুলিই যেন কেঁপে কেঁপে হাসতে থাকে। কিন্তু ঠিকই বলেছে অতীন, আর এইভাবে বসে থাকবার দরকার নেই। এইবার ঘরের ভিতরে গিয়ে একটু গড়িয়ে নেওয়া দরকার। কারণ, এতক্ষণে সত্যিই নিশ্চিন্ত হবার সুযোগ পাওয়া গেল।

কমলবাবু ওঠেন, কিন্তু চলতে গিয়েই পা দুটো যেন টলতে থাকে, মাথা ঘোরে। সারা জীবনের যত ফন্দি ফিকির কৌশল আর মিথ্যার বোঝাটা যেন মাথার উপর বড় বেশি ভারি হয়ে জমে রয়েছে, ঘাড়টা টনটন করছে। একটুখানি হাঁটতেই হাঁপাতে থাকেন কমল বিশ্বাস, এবং ঘরের ভিতরে গিয়েই চেঁচিয়ে ওঠেন—তুমি কোথায় গেলে সুধা ? শিগগির এস।

সুধাময়ী ব্যস্তভাবে ছুটে এসে কাছে দাঁড়াতেই কমলবাবু ক্লান্ত-সুরে বলেন—আমাকে একটু বাতাস কর সুধা। একটু সাহস দাও।

কমল বিশ্বাসের মাথায় পাখার বাতাস দিয়ে সুধাময়ী বলেন—ভয় কি ? ঠাকুর সহায় আছেন।

নিঝুম হয়ে বসে থাকেন কমল বিশ্বাস, এবং তারপরেই যেন কঠিন দুঃসাহসে দীপ্ত হয়ে জ্বলতে থাকে তাঁর কোটরগত চক্ষু।—এখুনি একবার অতীনকে আসতে বল সুধা।

সুধাময়ীর ডাক শুনে প্রায় হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসে অতীন। এসেই ব্যস্তভাবে বলতে থাকে—আমি আগেই বলেছিলাম ওরকম রাত জেগে বসে থেক না। রোগা শরীরে এরকম অত্যাচার সইবে কেন ?

কমলবাবু বলেন—আমার শেষ জীবনের দু'টি কর্তব্য এইবার সেরে দিয়ে যেতে চাই অতীন।

অতীন আশ্চর্য্য হয়—কর্তব্য ?

কমলবাবু—হ্যাঁ, তোর বিয়ে আর বাসুর বিয়ে। বাস্, তারপরেই আমার ছুটি।

চমকে ওঠে অতীন—আমার বিয়ের ভাবনা ছেড়ে দাও। হ্যাঁ, বাসুর বিয়ের জন্য আমার যা সাধ্যি···।

কমলবাবু—না, আগে তোর বিয়ে। আমি পাত্রীও ঠিক ক'রে ফেলেছি।

অতীন—ভুল করেছ তুমি···আমি এখন ওসব ঝঞ্ঝাটের মধ্যে যেতেই রাজি নই।

কমলবাবু—কোন ঝঞ্ঝাট নয়। খড়দহ'র রামকানাই বাবু, সেগুন কাঠের মস্ত বড় কারবারি, বছরে এগার হাজার টাকা ইনকাম ট্যাক্স দেন, এবং তাহলেই বোঝ, কত হাজার টাকা ট্যাক্স ফাঁকি দেন এবং কত বড়লোক।

শুনতে খুব ভাল না লাগলেও খুব খারাপও লাগে না। নীরব হয়ে শুনতে থাকে অতীন।

কমলবাবু—তাঁরই ভাগ্নী, একমাত্র ভাগ্নী, মেয়েটির নামটিও বড় সুন্দর ; কেতকী। যেমন শিক্ষিতা, তেমনই কাজের মেয়ে। তা ছাড়া, রামকানাইবাবু দরাজ হাতে খরচ করতে রাজি আছেন। ভাল বরপণ, ভাল দানসামগ্রী দেবেন। ঠিক করেছি, এই মাসেরই একটা শুভদিনে এই মেয়েটিকে ঘরের বউ ক'রে নিয়ে আসবো।

সুধাময়ী যেন তাঁর বদ্ধ নিশ্বাস ছাড়তে গিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলার মত একটা শব্দ করেন, এবং কমলবাবুর এত সাজানো গোছানো ও চক্রান্তসুন্দর প্রস্তাবটাকে প্রায় ধরা পড়িয়ে দিয়ে বলে ফেলেন—আমার বড় শখ ছিল অতীন, সুন্দর বউ ঘরে আনবো, কিন্তু ঠাকুর যদি না ইচ্ছে করেন, তবে···।

অতীন যেন চিবিয়ে চিবিয়ে কথা বলে তার মনের ভয়ানক সন্দেহটাকেই প্রকাশ ক'রে দেয়—তাহলে বল যে, অত্যন্ত কুৎসিত একটা মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে ঠিক করেছ, কিছু টাকা পাওয়ার জন্য।

কমলবাবুর চোখে অদ্ভুত একটা হিংসুক হাসি শিউরে ওঠে—হ্যাঁ, ঠিকই বুঝতে পেরেছ।

অতীন—কিন্তু এর ফল কি হতে পারে জানো?

কমলবাবু—জানি, তোমারই বংশের মান-সম্মান বাঁচিয়ে রাখবার জন্য তোমার বোনটিকে একটি ভাল ঘরে বিয়ে দেবার মত টাকা হাতে আসবে। টাকা দেবার মুরোদ যখন তোমার নেই, তখন এরকম একটা উপায় ছাড়া তুমিই বা বোনের বিয়ের টাকা আমাকে যোগাড় ক'রে দেবে কেমন করে?

অতীন—তারও কি ফল হতে পারে, ভেবে দেখ।

কমলবাবু চেঁচিয়ে ওঠেন—কি? আর কোন্ ফলের ভয় দেখাচ্ছিস?

অতীন—বেছে বেছে পৃথিবীর একটা কুৎসিত মেয়েকে আমার পক্ষে···।

আরও জোরে চেঁচিয়ে ওঠেন কমলবাবু—জানি তোমার পক্ষে তাকে মেনে নেওয়া, আর তার সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখা সম্ভব হবে না।

অতীন—তা'হলে?

কমলবাবুর গলার স্বর অকস্মাৎ অত্যন্ত কোমল হয়ে যেন একটা সান্ত্বনার মত গলে পড়ে।—আমিও যে তাই চাই। সম্পর্ক রাখবে না। টাকা চাই, তাই এই বিয়ে। আমাদের শুধু কিছু টাকা পাওয়া নিয়ে কথা। এছাড়া বাসুর বিয়ে দেবার যে আর কোন উপায়ই নেই অতু।

সুধাময়ী মুখ ঘুরিয়ে এবং মুখটাকে আরও সাদা ক'রে নিয়ে

কি-যেন ভাবেন। আর, অতীনের চোখের দৃষ্টি যেন গভীর ভয় আর উদ্বেগের গ্রাস থেকে মুক্ত হয়ে ধীরে ধীরে স্বচ্ছ হয়ে উঠতে থাকে। এবং কমলবাবু তাঁর মাথার সাদা চুলে হাত বুলিয়ে বেশ শান্ত স্বরে টেনে টেনে, যেন একটা ভক্তির আবেগে বলতে থাকেন--তুই হয় তো বিশ্বাস করবি না, কিন্তু আমি বিশ্বাস করি অতু, স্বয়ং ঠাকুরই কৃপা ক'রে আমাকে এই উপায়টি দেখিয়ে দিয়েছেন।

অতীন—দেখ তা'হলে। আমার কোন আপত্তি নেই।

চলে গেল অতীন। বাগানের পথের দিকে তাকিয়ে ব্যস্তভাবে কমলবাবু বলেন—এলাহাবাদের পার্থবাবুর আসবার সময় হয়ে এল।

সুধাময়ী বলেন—সবই তো হলো, কিন্তু বাসু কি রাজি হবে ?

আশ্চর্য হন কমলবাবু—তার মানে ?

সুধাময়ী—তুমিই বা মানে বুঝতে পার না কেন ? সেটা কি ভুলেই গেলে, যে কাণ্ড করে বসে আছে মেয়ে ?

হো হো ক'রে হেসে ওঠেন কমলবাবু—জানি, খুব জানি, কিন্তু ওসব কোন সমস্যাই নয় সুধা। ঠাকুর সহায় থাকলে তোমার মেয়ের ক্ষতি কেউ করতে পারবে না।

সুধাময়ী—ঠাকুর যদি সহায় থাকেন, তবে তো ? নইলে...।

কমলবাবু—ঠাকুরের ওপর বিশ্বাস হারিও না সুধা।

সুধাময়ী—হারাতে চাই না। কিন্তু এই তো এখুনি নিজের চোখে দেখে এলাম, একগাদা চিঠি হাতের কাছে রেখে চুপ ক'রে বসে আছে বাসু। মনে হলো সারা রাত জেগে কেঁদেছে মেয়েটা।

কমলবাবু কটমট ক'রে তাকান—তা তো বুঝতেই পারছি। রতন আসবে বলে আশা ক'রে আর তৈরী হয়ে বসেছিল তোমার মেয়ে।

সুধাময়ী—রতনের লেখা চিঠিগুলি নিয়ে ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে

যে মেয়েটা এখনও হেসে-কেঁদে পাগল হয়ে যাচ্ছে, সে কি আজ তোমার কথাতে বুঝ মেনে এই বিয়েতে রাজি হয়ে যাবে ?

কমলবাবু—রাজি না হবার তো কোন কারণ নেই। কোথায় রতনের মত একটা রেস্তুড়ে ছোকরা, আর কোথায় পার্থবাবুর ছেলে অজিতের মত একটি গুণী শিক্ষিত ও সুশ্রী প্রফেসর, যার মাইনে পাঁচশো টাকা আর বাপের সম্পত্তি অঢেল !

বোধ হয় সুধাময়ীর মনের ভয় সন্দেহ আর উদ্বেগগুলিকে একটা কৌতুকের খেলায় একেবারে ধুলো ক'রে দেবার জন্য উৎসাহিত স্বরে ডাক দেন কমলবাবু—বাসনা, বাসনা কোথায় আছিস, শিগগির একবার শুনে যা।

আসতে দেরি করে না বাসনা। সেই সুন্দর মুখের উপর ভোরের রোদের আভা এসে লুটিয়ে পড়ে, এবং সত্যিই মেয়েটাকে অভিশপ্তা রাজপুত্রীর মত দেখায়। বাসনার চোখের দৃষ্টি যেন দুঃসহ একটা বিরক্তির বেদনায় বিষণ্ণ হয়ে রয়েছে। হাতের আঙুলে কালো ছোপ, কালির দাগ ! তবে কি রাত জেগে বসে বসে শুধু চিঠি লিখেছে বাসনা ? কিংবা এখনই লিখছিল, ডাক শুনে লেখা ছেড়ে দিয়ে উঠে এসেছে।

কমলবাবু বলেন—মিছামিছি রাত জেগে কেন এত লেখা-পড়া করিস বাসু, কোন দরকার নেই, মিছামিছি শুধু স্বাস্থ্য নষ্ট করা।

কমলবাবুর ধূর্ত চোখ দুটোকে ভয় পায় বাসনাও, যদিও বাসনা জানে যে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে জোরে একটা কথা বলবারও সাহস নেই এই মানুষটার, যে মানুষ নিজের মেয়েকে কলেজে যাবার মত চারটে ভদ্র চেহারার শাড়ি কিনে দিতে পারেনি, যদিও তিনি রসিকপুরের বিখ্যাত রাজবাড়ির মালিক। বাসনাই উল্টো প্রশ্ন করে—কি বলছিলে বল ?

কমলবাবু—শুভ সংবাদ বাসু। আজ আমরা যেমন আনন্দে মন খুলে হাসবো, তেমনি মন চেপে কাঁদবো। তোর বিয়ের সম্বন্ধ

পাকাপাকি ক'রে ফেলেছি মা। ঠাকুর কৃপা করুন, ভালয় ভালয় বিয়েটা হয়ে যাক।

চুপ ক'রে এবং স্তব্ধ হয়ে শুনতে থাকে বাসনা। দু'চোখের দৃষ্টি যেন হঠাৎ দিশাহারা হয়ে গিয়েছে। বুঝতে পারছে না বোধ হয় বাসনা, কেন এরকমের একটা গল্প বলছে ধূর্ত কমল বিশ্বাস?

কমলবাবু বলেন—তুই চলে যাবি, আমাদের কাঁদিয়ে দিয়ে তোকে এইবার চলে যেতে হবে, তবু তো এটা শুভ সংবাদ। তাই বলছিলাম, তৈরী হয়ে নে। এখুনি পাত্রের বাপ, এলাহাবাদের পার্থবাবু তোকে আশীর্বাদ করতে আসবেন।

বাসনার গলার স্বর যেন হঠাৎ বিরক্তির আঘাতে ঝংকার দিয়ে বেজে ওঠে—অসম্ভব।

কমলবাবু—অসম্ভব নয় বাসু, পার্থবাবু এই এলেন বলে। এলাহাবাদের বাঙ্গালীদের মধ্যে সম্পত্তিতে ইনিই হলেন সেকেণ্ড। বড় ছেলে অজিত, যেমন বিদ্বান তেমনই সুশ্রী, এখন পাঁচশো টাকা মাইনেতে প্রফেসর হয়েছে। আমরা জানি, ঠাকুর জানেন, তোর মত মেয়ের সঙ্গে অজিতকে কি সুন্দর মানায়।

সুধাময়ী হাঁ ক'রে মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে একটা অনর্থের আশঙ্কায় বুকের দুরুদুরু কাঁপুনি নিয়ে ভয়ানক বিব্রত বোধ করতে থাকেন। কি-রকম তীব্র দৃষ্টি তুলে বাপের মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে বাসনা!

কমলবাবু বলেন—আমার ধারণা, পার্থবাবু অন্তত আটভরির একটা সাতনরি দিয়ে তোকে আশীর্বাদ করবেন, নয়তো আটভরির একটা চিক।

চমকে ওঠেন সুধাময়ী—এরকম কোন কথা দিয়েছেন কি পার্থবাবু?

কমলবাবু—কথা না দিন, জিনিসটা দিতে বাধ্য হবেন।

আমিই বা দাবি করতে ছেড়ে দেব কেন, মেয়ের বাপ হয়েছি বলে ইঁদুর হয়ে গিয়েছি নাকি ?

নিজের মনের আহ্লাদেই হেসে হেসে বলতে থাকেন কমল বিশ্বাস।—তা ছাড়া, আমিও তো মরা হাতি লাখটাকা। কিছুই নেই, তবু কি একমাত্র মেয়েকে গা ভরে সাজিয়ে দিতে পারবো না ?

সুধাময়ী ডাকেন—কি ভাবছিস বাসু ?

কমলবাবু বলেন—কিছু ভাবিস না বাসনা। ঠাকুর যাকে সুখী করতে চান তাকে এইভাবেই হঠাৎ সুখের পথে এগিয়ে দেন।

বাসনা মাথা হেঁট করে। তারপর আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে সুধাময়ীর গা ঘেঁষে বসে পড়ে। সুধাময়ীও মেয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে যেন সান্ত্বনার ভঙ্গীতে বলেন—মুখ ভার করিস না বাসু। তোকে হাসতে না দেখলে আমরা হাসবো কেমন ক'রে ?

এক ঝলক লাজুক হাসির আভা চমকে ওঠে বাসনার মুখে। মুখ লুকোতে চেষ্টা করে বাসনা। সুধাময়ী বলেন—যা এখন ভেতরের ঘরে চলে যা। পার্থবাবু এলে এদিকে এসে আর ঘোরাঘুরি করিস না।

চলে যায় বাসনা। কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ ক'রে আর গম্ভীর হয়ে থেকে তারপর সুধাময়ীর মুখের দিকে তাকান কমলবাবু। কমলবাবুর কোটরগত চোখের তীব্র দৃষ্টিটা অদ্ভুতভাবে হাসছে। কিন্তু পাখা হাতে নিয়ে ব্যস্তভাবে এগিয়ে আসেন সুধাময়ী—ওকি, ওরকম হাঁসফাস করছো কেন ?

শীর্ণ শরীরটাকে আরও একটু কুঁকড়ে দিয়ে হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে বলতে থাকেন কমলবাবু—বুকের ব্যথাটায় যেন হঠাৎ একটা চাড় লাগলো। যাকগে, সেজন্য নয়, বড় ক্লান্তি বোধ করছি সুধা। অল্প অল্প ক'রে রোদ উঠছে। অর্জুন আর কনকচাঁপার মাথায় পুরনো মৌচাকের কাছে এসে নতুন মৌমাছির ঝাক গুনগুন করে।

কমল বিশ্বাস আর সুধাময়ী, এই ভাঙ্গাবাড়ির বুড়ো-বুড়ির প্রাণও যেন এইবার নিঝুম হয়ে বসে মুক্তির গুঞ্জন শুনছে।

কমলবাবু অপলক চোখ তুলে সুধাময়ীর সেই সাদা ও রোগা মুখটারই দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকেন। তার পর আস্তে আস্তে ডাকেন—কি ভাবছো সুধা?

সুধাময়ী—তুমি যা ভাবছো!

কমলবাবু—হ্যাঁ সুধা, ঠিকই ধরেছ তুমি। কাজ ফুরিয়ে এসেছে, এইবার ভালয় ভালয় চলে যেতে পারলেই ভাল। কিন্তু...।

সুধাময়ী—কি?

কমলবাবু—আমার ইচ্ছে নয় যে, আমি তোমার আগে যাই।

সুধাময়ী—কেন বল তো?

কমলবাবু হাসেন—সারা জীবনটাই তো তোমাকে দুঃখ দিলাম...।

সুধাময়ী বাধা দিয়ে বলেন—মিছে ওসব কথা কেন তুলছো?

কমলবাবু—না সুধা। তুমিই বরং হেসে হেসে আমার আগে চলে যাও, অন্তত শেষটায় আর তোমাকে দুঃখ দিতে চাই না।

সুধাময়ী হাসেন—সে তো ভাগ্যির কথা; কিন্তু...।

কমলবাবু—কিন্তু আবার কি?

সুধাময়ী—তুমিই বা কেন একা পড়ে থাকবে? বুকের ব্যথায় কাতরাবে আর আমার ওপর রাগ ক'রে আরও কষ্ট পাবে বলে?

চেঁচিয়ে হাসতে থাকেন কমলবাবু—তবে কি আমাকে সঙ্গে নিয়েই যেতে চাও।

সুধাময়ীর চোখ দুটো করুণ হয়ে ওঠে—একসঙ্গে কি সত্যিই যাওয়া যায় না? ঠাকুর তো জীবনে কিছুই দিলেন না, মরণে অন্তত এইটুকু কৃপা করুন।

কমল বিশ্বাস—ঠাকুরকে বল, আমাকে বলে লাভ কি?

সুধাময়ী—তাই তো বলছি, দিনরাত বলছি।

জীবন ঠকেছে; প্রাণ ক্লান্ত; এবং কাজও ফুরিয়ে এসেছে। তাই এইবার যেন সহমরণের আশীর্বাদ প্রার্থনা করছে এই বাড়ির বুড়ো আর বুড়ি।

কমল বিশ্বাস আবার হেসে ওঠেন—তাই ভাল সুধা। যখন বাঁচাটাই সুখের হলো না, তখন মরণটাই সুখের হোক।

হঠাৎ হাসি থামিয়ে বাগানের দিকে তাকিয়ে থাকেন কমল বাবু। একটা গাড়ি এসে বাগানের পথে থেমেছে। পার্থবাবু এসেছেন।

কমল বিশ্বাসের কপাল কুঁচকে দিয়ে একটা উদ্বেগ ছটফট ক'রে ওঠে।—এখন তা'হলে ভদ্রতা রক্ষা করবার একটা ব্যবস্থা করতে হয় সুধা।

সুধাময়ী—তা তো করতেই হবে। বল কি করবো?

কমলবাবু—রুপোর একটা থালা এখনও ঘরে আছে বলে মনে হচ্ছে।

—হ্যাঁ আছে। বলতে গিয়ে সুধাময়ীর চোখ দুটো হঠাৎ ছলছল ক'রে ওঠে। ঐ থালাটা যে চল্লিশ বছর আগের একটা স্মৃতি। বিয়ের পর দিন, কুশণ্ডিকা শেষ হবার পর বরভোজনও হয়ে গিয়েছিল যখন, তখন একা ঘরের ভিতর চুপ ক'রে বসেছিল পঁচিশ বছর বয়সের কমল বিশ্বাস। তিন জন খুড়িমা আর আট জন জেঠিমার ধমক খেয়ে শেষে বাধ্য হয়ে, ঘোমটা টেনে মুখ ঢেকে আর থরথর ক'রে কাঁপতে কাঁপতে ঐ রুপোর থালাতেই পান সাজিয়ে নিয়ে কমল বিশ্বাসের কাছে প্রথম এসে দাঁড়িয়েছিল সেদিনের আঠার বছর বয়সের সুধাময়ী। মনে পড়ে, আজও যে ভুলতে পারা যায় না, রুপোর থালার দিকে না তাকিয়ে সুধাময়ীরই মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলে কমল বিশ্বাস বলেছিল—তুমি নিজের হাতে তুলে পান না দিলে, ও পান আমি ছোঁব না।

কমলবাবু ব্যস্তভাবে বলেন—এখুনি একবার পাঁচুকে ডেকে

পাঠাও সুধা। থালাটাকে জীবন বাবুর দোকানে বেচে দিয়ে আসুক পাঁচু। যা পাওয়া যায়, তাই লাভ। পার্থবাবুর জন্যে কিছু ভাল খাবার-টাবার আনিয়ে…।

হঠাৎ কথা বন্ধ ক'রে সুধাময়ীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন কমল বিশ্বাস। থর থর ক'রে কেঁপে ওঠে কমল বিশ্বাসের চোখ। তাঁর সেই চক্রান্তময় প্রচণ্ড অন্তরাত্মা এতগুলি বাধা এত সহজে জয় ক'রে এইবার শেষ বাধার রূপ দেখে ভয় পেয়েছে। সব ফন্দির সাহস মুসড়ে পড়েছে, সব কথার ধূর্ততা বোবা হয়ে গিয়েছে। দুই চোখের কোটর দু'হাত তুলে তাড়াতাড়ি মুছে নিয়েই সুধাময়ীর হাত ধরেন—একটা রুপোর থালার জন্য মিথ্যে দুঃখ করছো কেন সুধা? তোমার হাতটা তো আর মিথ্যে হয়ে যাচ্ছে না।

প্রথমে ফাল্গুন মাসের একটা দিনে, তারপর চৈত্র পার হয়ে বৈশাখ মাসের একটা দিনে, রসিকপুরের রাজবাড়ির জীবনের সমস্যা দুটি সন্ধ্যার উৎসবে যেন সানাই-এর সুরের খেলা হয়ে আর আলোর মেলা হয়ে তারপর মিলিয়ে গেল।

ছেলের বিয়ে দিয়ে তারপর দুটি মাস যেতে না যেতে মেয়ের বিয়ে; বেশ বড় ঘরের সঙ্গে কাজ করলেন কমলবাবু। রাজবাড়ির বনেদি মেজাজ যেন শ্মশানের ধুলো থেকে আবার জীবন্ত ও চাঙ্গা হয়ে উঠে একটা কীর্তি ক'রে রসিকপুর থেকে পাতিপুকুর পর্যন্ত অঞ্চলটার অনেক মানুষের মনে অনেক চমক লাগিয়ে দিল। মেয়ে বিদায়ের দিনে এলাহাবাদের কুটুম্বদের চোখের সামনে একহাজার কাঙ্গালী ভোজন করালেন রসিকপুরের কমল বিশ্বাস। কুটুম্বরাও স্বীকার করলেন, কমলবাবুর অবস্থা পড়ে গেলেই বা কি? সাতপুরুষের সেই বনেদি স্বভাব তো যাবার নয়।

যাবার দিনে অনেক কান্না কেঁদেছিল বাসনা। সুধাময়ী তো সারাটা দিন না খেয়েই আর চোখ মুছে মুছে পার করে দিলেন। মেয়ে-জামাই প্রণাম ক'রে যখন বাগানের পথে এগিয়ে গিয়ে মোটর গাড়িতে উঠলো, এবং কুটুম্বেরাও বিদায় নিয়ে চলে গেল, এবং সব গাড়ির উল্লাসের শব্দ আস্তে আস্তে ক্ষীণ হয়ে গিয়ে যশোর রোডের দিকে ছুটে চলে গেল, তখন কে জানে কি মনে ক'রে, বোধ হয় নিজেরই মনের অগোচর একটা ভুলের আবেগে, কেতকীর হাতের কাছে ভাঁড়ারের চাবিটা ফেলে দিয়ে নিজের ঘরের ভিতরে এসে ঢুকলেন, আর মেঝের উপর লুটিয়ে পড়ে কাঁদতে শুরু করলেন সুধাময়ী।

কিন্তু সুধাময়ীর কাছে দাঁড়িয়ে বেশ শান্ত ও প্রসন্ন মনে একটা হাঁপ ছাড়লেন কমলবাবু। কমলবাবুর চোখে এক ফোঁটাও জল নেই। বরং তাঁর চোখের দৃষ্টি যেন একটা কৃতার্থতার আনন্দে হাসছে। যেন একটা ভার নেমে গেল। অতি দুঃসহ একটা বোঝার পাঁজর-ভাঙ্গা চাপ থেকে মুক্তি পেয়েছেন। এতদিনে হালকা হতে পেরেছেন। আঃ, হাঁপ ছাড়লেন কমলবাবু, এবং সুধাময়ীর দিকে তাকিয়ে বলেন—তোমার মত বোকা হলে আমিও আজ কাঁদতে পারতুম সুধা।

আস্তে আস্তে পায়চারি ক'রে যেন এই হালকা হয়ে যাবার আনন্দটুকু মনে-প্রাণে উপভোগ করতে থাকেন কমলবাবু। এবং সুধাময়ীকে ঐ বোকামির মায়াকান্না থেকে মুক্ত করবার জন্য সান্ত্বনার সুরে যে-সব কথা বলতে থাকেন, সেই কথাগুলিকেও শুনতে ঘুমন্ত মানুষের ভাষার মত মনে হয়।—ভাগ্য আমাকে পিষে মারতে চেয়েছিলো, কিন্তু পারলো না। কিন্তু আমাকে দমিয়ে দিতে পারলো কি কেউ? দেখলে তো সুধা, একে একে সব ঝঞ্ঝাট কেমন ক'রে ঠাণ্ডা ক'রে দিলাম। কারও দয়া মায়া ও অনুগ্রহের ধার ধারতে হলো না। একটি পয়সাও যার সিন্দুকে

ছিল না, সেই মানুষ রাজার মত বড়লোকের ঘরে মেয়ের বিয়ে দিতে পেরেছে, রসিকপুরের সাতপুরুষের সম্মান রক্ষা পেরেছে, এ কি চারটিখানি ব্যাপার? এ কি যে-সে মানুষের ক্ষমতা? আমি বলেই পেরেছি, এবং ঠাকুর আমার সহায় আছেন বলেই পেরেছি।

সুধাময়ী যে স্বামীর মুখে এই ধরণের কথা এই প্রথম শুনছেন, তা নয়। কিন্তু এত তৃপ্ত একটা ভাব নিয়ে; এত উল্লাসের সঙ্গে কমল বিশ্বাসকে গর্ব করতে কোনদিন দেখেননি।

কমলবাবু তেমনি পায়চারি ক'রে যেন আপন মনে বিড়বিড় করেন।—ছেলে আমাকে মনে মনে ঘেন্না করে, মেয়ে আমাকে মনে-প্রাণে ঘেন্না করেছে। আমার মত মানুষ যে ওদের বাপ, এই কথাটা মনে করতেও ওরা কত না দুঃখ পেয়েছে। আমি কিন্তু একটুও দুঃখ করিনি সুধা। এ তো হবেই। ওরা যে জানে, ওদের খাওয়াতে-পরাতে আর লেখা-পড়া শেখাতে টাকা যোগাড়ের জন্য ওদের বাপটা যে কাণ্ড ক'রে ফিরেছে, তা কোন চোর-ডাকাতের পক্ষেও দুঃসাধ্য। কাজেই ···।

সুধাময়ী হঠাৎ বাধা দিয়ে চেঁচিয়ে ওঠেন।—কেন মিছামিছি নিজেকে এত গালমন্দ করছো? যা হবার তা হয়ে গিয়েছে, তুমি এবার জিরোও। ছেলে-মেয়ের ভালমন্দের জন্য আর মাথা ঘামাতে যেও না।

কমলবাবু শান্তভাবে একটা আরামের নিঃশ্বাস ছাড়েন·—না, আর না। আর তো আমার কোন কাজও নেই সুধা। আর কাউকে কিছু বলবার, বাধা দেবার, পীড়াপীড়ি করবার আর ধরে রাখবার কোন ব্যাপার নেই। এবার যে যার নিজের নিজের ভাল বুঝে নিক। আমার কর্তব্য আমি ক'রে দিয়েছি।

চুপ করেন কমলবাবু, সুধাময়ীও চুপ ক'রে বসে থাকেন। দেখে মনে হয়, দুটি চক্রান্তের প্রাণ যেন এতদিন তাদের সব চেষ্টার উপসংহারে এসে শ্রান্ত ক্লান্ত অথচ তৃপ্ত হয়ে গিয়েছে।

অনেকক্ষণ পরে ; এই নীরব বাড়ির স্তব্ধতাকে যেন হঠাৎ ভয় পেয়ে চমকে ওঠেন সুধাময়ী। বোধ হয় মনে পড়েছে তাঁর, এই ভাঙ্গা বাড়ির জীবনটাকে ঘৃণা ক'রে, ভয় পেয়ে, আর রাগ ক'রে আরও যে একজনের চলে যাবার কথা আছে, সেও এইবার চলে যাবে। অতীন তো তার বিয়ের তিনদিন পরে, ফুলশয্যার রাত্রি ভোর হতেই সুধাময়ীকে জানিয়ে দিয়েছে যে, শুধু কর্তব্য হিসাবে বাসনার বিয়ের দিনটা পর্যন্ত সে এই বাড়িতে থাকবে, এবং তারপর একটি দিনও না।

সুধাময়ী ভয়ে ভয়ে বলেন—অতু বোধ হয় কালই চলে যাবে।

কমলবাবু—যাবেই তো। ওর যাওয়াই ভাল।

সুধাময়ী—কিন্তু কেতকী এখনও জানে না যে, অতু চলে যাবে।

কমলবাবুর চোখের দৃষ্টি যেন হঠাৎ আতঙ্কিত হয়, এবং ভ্রুকুটি ক'রে বুঝতে চেষ্টা করেন কমলবাবু—কেতকী ? কেতকী কে ?

সুধাময়ী—কি আশ্চর্য, কেতকী কে, তাও এরই মধ্যে ভুলে গিয়েছ ?

কমলবাবু—ও হ্যাঁ, রামকানাই-এর ভাগ্নী কেতকী ?

সুধাময়ী—ওরকম ক'রে বলতে নেই। শত হোক, সে তো তোমারই ছেলের বউ।

বোধ হয় জোরে চেঁচিয়ে একটা কথা বলতে যাচ্ছিলেন কমল বাবু, কিন্তু হঠাৎ সেই ঝোঁক জোর ক'রে চেপে রেখে কাঁপতে শুরু করেন। পাগলের মত চোখ ক'রে সুধাময়ীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন। তারপরই বিড়বিড় করেন—তুমি ওসব বাজে কথা বলে আমার মন নরম করতে চেষ্টা করো না সুধা। তোমার ছেলে আমাকে বাপ বলে মনে করে না, তোমার ছেলের বউও আমাকে জানোয়ার বলে মনে করবে। ওসব কেতকী ফেতকী এখান থেকে যত শিগগির সরে যায়, ততই ভাল।

হ্যাঁ কেতকী, রামকানাই বাবুর ভাগ্নী কেতকী নামে যে মেয়ে

এই দুমাস হলো এই চক্রান্তের বাড়ির মধ্যে জীবন যাপন করছে, তার কথাই মনে পড়ে সুধাময়ীর, কমলবাবুরও। কমলবাবুর বুঝতে আর কিছু বাকি নেই, কোন সন্দেহ নেই যে, কেতকীও আর একটি দিন এই বাড়িতে থাকতে চাইবে না। কেতকীরও সব বুঝে ফেলতে কি আর কিছু বাকি আছে? যেটুকু বাকি ছিল, সেটুকু আজই সন্ধ্যায় বুঝে নিয়েছে কেতকী।

মেয়ে বিদায়ের সময়; অর্থাৎ বাসনা যখন রঙীন সাজে সেজে স্বামীর পাশে দাঁড়িয়েছে, অজিতের চাদরের সঙ্গে বাসনার আঁচলটাতে একটা গিঁট যখন বেঁধে দিল বাড়ির বউ কেতকী নামে ঐ মেয়ে, তখন কুটুম্বদের মধ্যে কেউ কেউ আপত্তি তুলেছিলেন— কনের হাত দুটো বড় খালি-খালি দেখাচ্ছে।

কেতকীকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে কমলবাবু বললেন— হাতের জিনিস তোমার বাক্সে আরও কিছু আছে নিশ্চয়।

কেতকী বলে—আছে।

কমলবাবু—যা যা আছে, সব বাসনার হাতে পরিয়ে দাও।

সেই মুহূর্তে বাক্স খুলে হাতের অনেকগুলি জিনিস, এক জোড়া কঙ্কন, এক জোড়া ব্রেসলেট আর এক জোড়া বালা নিয়ে এসে বাসনার হাতে পরিয়ে দিল কেতকী। কমলবাবুও হিসেব ক'রে দেখলেন, কেতকীর কাছ থেকে আর নেবার মত বিশেষ কিছু নেই বোধ হয়। গলার সাত ভরির হার, ষোল গাছি চুড়ি, টায়রা আর আর্মলেট, কেতকীর গা থেকে নামিয়ে সবই বাসনার গায়ে তুলে দিয়ে বিয়ের সময়েই বাসনাকে সাজানো হয়েছিল। সেগুলি বাসনার গায়েই থেকে গিয়েছে। ভুলেও সেগুলির দিকে তাকিয়ে একটা প্রশ্নও করেনি কেতকী। বাকি যা ছিল, তা'ও বাক্স থেকে বের ক'রে দিল। কমলবাবু হিসেব ক'রে দেখলেন, হ্যাঁ, সত্যিই কেতকী তার কানের ঐ এক জোড়া দুল ও হাতের দু'গাছি চুড়ি ছাড়া আর সবই ছেড়ে দিয়েছে।

কিন্তু বুঝে তো ফেলেছে। এই ভাঙ্গা বাড়ির যে চক্রান্ত এত স্পষ্ট ক'রে, বলতে গেলে একেবারে হাত তুলে খাবলা দিয়ে কেতকীর সব অলংকার লুট ক'রে নিল, সে চক্রান্তকে এখনও চিনে ফেলতে পারবে না, এত বোকা নয় বি-এ পড়া ঐ মেয়ে।

অতীনকেও চিনে ফেলতে কি কিছু বাকি আছে কেতকীর? নিশ্চয়ই না। সুধাময়ীই বলেছেন, এই দু'মাসের মধ্যে কেতকীর সঙ্গে অতু দু'বার কথা বলেছে কিনা সন্দেহ। কমলবাবুও খবর রাখেন, রাত্রি হলেই অতু একটা চাদর আর বালিস নিয়ে ছাদের উপর ঐ ঘরটারই ভিতরে একটা খাটে শুয়ে পড়ে থাকে, আর রাত জেগে বই পড়ে। কেতকী যে ঘরে থাকে, সে ঘরের বাতি ঠিক রাত দশটায় নিভে যায়। কোন আকুলতা, কোন প্রতিবাদ আর কোন অভিযোগের শব্দ কেতকীর মুখের ভাষায়, কেতকীর কোন আচরণে আজ পর্যন্ত ছটফট ক'রে ওঠেনি।

বাসনার কাছ থেকেও সেই দু'মাসের মধ্যে অনেক কথা শুনেছেন কমলবাবু এবং সুধাময়ী; কেতকী নিজের মুখে বাসনার কাছে যে-সব কথা বলেছে আর হেসে ফেলেছে, সেই সব কথা।

কি? কি বলেছে কেতকী? বাসনার গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন সুধাময়ী।

বাসনা—জিজ্ঞেস করেছিলাম, কেমন লাগছে বউদি?

সুধাময়ী—কি উত্তর দিলে কেতকী?

বাসনা—বললে, বেশ ভাল। বলেই হেসে ফেললো।

হাঁ, কথায় কথায় বাসনার কাছে আরও অনেক কিছু বলে ফেলেছে কেতকী, যা থেকে মনে হয়, এই বাড়ির বুকের ভিতর পোষা যত দারিদ্র্য, যত প্রবঞ্চকতা, যত ধাপ্পা এবং যত ফাঁকির সব কিছুই সে বুঝে ফেলেছে। কে জানে কেমন ক'রে বুঝে ফেলেছে কেতকী, মস্ত বড় চাকরি করে না অতীন, এবং শিগগির বিলেতে গিয়ে কোন পরীক্ষা দেবারও ব্যাপার নেই।

কিন্তু বাসনাকে চমকে দিয়ে একটা অদ্ভুত কথা বলে ফেলেছে কেতকী—একশো দশ টাকা মাইনের চাকরিই বা খারাপ কিসের?

নামে রাজবাড়ি, কিন্তু রূপে একটা রিক্ততার আড়ত এই বাড়ির সব ঘরেরই ভিতরে চারদিকে চোখ ঘুরিয়ে দেখেছে কেতকী কিন্তু চোখের দৃষ্টি একটুও বিচলিত হয়নি। ঘরের মধ্যে আসবাব বলতে যা আছে, সেগুলিকে কোন পুরনো কাঠের দোকান বোধ হয় বিনা দামেও নিয়ে যেতে চাইবে না। বাসনপত্রের চেহারা এবং সংখ্যাও আশ্চর্য রকমের রিক্ত। কাঁসার একটা রেকাবিতে চা খান কমলবাবু, চীনে মাটির একটা পেয়ালাও নেই। ভাত রান্না হয় মাটির হাঁড়িতে, সে হাঁড়ির কানাটা আবার ভাঙ্গা। শ্বশুর বাড়িতে এসে প্রথম দিনেই দেখে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল কেতকী, অমন রোগা শুকনো একটা বুড়ো মানুষ, এই বাড়িরই ছেলে আর মেয়ের বাপ, এই কমল বিশ্বাস বুকের ব্যথায় সারাটা বিকেল আর সন্ধ্যা শুধু কাতরালেন এবং হাঁসফাঁস করলেন, কিন্তু ডাক্তার ডাকা হলো না। মোমের মত সাদা চেহারার এক রুগ্না নারী, এই বাড়িরই ঐ দুটি সুন্দর চেহারার ছেলে আর মেয়ের মা, এই সুধাময়ী শুধু এক ঝিনুক সরষের তেল গরম ক'রে কমল বিশ্বাসের বুকে মালিশ করলেন। রসিকপুরের রাজবাড়ির এই রকমের একটা করুণ রাজসিকতার রূপ শুধু চুপ ক'রে শান্ত চোখের দৃষ্টি দিয়ে দেখেছিল কেতকী। কোন বিস্ময় প্রকাশ করেনি। তাই তো বোঝা যায় যে, সবই বুঝে ফেলেছে কেতকী।

শুধু কেতকী কেন, কেতকীর মামা রামকানাইবাবু এই দু'মাসের মধ্যে দু'বার এসে যে-ভাবে কটমট ক'রে কমল বিশ্বাসের কোটরগত চোখের ধূর্ততা আর শীর্ণ চেহারার ইতরতার দিকে তাকিয়ে চলে গিয়েছেন, তাতে বোঝা গিয়েছে, রামকানাইবাবুর অন্তরাত্মা যেন রেগে পাগল হয়ে গিয়েছে। স্পষ্ট ভাষায় মুখ খুলে বলেই গিয়েছেন রামকানাই বাবু—ভয়ানক অন্যায়, আপনি অমানুষের

মত কাজ করেছেন কমলবাবু। আমি স্বপ্নেও ভাবিনি যে, আপনি এত বেশি মিথ্যা কথা বলতে পারেন।

কমল বিশ্বাসও তাঁর কোটরগত চোখের তীক্ষ্ণতাকে আরও তীক্ষ্ণ ক'রে উত্তর দিয়েছেন—আপনার মত মানুষকে কুটুম বলে মনে করতেও লজ্জা পাচ্ছি। সাবধান যদি ভদ্রভাবে কথা বলতে না পারেন, তবে এখানে আসবেন না।

তবু, এরকম অপমানের পরেও একদিন এসেছিলেন রামকানাই বাবু, এবং ভাগ্নী কেতকীর সঙ্গে আড়ালে দাঁড়িয়ে কি-সব কথা অনেকক্ষণ ধরে আলোচনা ক'রে চলে গেলেন। কমল বিশ্বাসের বুঝতে বাকি নেই, সে-সব আলোচনা কিসের আলোচনা হতে পারে। ভাগ্নীকে এই কপট শ্বশুরবাড়ির কারাগার থেকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চান রামকানাই বাবু, এই তো। ভয়ানক গোঁয়ার আর ভয়ানক জেদী ঐ রামকানাই, যে লোকটা মামলা ক'রে নিজেরই এক জামাইকে জেলে পাঠিয়েছিল ; মেয়েকে নাকি মারধর করতো জামাইটা। সে মেয়ে বিধবা না হয়েও বিধবার চেয়েও মনমরা দশা নিয়ে কিছুদিন বেঁচেছিল, তারপর হঠাৎ একদিন মরে গেল। আইনে না বাধলে মেয়ের আর একটা বিয়ে দেবে রামকানাই, এরকম একটা কথাও শোনা গিয়েছিল। সেই রামকানাই কি তার আদরের ভাগ্নীকেও না সরিয়ে নিয়ে গিয়ে চুপ ক'রে থাকবে ?

কেতকী নামে ঐ ভাগ্নীটী রামকানাই বাবুর কাছে নিজের মেয়ের চেয়ে কম কিসের ? কেতকীর মামী বেঁচে নেই, আপন জন বলতে রামকানাই বাবুর বাড়ির মধ্যে আর কেউ নেই, শুধু ঐ কেতকী ছাড়া ! বড় আদরের, খুব বেশি স্নেহের ভাগ্নী, তাইতো নগদে অলংকারে দশ হাজার টাকা দিয়েও ভাগ্নীকে ভাল ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেবার জন্য এত ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন রামকানাই বাবু।

চিন্তা করতে গিয়ে একটুও উদ্বিগ্ন হন না কমল বিশ্বাস। তিনি

তো এর জন্য প্রস্তুত হয়েই আছেন। মনে-প্রাণে কামনা করেন, এই রকমই কাণ্ড হয়ে যাক। চলে যাক এই বাড়ির একটা অনাবশ্যক প্রাণ।

দরজার কাছে একটা ছায়া যেন উসখুস করছে, কেউ বোধ হয় ভিতরে আসতে চাইছে। দেখতে পেয়েই ভীতস্বরে চেঁচিয়ে ওঠেন কমল বিশ্বাস—কে? কে? কে ওখানে চোরের মত দাঁড়িয়ে?

ছায়াটা দরজার কাছে একটু এগিয়ে আসে, এবং বোঝা যায়, নিতান্তই ছায়া নয়। একটা শাড়ির আঁচল। তারপর একেবারে ঘরের ভিতরে এসেই দাড়ায় সেই মূর্তি, যার শাড়ির আঁচলের ছায়া নড়তে দেখে ভয় পেয়েছিল কমল বিশ্বাস।

আরও ভীত স্বরে এবং একটু কেঁপে উঠে প্রশ্ন করেন কমল বিশ্বাস—অ্যাঁ, তুমি কি মনে করে? তুমি এখানে কেন? কি বলতে চাও তুমি?

কেতকী বলে—আপনি আজ রাত্রে কি ভাত খাবেন?

কমল বিশ্বাসের চোখ ছুটো আতঙ্কিত হয়ে বুঝতে চেষ্টা করে, কেতকীর এই অদ্ভুত কথাটার অর্থ কি? ভাতের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে দেবার মতলব করেছে নাকি রামকানাই-এর ভাগ্নী? অসম্ভব নয়।

কেতকী বলে—ভাত না খাওয়াই ভাল।

কমল বিশ্বাস—তা···তা কিছু একটা খেতে হবে তো। কিন্তু তুমি সেজন্য কেন ব্যস্ত হয়ে······।

কেতকী বলে—রুটি ক'রে দিই। আমার মনে হয় রাত্রিবেলা শুধু দুধ-রুটি খেলে আপনার শরীর ভাল থাকবে।

—কি বললে? ফ্যালফ্যাল ক'রে কেতকীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন কমল বিশ্বাস। তাঁর কোটরগত চোখের সব ধূর্ততা যেন প্রচণ্ড বিস্ময়ের জ্বালায় পুড়তে আরম্ভ করেছে। জীর্ণ

পাঁজরের হাড়গুলি যেন কাতরে কাতরে শব্দ ক'রে বাজছে। নির্বোধ পাগলের মত চোখ, জ্ঞান হারানো রোগীর মত মুখ, কমল বিশ্বাসের সাদা চুলে ভরা মাথাটা ঠক ঠক ক'রে কাঁপে। বিপন্ন মানুষের মত আর্তনাদ ক'রে ওঠেন কমল বিশ্বাস—শুনছো সুধা, কেতকী কি বলছে···আমি যে ওর কথার কোন মানে বুঝতে পারছি না।

কে জানে, এতক্ষণ ধরে কেতকীর ঐ মুখের দিকে তাকিয়ে কি দেখছিলেন সুধাময়ী। হ্যাঁ, গায়ের রংটা সত্যি বেশ কালো। সামনের দাঁতগুলি একটু বড়-বড়, নাকটা মোটা, ঠোঁট দুটো ভারি-ভারি; মিথ্যে নিন্দে করেননি মিহিরবাবুর স্ত্রী, বড় বেশি কুৎসিত বউ এনেছেন আপনারা।

—আমার কথার উত্তর না দিয়ে হাঁ ক'রে কি দেখছো তুমি? কমলবাবুর আর্তনাদের মত স্বরের প্রশ্ন শুনে চমকে ওঠেন সুধাময়ী। এবং তেমনই চমক-লাগা স্বরে উত্তর দেন—তা···ভাল কথাই তো বলছে কেতকী। রাত্রিবেলা তোমার দুধ-রুটি খাওয়াই ভাল।

একেবারে নীরব হয়ে যান কমল বিশ্বাস। সুধাময়ী বলেন—তাই কর কেতকী। ওঁর জন্যে গোটা তিন-চার রুটি ক'রে দাও। কিন্তু···।

কেতকী—কি?

সুধাময়ী—তুমি চা খেয়েছ?

কেতকী—না।

সুধাময়ী হাসেন—এত লজ্জা করছো কেন গো মেয়ে? নিজের দরকার নিজের হাতে ক'রে না নিলে চলবে কি ক'রে? দেখছো তো আমার অবস্থা, দু'পা হাঁটলে ভিরমি খাই, আর কোন কাজের কথাই মনে রাখতে পারি না। এই দুটো মাস তবু জোর ক'রে কোন মতে হেঁসেল আর ভাঁড়ারের দায় নিয়ে খেটেছি, কিন্তু আর তো···।

কেতকী হাসে—আপনি ভাবছেন কেন? আমার দরকার হলে আমি নিজেই চা তৈরী ক'রে নেব।

সুধাময়ী—মনে রেখ; অতুরও চা খাওয়া অভ্যেস আছে।

কেতকী—হ্যাঁ, চা দিয়েছিলাম, কিন্তু খায়নি।

সুধাময়ী—ছি ছি!

বোধ হয় মনের ভুলে চেঁচিয়ে উঠেছেন সুধাময়ী। এরকম একটা ধিক্কার যে হঠাৎ মুখ থেকে বের হয়ে যাবে, ভাবতেও পারেননি। চেঁচিয়ে উঠেই বোধ হয় ভয় পান এবং লজ্জাও পান সুধাময়ী। নতুন বউ-এর কাছে এই বাড়ির একটা গোপন অভিশাপের রহস্যকে কথার ভুলে ধরা পড়িয়ে দিলেন। এবং এই ভুল ঢাকা দেবার জন্য কথার রকম হঠাৎ নরম ক'রে দিয়ে এবং হাসতে চেষ্টা ক'রে অনুরোধ করেন সুধাময়ী—তা, অতুর ওসব খামখেয়ালের জন্য তুমি কিছু মনে করো না কেতকী। তুমি চা খেয়ে নাও।

চলে গেল কেতকী। কমল বিশ্বাস যেন বিচিত্র একটা মূর্চ্ছার মধ্যে তাঁর কথা বলবার শক্তিটাকেও হারিয়ে বসে আছেন। সুধাময়ী ডাকেন—শুনছো।

হাঁসফাঁস করেন কমল বিশ্বাস—শুনছি।

সুধাময়ী—মিছিমিছি কি ভাবছো তুমি?

কমল বিশ্বাসের জীর্ণ পাঁজরগুলি যেন ডুকরে কেঁদে উঠবে। কাঁপতে কাঁপতে আর হাঁপাতে হাঁপাতে বলেন—একটু সাহস দাও সুধা। বড় ঘাবড়ে যাচ্ছি, বড় ভয় করছে। রামকানাই-এর ভাগ্নী চলে যাবে বলে মনে হচ্ছে না।

কমল বিশ্বাসের কোটরগত চোখ ভয় পেয়ে ছটফট করছে, কিন্তু সুধাময়ীর চোখ দুটোতে অদ্ভুত একটা প্রসন্নতা যেন থমকে রয়েছে। ঠাকুরদালানের থামের আড়াল থেকে সেই গল্পের সোনাগুলি যদি হঠাৎ আজ বের হয়ে পড়তো, তবুও বোধ হয় তাঁর

চোখে এরকম খুশির আলো জ্বলে উঠতো না। মনে হয় সুধাময়ীর, এতদিনে ঠাকুর একটা দয়ার মত দয়া দেখিয়েছেন। নইলে……

নইলে কেতকীর মুখ থেকে এরকম অদ্ভুত সব কথা শুনতে পাওয়া যাবে কেন?

পাখা হাতে নিয়ে অনেকক্ষণ-ধরে কমল বিশ্বাসের বিষণ্ণ মূর্তিটাকে বাতাস করলেন সুধাময়ী। তারপর উঠে গিয়ে, কনকচাঁপার সারির ভিতর দিয়ে আরও এগিয়ে গিয়ে, সন্ধ্যার পুকুরঘাটের ঠাণ্ডা জলে স্নান করলেন। একটা মাটির খুরিকে ঘি-এর প্রদীপ ক'রে জ্বেলে নিয়ে ঠাকুর ঘরের ভিতরে গিয়ে ঢুকলেন।

কাজরী চৌধুরীর মত মেয়ের, এবং সেই মেয়েরই ঐ সুন্দর মুখের ছবি যার মন জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে, তার পক্ষে এই পৃথিবীর কোন আধ-সুন্দর মেয়ের মুখের দিকেও তাকাবার জন্য কোন আগ্রহ থাকতে পারে না। তার পক্ষে কেতকীর মুখের মত একটা কুৎসিত মুখের দিকে তাকাবার কোন প্রশ্নই আসে না। এবং সে-মুখ চোখে পড়লে চোখ ঘুরিয়ে নিতে হয়। অতীনের চোখ দুটো লজ্জা পায়।

অতীনের চোখ দুটোও অনেকবার লজ্জা পেয়েছে, কারণ ইচ্ছা না থাকলেও অনেকবার কেতকীর মুখের দিকে তাকিয়ে ফেলতে হয়েছে। কারণ, সকাল বিকেল দু'বেলাই ঠিক সময়ে চা-এর পেয়ালা হাতে নিয়ে অতীনের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে কেতকী। কথা বলেনি অতীন, এবং কেতকী কোন কথা শোনবার আশায় না থেকে নিঃশব্দে চলে গিয়েছে।

এই দু'মাসের মধ্যে মাত্র দু'বার কেতকীর সঙ্গে কথা বলেছে অতীন। নিতান্তই বলবার দরকার হয়েছিল, তাই বোধ হয়।

ফুলশয্যার রাত্রিতে যতক্ষণ ঘরের ভিতরে বাসনা ও নতুন পাড়ার একদল মেয়ের সঙ্গে কেতকীর হাসাহাসি ও গল্পের বাচালতা বেজে চলেছিল, ততক্ষণ একটি কথাও না বলে শুধু নীরব শ্রোতার মত বসেছিল অতীন। ঘরের সেই বাচালতা শুনতে একটুও ভাল লাগেনি। যেন কতগুলি অসার বিদ্রূপ আর বেহায়াপনার মধ্যে প্রশ্নোত্তরের পালা চলেছে।

বাসনা বলে—জান তো বউদি, দাদা হলেন ব্যারাকপুর ক্লাবের টেনিস চ্যাম্পিয়ন ?

কেতকী—জানি না।

বাসনা—জেনে রাখ তা'হলে।

কেতকী—হ্যাঁ, জেনে রাখলাম।

নতুন পাড়ার একটি মেয়ে বলে—অতীনদা'র সঙ্গে টেনিস খেলতে পারবেন তো ?

কেতকী—খুব পারবো।

আর একটি মেয়ে বলে—জানেন বোধ হয়, চন্দ্রশেখর নাটকে অতীনদা কী চমৎকার প্রতাপ সেজেছিলেন ?

কেতকী—জানি না।

—তা হলে জেনে রাখুন।

কেতকী—জেনে রাখলাম।

—তাহ'লে বলুন, থিয়েটারও করতে পারবেন ?

কেতকী—হ্যাঁ।

—প্রতাপের জন্য যদি শৈবলিনী হয়ে ডুবে মরবার দরকার হয় তবে…।

কেতকী—মরবো।

—ভয় করবে না ?

কেতকী—একটুও না।

—আপত্তি করবেন না ?

কেতকী—প্রতাপ যদি বলেন, তবে একটুও আপত্তি করবো না।

বাঃ, চমৎকার! খিল খিল ক'রে হেসে ওঠে বাসনা আর মেয়ের দল।

যখন ঘরের ভিতরে বাইরের কেউ আর ছিল না, বাচাল ঘর স্তব্ধ হ'য়ে গিয়েছিল, তখন বিছানাটার দিকে তাকিয়ে অতীনের মনের ভিতরটা যেন জ্বলে উঠেছিল। বিছানা তো নয়, যেন একটা অদৃশ্য হাড়িকাঠ ওখানে লুকিয়ে রয়েছে। ভয়ানক কুৎসিত একটা স্পর্শের কাছে অতীনের এই সুন্দর শরীরটাকে বলি দেবার জন্য একটা চক্রান্ত ঐ ফুলের আড়ালে লুকিয়ে রয়েছে। দেখতে ঘৃণা বোধ করে অতীন। ওটা যেন অতীনের রক্ত মাংসের আশাটাকে ঠকিয়ে অপমান করবার আয়োজন। তা ছাড়া, ঐ বিছানায় রাত কাটালে অতীনের স্বপ্নটাই যে একজনের কাছে বিশ্বাসহন্তা হয়ে যাবে। তাই কেতকীকে একটা কথা বলতে বাধ্য হয়েছিল অতীন।—আমার ঘুম আসবে না, আমাকে এই চেয়ারে বসেই বই পড়ে রাত কাটাতে হবে। তুমি শুয়ে পড়।

হেসে ফেলেছিল কেতকী, এবং সেই হাসির মধ্যে যেন তীব্র একটা চতুরতার বিদ্রূপ ছিল। রাগ হয়েছিল অতীনের।—তুমি মিছিমিছি হাসলে যে?

কেতকী—মিছিমিছি নয়।

অতীন—তার মানে?

কেতকী—বিছানাটাকে তোমার বড় ঘেন্না করছে।

অতীন—কে বললে?

কেতকী হাসে—কেউ বলেনি। বাসনা শুধু বলেছে যে, তোমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে তোমার এই বিয়ে হয়েছে।

অতীন বলে—কথাটা সত্যি।

কেতকী—সেই জন্যই বলছি, তুমি শুয়ে পড়। আমি বরং লেস বুনে রাতটা কাটিয়ে দিই। সে অভ্যাস আমার আছে।

হ্যাঁ, যখন ভোরের পাখি প্রথম ডেকেছিল, তখন লেস বোনা থামিয়ে ঘরের দরজা খুলে বাইরে এসে পুবের আকাশের দিকে তাকিয়েছিল কেতকী।

আর একদিন, যেদিন রামকানাই বাবু এসে কমল বিশ্বাসের সঙ্গে রাগারাগি ক'রে এবং কেতকীর সঙ্গে আড়ালে কি-সব কথা আলোচনা ক'রে চলে গেলেন, সেইদিন কেতকীকে একবার প্রশ্ন করেছিল অতীন।—কবে যাচ্ছ তা'হলে ?

কেতকী বলে—দেখি কবে যেতে পারি।

তারপর, এই আজ আবার কেতকীর সঙ্গে অতীনের কথা বলতে হলো। এই প্রথম কেতকী নিজে এসে প্রশ্ন করেছে, তাই উত্তর দিতে হলো।

কেতকী বলে—আমি জানতাম, আমারই চলে যাবার কথা। কিন্তু তুমি চলে যাচ্ছ কেন ?

অতীন গম্ভীর হয়ে বলে—তোমার এসব প্রশ্ন করবার কোন অর্থ হয় না। তোমার মামা বলে গিয়েছেন, এই ঠগের বাড়িতে তোমাকে আর একটা দিনও থাকতে দেবার ইচ্ছা তাঁর নেই। কিন্তু লক্ষণ দেখে বুঝতে পারছি, তুমি যাবে না। অগত্যা আমাকেই যেতে হচ্ছে।

কেতকী—আমি এখানে থাকলে তুমি এখানে থাকবে না, এই কি তোমার ইচ্ছা ?

অতীন—হ্যাঁ।

কেতকীর চোখের তারা দুটো কিছুক্ষণ অচঞ্চল হয়ে ঝিকঝিক করে।—কিন্তু এই বাড়ি যাঁর, তাঁর ইচ্ছা এরকম নয়।

—কি বললে ? আশ্চর্য হয়ে চেঁচিয়ে ওঠে অতীন।

কেতকী—হ্যাঁ, তোমার বাবা আমাকে চলে যেতে দিতে রাজি নন।

—মিথ্যে কথা। আবার একটা রুষ্ট সংশয় বেজে ওঠে অতীনের কথায়।

কেতকী বলে—খুব সত্যি কথা। যাঁর বাড়ি তিনি না চলে যেতে বললে তোমার কথায় আমি চলে যাব না।

যেন একটা কালো বজ্র পাথরের মূর্তি, কথাগুলি বলে কিছুক্ষণ শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে কেতকী, তারপরেই আস্তে আস্তে হেঁটে চলে যায়।

ছোট একটা বিছানা বেঁধে রেখেছিল অতীন, এবং ছোট একটা চামড়ার বাক্সে কাপড়-চোপড় ভরা হয়ে গিয়েছিল। অতীনের সঙ্গে চলে যাবার জন্য তৈরী হয়ে আছে ঐ বিছানা আর বাক্স। সেই দিকে চকিতে একটা ভ্রুক্ষেপ করেই ছটফট ক'রে ওঠে অতীন। যেন তার আশার মাথার উপর আড়াল থেকে একটা ভয়ানক চক্রান্তের বাড়ি পড়েছে। হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে যায় অতীন, বারান্দা পার হয়ে একটা ছোট ঘরের দিকে তাকায়। হুঁকোর শব্দ শোনা যায়। চোখ-মুখের উগ্রতা আরও হিংস্র ক'রে নিয়ে একেবারে কমলবাবুর চোখের সামনে এসে চেঁচিয়ে প্রশ্ন করে অতীন—এসব আবার কি শুনছি?

কমলবাবু—কি?

অতীন—একেবারে নতুন কথা।

কমলবাবু হাসেন—কে বললে নতুন কথা?

অতীন—কেতকী চলে যেতে চায়; কিন্তু তুমি নাকি আপত্তি করেছ?

কমলবাবু আস্তে আস্তে হাতের হুঁকোটাকে নামিয়ে রাখেন। তাঁর শীর্ণ গলার ফোলা ফোলা রগগুলি সাপের বাচ্চার মত আরও ফুলে ফুলে কিলবিল করতে থাকে। অতীনের মুখের দিকে কোটরগত চোখের একটা জ্বলন্ত দৃষ্টি ছুঁড়ে দিয়ে বলেন—হ্যাঁ, আপত্তি করেছি।

অতীন—কেন ?

কমলবাবু—কেন আবার কি ? ঘরের বউকে ঘরছাড়া ক'রে পরের বাড়িতে রেখে দেব, এরকম নীচতা রসিকপুরের রাজবাড়ির কমল বিশ্বাসের পক্ষে সম্ভব নয়। তুমি তোমার বাপকে আজও চিনতে পারনি অতীন।

অতীন—ঠিকই, চিনতে পারিনি।

কমলবাবু—হ্যাঁ, এইবার চিনে নাও।

অতীন—কিন্তু নিজের মুখেই যে বলেছিলেন, বিয়ের পরে ও মেয়ের সঙ্গে কোন সম্পর্ক থাকবে না।

কমলবাবু—হ্যাঁ বলেছিলাম, একটা বাজে কথা বলেছিলাম। কিন্তু তুমি শিক্ষিত সুপুত্তুর হয়ে আমার একটা বাজে কথাকে অত শ্রদ্ধা কর কেন ? কোনদিন তো দেখিনি যে, আমার একটা কাজের কথাকে শ্রদ্ধা করেছ।

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে শুনতে থাকে অতীন। ঐ ধূর্ততার আর চক্রান্তের সরীসৃপ যে নিজের ছেলেকেও কামড়াতে পারে, এতটা সন্দেহ করেনি অতীন, এবং সন্দেহ না করাই ভুল হয়েছে।

সুধাময়ী এসে উদ্বিগ্ন চোখ নিয়ে ঘরের ভিতর ঢোকেন। কমল বিশ্বাসও হাঁপাতে হাঁপাতে এবং হঠাৎ বেশ শান্ত হয়ে যেন নিজের মনেই বলতে থাকেন—পারবো না। ঠাকুর আমাকে দিয়ে অনেক বাজে কাজ করিয়েছেন, অনেক বাজে কথা বলিয়েছেন। কিন্তু আর না। কেতকী চলে গেলে আমাদের অমঙ্গল হবে।

অতীন—আমি চলে গেলে মঙ্গল হবে ?

সুধাময়ী হঠাৎ আবেদনের মত করুণ স্বরে বলে ওঠেন—যাট, তুই চলে যাবি কেন ? কে তোকে চলে যেতে বলছে ?

কমলবাবুর গলার স্বর হঠাৎ নরম হয়ে যায়—তুই যাবি কেন অতু ? তুই থাকবি, নিশ্চয় থাকবি। এইবার খেটে খুটে রোজগার ক'রে এই হাভাতে সংসারকে একটু সুখী ক'রে, নিজে সুখী হয়ে···।

হাভাতে সংসার ? অতীনের শিক্ষিত মনের কঠিন আবরণ যেন একটা আঘাত পেয়ে কেঁদে ওঠে। তাহলে কি সেই সেদিনের গল্পটা নিতান্তই একটা মিথ্যা ? কমল বিশ্বাসের সেই সুন্দর বাজে কথাগুলিকে বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় নি, ঠাট্টা ক'রে আর সন্দেহ করে হেসে ফেলতেও চেষ্টা করেছিল অতীন, কিন্তু কি আশ্চর্য, গল্পটার মধ্যে কি ভয়ানক একটা জাদু আছে যেন। ঠেলে ফেলে দিতে চাইলেও গল্পটা যেন মনের ভাবনাগুলিকে জোর ক'রে জড়িয়ে ধরে। তুতেনখামেনের সমাধিতেও কত সোনা ছিল। এ যে ইতিহাসের সত্য। তবে রসিকপুরের দু'শ বছরের পুরনো রাজবাড়ির ঠাকুরদালানের থামের আড়ালে কয়েক কলস সোনা থাকবে, সেটাই বা কি এমন অসম্ভবের ব্যাপার ? অসম্ভব নয়; কমল বিশ্বাস নামে লোকটা যতই মিথ্যেবাদী হোক না কেন।

ঐ সোনার ইতিহাস শোনবার পর থেকে অতীন নিজেও অনেকবার রাত দুপুরে ঘর থেকে বের হয়ে এই ঠাকুর দালানের দিকে তাকিয়েছে, শিউরে উঠেছে অতীনের শিক্ষিত মনের সব সংশয়। এবং সেই সোনার গল্পটাই যেন অতীনের শিরায় শিরায় বিচিত্র এক অনুভবের শিহর ছড়িয়ে দিয়েছে। মিথ্যা না'ও হতে পারে। ঐ গল্পটা শোনবার পর থেকেই যে অতীনের জীবনের একটা অভিমান মিটে গিয়েছে। এই ভাঙ্গা বাড়ির ছেলে হয়ে জন্ম নেবার ভাগ্যটাকে ধিক্কার দেবার সেই অভ্যাসটাও যেন আপনি থেমে গিয়েছিল। ভাঙ্গা ইটের স্তূপের মত এই কাঙ্গালদশার রাজবাড়িকে ঠাট্টা না ক'রে অতীনের চোখ দুটো যেন একটু শ্রদ্ধা ক'রে তাকিয়ে দেখতে পেরেছিল। ভিতরে সোনা আছে, উপরে যতই ধুলো থাকুক না কেন, অতীনের জীবনের অহংকারও যে এই কথাটা ভেবে বেশ খুশি হয়ে উঠে দাঁড়াতে পেরেছিল।

সন্দিগ্ধ অতীন বলে—তুমি এত মুসড়ে পড়ছো কেন ? আর, সব জেনে শুনেও হাভাতে সংসার বলছো কেন ?

ফ্যাল ফ্যাল ক'রে তাকিয়ে বুঝতে চেষ্টা করেন কমল বিশ্বাস—কি বলছিস অতু ?

অতীন—রামকানাইবাবু আমাদের যদিও হাভাতে মনে করেন, কিন্তু আমরা তো জানি যে, একদিন রামকানাইবাবুর মত ওরকম পাঁচটা সেগুন কাঠের কারবারিকে কিনে ফেলতেও আমাদের টাকার অভাব হবে না।

যেন স্মৃতিভ্রংশ হয়েছে, আরও উদাস ও শূন্য দৃষ্টি তুলে অতীনের কথাগুলিকে বুঝতে চেষ্টা করেন কমল বিশ্বাস। তারপরেই তক্ষকের মত শুকনো স্বরে খক খক ক'রে হেসে ওঠেন—সেই সোনার গল্পটা ?

অতীন ভ্রুকুটি করে—গল্প ?

কমল রিশ্বাস—তা ছাড়া আর কি ? শোনা গল্প, শুনতে ভাল লাগে, বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে···কিন্তু তাতে পেট তো চলে না, পেট ভরেও না রে অতু। ওসব গল্প বড় ভয়ানক গল্প, মাথা খারাপ ক'রে দেয়। ওসব নিয়ে মাথা ঘামাসনি বাবা।

কী সুন্দর বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদীর মত কথা বলছে সেই লোকটা, যে এই কিছুদিন আগে শেষ রাত্রের অন্ধকারে বসে ঠাকুরদালানের বারান্দার দিকে তাকিয়ে অতীনের কানের কাছে চাপা-গলায় সাতপুরুষের আগের সঞ্চয় সেই সোনার ইতিহাস বর্ণনা করেছিল। স্বয়ং ঠাকুর পদ্মনাভ পাহারা দিয়ে আগলে রাখছেন সেই সোনা। লোকটা বোধ হয় নিজের বিশ্বাসকেও বিশ্বাস করে না। কিংবা···।

অতীনের বুকের ভিতরে তীব্র বিষের মত যে ব্যর্থতার জ্বালা হঠাৎ উথলে উঠেছে, সেই জ্বালাকে যেন আরও বিষাক্ত ক'রে দিয়ে কমল বিশ্বাস হাসতে থাকেন—তুই সায়েন্স পড়েছিস, ভগবানেও বিশ্বাস করিস না, কিন্তু কি আশ্চর্য, এরকম একটা গল্পকে বিশ্বাস ক'রে বসে রইলি ?

একটা গল্পও বলেন কমল বিশ্বাস। রসিকপুরের এই রাজবাড়ির

প্রতিষ্ঠাতা যিনি ছিলেন, সেই অনিরুদ্ধ বিশ্বাসের পর তিন পুরুষের এক জন, তার নাম ছিল বলরাম বিশ্বাস। তিনি এক অমাবস্যার রাতে সোনার স্বপ্ন দেখে ঘুম থেকে লাফিয়ে উঠে একটা শাবল হাতে নিয়ে ঠাকুরদালানের একটা থামের উপর কোপ দিয়েছিলেন, আর শাবলটা ঠিকরে গিয়ে তাঁর মাথার ওপর পড়েছিল। তারপর পাগল হয়ে গিয়েছিলেন বলরাম বিশ্বাস।

অতীনের মনে হয়, প্রচণ্ড একটা বিদ্রূপের শাবল তার মাথার উপর এসে পড়েছে। এখনি পালিয়ে না গেলে পাগল হয়েই যেতে হবে। রাগ হয় নিজেরই উপর ; কমল বিশ্বাস নামে ধূর্ততার সাধক একটা চিরকেলে চক্রান্তের মানুষকে মনের দুর্বলতার ভুলে বিশ্বাস করেছিল অতীন। বিদঘুটে একটা কুসংস্কারকে মনের ভিতর ঠাঁই দিয়েছিল। ছিঃ।

কিন্তু কমল বিশ্বাসের জীবনের আহ্লাদ যেন উথলে উঠতে চাইছে। গড়গড় ক'রে আর-এক রকমের একটা স্বপ্নের কথা বলতে থাকেন ; সুধাময়ীও মাঝে মাঝে তাঁর মোমের মত সাদা মুখটাকে ছোট ছোট আহ্লাদে হাসির ছোঁয়ায় রঙীন ক'রে নিয়ে সেই সব কথা শুনতে এবং সায় দিতে থাকেন।

কমলবাবু বলেন—আমার বড় ইচ্ছা অতু, দক্ষিণ দরজার বকুল বাগানের ওপাশে মধ্যে কাঠা দেড়েক জমির ওপর নতুন ক'রে দুটো পাকা ঘর তুলি। আর এই ফাটল ধরা ঘরে থাকতে ইচ্ছা হয় না। ভয় হয়, একটা ঝড়ের ধাক্কায় এই ঝুরঝুরে ছাদটা পড়ে যাবে। তা ছাড়া···।

একটু থেমে নিয়ে গলাটা কেশে পরিষ্কার ক'রে নিয়ে কমল বিশ্বাস বলেন—তা ছাড়া ভবিষ্যৎ বলে একটা ইয়ে আছে তো। তুই আছিস, কেতকী আছে, তারপর আমার ভাগ্যে নিশ্চয় নাতির মুখ দেখাও আছে। কাজেই এবার থেকে তোর চাকরির টাকা থেকে কিছু কিছু বাঁচিয়ে দুটো নতুন ঘর তোলবার মত···।

বলতে বলতে থেমে যান কমল বিশ্বাস। কারণ, হঠাৎ ঘর ছেড়ে বের হয়ে গেল অতীন।

বিমর্ষ হয়ে অনেকক্ষণ চুপ ক'রে বসে রইলেন কমল বিশ্বাস আর সুধাময়ী। বারান্দার উপর দুটো শালিক আর এক-দল চড়ুই ঝগড়া বাধিয়েছে, ঝগড়ার কর্কশ শব্দ শোনা যায়। একটু পরে সেই শব্দও হঠাৎ শান্ত হয়ে গেল। সারা বাড়িটা একেবারে সত্যিকারের ধ্বংসস্তূপের মত শান্ত।

কেতকী চা নিয়ে এসে সামনে দাঁড়াতেই কমলবাবু হেসে হেসে প্রশ্ন করেন—আজও কি চা খায়নি অতু ?

কেতকী—না।

সুধাময়ী—অতু কোথায় ?

কেতকী—চলে গিয়েছে।

কাজরী চৌধুরীর চোখে ঠিক সেই, সেই অদ্ভুত রকমের দেখতে একটা দৃষ্টি, সেই নিবিড় পিপাসার বেদনা টলমল করে। একে তো দেখতে সুন্দর, তার উপর সারা মুখ জুড়ে ঐ অলস বিহ্বলতা। গনগনে আগুনের আভার মত একটা রক্তিমতা যেন সর্বক্ষণ ছটফট করে কাজরী চৌধুরীর ঐ মুখে। এবং আজও অতীন বিশ্বাস সেই কাজরীর একটা হাত কোলের উপর টেনে নিয়ে কানের কাছে একটা কথা আস্তে আস্তে বলতেই সেই আগের মতই একেবারে কুণ্ঠাহীন আগ্রহে অতীন বিশ্বাসের সুন্দর চেহারাটার সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে একেবারে স্পষ্ট ভাষায় উত্তর দেয় কাজরী—হ্যাঁ, যেদিন বলবে সেদিন, যখন বলবে তখন।

খুশি হয় অতীন, এবং মনের ভিতর থেকে ছোট একটা উদ্বেগের ছায়াও সরে যায়। এই দু'মাসের মধ্যে মাত্র একটি দিন কাজরী

চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করবার সুযোগ পেয়েছিল অতীন, এবং চিঠি লিখেছিল মাত্র দুটি।

এই কাজরী চৌধুরীর মুখে আর একবার সেই কথা শুনতে পেয়ে আরও আশ্বস্ত হয় অতীন বিশ্বাসের অপরাধী মন। কাজরী বলে—আমি একটুও বাড়িয়ে বলছি না অতীন, আমার প্রাণ চায় তোমাকে নিয়ে এই পৃথিবীর এমন এক জায়গায় জীবনটা কাটিয়ে দিই, যেখানে শুধু তুমি আর আমি।

বিশ্বাস করে অতীন, একটুও বাড়িয়ে বলেনি কাজরী। এই মেয়ে এক আশ্চর্য মনের মেয়ে। টাকার মানুষকে চায় না, পদ সম্মান ও প্রতিষ্ঠার মানুষকে পরোয়া করে না, চায় শুধু মনের মত সুন্দর একটি মানুষকে, এবং সেই মানুষের হাত ধরে বনবাসে চলে যেতেও ওর আপত্তি নেই।

ভালবাসে কাজরী এবং এই ভালবাসার স্বাদ যেন অতীনের প্রতি রক্তবিন্দুর মধ্যে একটা মায়াময় উষ্ণতা মাতিয়ে রেখেছে। যাকে ভালবাসে কাজরী, তার মাইনে যে মাত্র একশো দশ টাকা, সে-কথা ভুলেও বোধহয় কাজরীর মনে পড়ে না। অতীনের ঐ সুন্দর চেহারাটাই যে একটা সম্পদ, এবং সে সম্পদের স্বাদ লাখ টাকার জোরেও কিনতে পারা যায় না। একথা কাজরী চৌধুরীই নিজের মুখে অনেকবার বলেছে।

চন্দননগরের গঙ্গায় সন্ধ্যার আলোর ছবি তরল সোনার মত দোলে, সেই দিকে তাকিয়ে হাত ধরাধরি ক'রে পথ হেঁটে এগিয়ে যেতে থাকে অতীন আর কাজরী।

কাজরী বলে—তুমি জান, আমার এখন আর ওসব ছাই কালচারাল ঝঞ্ঝাট ভাল লাগে না। যতদিন মন ফাঁকা ছিল, ততদিন একরকম ভাল লাগতো। আর্ট এগজিবিশন নিয়ে, ড্রামা নিয়ে, গানের জলসা নিয়ে, পলিটিক্সের ছাই-পাশ নিয়েও অনেক হৈ-চৈ করেছি। কিন্তু তুমি যেদিন থেকে আমাকে ভালবেসেছ সেদিন থেকে...।

হেসে হেসে যেন কাজরী চৌধুরীর কথার একটা ভুল শুধরে দেয় অতীন—তুমি যেদিন থেকে আমাকে ভালবেসেছ।

কাজরী হাসে—হ্যাঁ, একই কথা। সেদিন থেকে শুধু ঐ একটি স্বপ্নই দেখছি, শুধু তুমি আর আমি, দুটো প্রাণের বেঁচে থাকবার মত দুটো ভাত খাবার পয়সা জুটিয়ে নিতে পারলেই হয়ে গেল। পয়সা রোজগারের জন্য বেশি খেটে সময় নষ্ট করার কোন দরকার নেই। সেই সময়টুকু বরং তোমার সঙ্গে···।

বড় জোর শক্ত ক'রে অতীনের হাতটা চেপে ধরে কাজরী। ঠোঁট দুটো থরথর ক'রে কাঁপে। অতীন বিশ্বাসের বুকের বাতাস উতলা হয়ে ওঠে, এবং কাজরীর মুখের দিকে তাকিয়ে পথের সেই মৃদু আলোকেই দেখতে পায় অতীন, বিহ্বল হয়ে থমথম করছে কাজরী চৌধুরীর চোখ, আর সারা মুখে গনগনে আভা।

যে-কথা বলবার জন্য অনেকক্ষণ ধরে মনে মনে চেষ্টা করছে অতীন, এখনও অবশ্য সে-কথা বলা হয় নি। বলতে গিয়ে বড় করুণ একটা কুণ্ঠা বুকের ভিতরে দুরু দুরু ক'রে ওঠে। কাজরী চৌধুরীর এই উদার মনের এই মত্ত ভালবাসার নিষ্ঠাটাকে আরও একটু পরীক্ষা ক'রে দেখতে চায় অতীন।

অতীন বলে—এমন যদি হয় কাজরী, তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হলো না।

কাজরী হেসে ফেলে—তাতেই বা কি আসে যায়? তুমি তো থাকবে। আর, এই পৃথিবীতে একটা ঘরও পাওয়া যাবে, আর সেই ঘরের দরজা বন্ধ করতেও পারা যাবে। কারও সাধ্যি নেই অতীন, তোমাকে আমার কাছ থেকে ছাড়িয়ে নিতে পারবে। কিন্তু কেন···এরকম অদ্ভুত কথা তোমার মনে হচ্ছে কেন? তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে না হবার মত কোন অভিশাপ কি কখনও দেখা দিতে পারে?

অতীন হাসে—বাধা দেখা দিতে পারে।

কাজরী—কোন বাধা মানবো না। যদি বাধা মানবার মত আমার মন হতো, তবে এতদিনে অসিত দত্তের সঙ্গে আমার বিয়ে হয়ে যেত।

বিশ্বাস করে অতীন, একটুও বাড়িয়ে বলেনি কাজরী। সেই কালো মোটা ও খাকি শার্ট পরা ব্যবসায়ী ভদ্রলোক, যিনি চার বেলা গাড়ি বদল ক'রে বেড়াতে যান আর কাজে বের হন, তাঁর নাম অসিত দত্ত। সকাল বেলা একটা টু-সীটার, দুপুরে একটা ইটালীয়ান লিমুজিন, বিকালে বিলাতী টুরার আর সন্ধ্যায় ফরাসী সিডান। অজস্র টাকা আর প্রায় অজস্র বাড়ি জমি ও শেয়ার। ছ-সাতটা রাইফেল আর শর্ট গান নিয়ে শীতকালে সুন্দরবনে হাঁস শিকার করতে যান, সেই অসিত দত্ত আজও অবিবাহিত, এবং কাজরী চৌধুরীর বাবাকে বাড়ি করবার জন্য এক মাড়োয়ারী মহাজনের কাছ থেকে ঋণ পাইয়ে দিয়েছেন, নিজে জামিন হয়ে। কাজরীর বাবা সাধনবাবুরও ইচ্ছা, অসিত দত্তকেই বিয়ে করতে চেষ্টা করুক কাজরী।

অতীন—কিন্তু অসিত বাবুর ইচ্ছেটা কি?

কাজরী—সে ভদ্রলোককে মিথ্যে সন্দেহ করো না অতীন। অসিতবাবু কোনদিন ভুলেও এরম ইচ্ছের কথা বলেননি। আমাদের গ্রেট আর্ট সোসাইটির জন্য তিনি অকাতরে টাকা ঢেলে দেন, এই মাত্র।

অতীন—কিন্তু···।

কাজরী—কোন কিন্তু নেই। আমি টাকার মানুষকে বন্ধু বলে স্বীকার ক'রে নিতে পারি, উপকারীকে শ্রদ্ধা করতে পারি; কিন্তু তাকে স্বামী ক'রে নিতে পারি না। সেই মেয়েই আমি নই।

—বন্ধু? প্রশ্নটা হঠাৎ একটা ছোট আর্তনাদের মত অতীন বিশ্বাসের গলায় চমকে ওঠে।

কাজরী—হ্যাঁ, তার বেশি কিছু নয়। কিন্তু তুমি ··।

বলতে গিয়েই অতীনের মুখের দিকে তাকিয়ে কাজরীর কথার আবেগ যেন হোঁচট খেয়ে থেমে যায়। চুপ ক'রে কি-যেন ভাবে কাজরী। তারপরেই দৃপ্তস্বরে প্রায় চেঁচিয়ে ওঠে,—যদি আর কাউকে বিয়ে করবার দুর্ভাগ্য হয় আমার, তবুও জানবে যে আমি তোমার। যখন ইচ্ছে হবে, যখনই ডাকবে, তখনই আমি তোমার। নামে স্বামী না হলেও তুমি আমার জীবনে স্বামী হয়ে থাকবে। এর চেয়ে বড় আর কোন্ প্রতিজ্ঞা আমার কাছ থেকে আশা কর অতীন ?

কাজরীর চোখের দৃপ্ত চাহনিটাও সজল হয়ে গিয়েছে বলে মনে হয়। অতীন বলে—আমি বিশ্বাস করি কাজরী। তুমিও বিশ্বাস কর, যদি কোন কারণে অন্য কোন মেয়েকে বিয়ে করবার দুর্ভাগ্য আমার হয়, তবুও আমি তোমার।

গঙ্গার একটা ঘাট। নীরব নয়, নির্জনও নয়। অনেকেই বেড়াতে এসেছে। অতীন আর কাজরীও ঘাটের কাছে এসে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে, একটু আরাম ক'রে বসবার মত কোন জায়গা যদি পাওয়া যায়।

জায়গা নেই। কাজরী একটু ক্লান্তস্বরে আনমনার মত প্রশ্ন করে।—এই দু'মাস তুমি কি এমন মহৎ কাজে আটকা পড়ে রইলে যে আমার সঙ্গে মাত্র একটি দিন ছাড়া দেখা করবারই সময় পেলে না ?

কাজরীর হাত ধরে অতীন। কথা বলতে গিয়ে গলার স্বরও ব্যথিত অপরাধীর আক্ষেপের মত করুণ হয়ে ওঠে।—মহৎ কাজে নয়, ভয়ানক অন্যায় কাজে···সত্যিই একটা ট্রাজেডি ঘটে গিয়েছে কাজরী···কিন্তু আমার দোষ নয় কাজরী···বাধ্য হয়ে···একটা কর্ত্তব্যের খাতিরে···বোনের বিয়ের খরচের জন্য বাবাকে টাকা পাইয়ে দিতে গিয়ে নিজেকে এক মিথ্যে বিয়ের কাছে বলি দিয়েছি।

শুনে চমকে ওঠে কাজরীর চোখ। কিন্তু ঐ একবার মাত্র,

তারপর আর নয়। নীরব হয়ে এবং একেবারে সুস্থির হয়ে এই গল্পের আরও কিছু শোনবার জন্য অতীনের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে কাজরী।

অতীন বলে—বাবা ও মা একেবারে ক্ষমাহীন হয়ে দাবি করলেন, বোনের বিয়ের জন্য খরচের সব টাকা আমাকেই দিতে হবে। কাজেই, বাবারই চক্রান্ত মেনে নিয়ে একটা বিয়ে ক'রে নগদে অলংকারে দশ হাজার পণ নিয়ে বাবাকে টাকা পাইয়ে দিয়েছি।

গল্পের এতখানি শোনা হয়ে যাবার পরেও আরও কিছু যেন বাকি আছে, এবং সেটাই বোধ হয় শেষ তথ্য, যা জানবার পর কাজরী চৌধুরীর চোখের ঐ শান্ত কৌতুহল আরও শান্ত হয়ে যাবে।

অতীন হাসে—তবে আমি আমার প্রতিজ্ঞা রেখেছি কাজরী, সে মেয়ের মুখের দিকে কোন দিন ইচ্ছে ক'রে একবার তাকাইওনি। ভাগ্যি এই যে, সেই মেয়ের মুখটা দেখবার মত নয়। আরও ভাল কথা, এহেন মেয়েও আমাকে ঘেন্না ক'রে দূরে সরিয়ে দিতে চায়।

—কেন ? বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করে কাজরী।

অতীন—তা জানি না। কিন্তু মস্ত এক বড়লোকের ভাগ্নী হলেন তিনি, ঐ কেতকী।

ছলছল করলেও কাজরী চৌধুরীর চোখে যেন গভীর এক প্রসন্নতাও জ্বলজ্বল করে। একটুও বিচলিত হয়নি কাজরী। বরং মনে হয়, অতীনের ঐ সুশ্রী ও বলিষ্ঠ মূর্তির দিকে তাকিয়ে কাজরী চৌধুরীর ভালবাসার আশা ধ্রুবজ্যোতির মত জ্বলছে। কাজরী বলে—তোমার জীবনের এই একটা দুঃখের গল্প বলতে তুমি এত ভয় করছিলে কেন অতীন, ছিঃ, আমাকে বোধ হয় আজও চিনতে পারনি।

অতীন—সত্যি ভয় করছিল কাজরী ; তুমি আমাকে ভুল বুঝবে এই ভয়।

কাজরী—একটুও ভুল বুঝিনি। আমার কিছু বোঝবার দারকারও হয় না। আমি শুধু জানি, তুমি আমার। কেতকী নামে সেই মেয়েকে তুমি যদি ভালবেসেও ফেল, তবু তুমি আমার।

শুনে চমকে ওঠে অতীন। অতীন বিশ্বাসের বুকের ভিতরটা যেন এক স্বর্গলোকের ফুলের সৌরভে ভরে ওঠে। এ কি অদ্ভুত আত্মদানের কথা বলছে কাজরী! কী নির্ভয় ভালবাসা! ঐ তো কাজরীর ছুটি ঠোঁট ফোটা গোলাপের মত শোভা ছড়ায়, যে ছুটি ঠোঁটের উষ্ণতা অতীন বিশ্বাসের ভালবাসার কাছে কতবার মত্ত হয়ে আর প্রাণভরা তৃপ্তি গ্রহণ ক'রে তবে স্নিগ্ধ হয়ে গিয়েছে। সেই প্রথম দিনের প্রতিজ্ঞাটা আজও কাজরী চৌধুরীর অন্তরাত্মার কাছে ঠিক সেই শ্রদ্ধায় বন্দিত হয়ে চলেছে। সবই মনে পড়ে অতীনের। শ্রাবণ মাসের সেই অদ্ভুত একটা সজল সন্ধ্যা, কাজরীদেরই বাড়ির সেই ছোট ড্রইংরুম, এবং সেই ড্রইংরুমের ভিতরে উঁকি দেবার মত চক্ষু তখন বাড়িতে ছিল না। বাড়ির সকলেই কলকাতার এক বিয়েবাড়ির উৎসবে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে চলে গিয়েছিল। মনে পড়ে অতীনের, কাজরী চৌধুরীর সেই এলোমেলো রূপের অদ্ভুত ছবিটাকে মনে পড়ে। জলের ঢেউ-এর আঘাতে আহত ব্যথিত ও অবসন্ন হয়েও পদ্মফুলের রূপ যেমন ক'রে হাসে, ঠিক তেমনই হাসি ফুটে উঠেছিল কাজরীর মুখে। কী গভীর কাজরী চৌধুরীর সেই ক্লান্তির আনন্দ, কী সুন্দর সেই মূর্চ্ছা! অতীন বিশ্বাসের একটা হাত সাগ্রহে বুকের কাছে টেনে নিয়ে বলেছিল কাজরী, মরবার সময়েও তোমার কাছ থেকে এই সর্বনাশের সুখ পেতে চাই অতীন। তুমি আমার স্বামী।

আজও আবার, এই সন্ধ্যায় গঙ্গার ঘাটের কাছে আলো-ছায়ার মধ্যে দাঁড়িয়ে কাজরী চৌধুরীর মুখে দপ ক'রে সেই গনগনে

আগুনের আভা চমকে ওঠে। কাজরী বলে—কা'কে স্বামী বলে, কোন্ গুণে স্বামী হওয়া যায়, সে-কথা তোমার কাছে বলে দিতে আমার কোন লজ্জা হয়নি। এর পর তোমার ভয় করবার কোন কথাই থাকতে পারে না অতীন।

অতীন বিশ্বাসের মন বিপুল এক গর্বের উৎফুল্লতায় চঞ্চল হয়ে ওঠে। কাজরীর কথাগুলি যেন অতীনের সার্থক পৌরুষের প্রতি এক জয়ধ্বনিমুখর অভিনন্দন! এই তো সেই নারী, যার সঙ্গে জীবনে মরণে এক হয়ে মিশে থাকতে পারলে জীবন ধন্য হয়ে যায়। অতীন বলে—না, কোন ভয় করি না কাজরী। তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হবেই হবে। শুধু একটু সময় লাগবে, এই মাত্র। কেতকী কোন বাধা হবে না।

কাজরী—তার মানে ?

অতীন—তার মানে আইনের সাহায্য নিতে হবে। ততদিন…।

কাজরী—কি ?

অতীন হাসে—ততদিন আমাকে শ্যামবাজারের ঐ মেসবাড়ির কুঠুরিতে থাকতেই হবে।

কাজরী—আজকাল কোথায় থাক তুমি ?

অতীন—ঐ মেসবাড়িতে। আপাতত বাড়ি ফেরবার উপায় নেই।

কাজরীর চোখ আবার ছলছল করে—আমাকে তুমিও বড় বেশি ভালবেসে ফেলেছো অতীন। দুঃখ শুধু এই যে, আমার জন্যে তোমাকে এত ঝঞ্ঝাট ভুগতে হচ্ছে।

অতীন হাসে—এ আর কি এমন ঝঞ্ঝাট ? গল্পে পড়েছি, ভালবাসার বিল্বমঙ্গল ঝড়ের রাতে নদীর জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছিল, প্রেমিকার কাছে যাবার জন্য।

কাজরী হাসে—তাহ'লে আমিও তোমার প্রেমিকা, শুধুই প্রেমিকা, কেমন ?

অতীন—না, শুধু তাই নয়। তার চেয়ে আরও কিছু বেশি।

কাজরী—কি ?

অতীন—আমি অত বোকা নই কাজরী। আর আমাকে ঠকাতে পারবে না।

কাজরী—তবু তো মুখ খুলে বলতে পারছো না।

অতীনের চোখ দুটো বিহ্বল হয়ে ওঠে। কাজরী চৌধুরীর কানের কাছে মুখটা এগিয়ে দিয়ে আস্তে আস্তে বলে—স্ত্রী।

কাজরীর চোখে সজল হর্ষ ঝিকমিক করে—সে তোমার দয়া।

রসিকপুরের রাজবাড়ির দক্ষিণ দরজার বাগানের ভিতরে যে ছোট পুষ্করিণীটা ছিল, সেটার জল মরে গিয়ে যেদিন একেবারে শুকনো খটখটে হয়ে গেল, সেদিন বুঝতে পারলেন কমল বিশ্বাস, আর একটা বৈশাখ পার হয়ে জ্যৈষ্ঠও শেষ হতে চলেছে, দেখতে দেখতে একটা বছর পার হয়ে গিয়েছে, কিন্তু অতীন নামে সেই ছেলের মনে বাড়ি ফিরবার মত মায়ার টান দেখতে পাওয়া গেল না। এক বছরের মধ্যে অতীনের কাছ থেকে মোট তিনখানা চিঠি এসেছিল, চিঠিতে অতীনের ঠিকানাটা পর্যন্ত লেখা নেই। চিঠির বক্তব্য খুবই সংক্ষিপ্ত।—যদি কোনদিন দরকার মনে করি, তবে বাড়ি ফিরবো, নচেৎ নয়। যদি সামর্থ্য হয়, তবে টাকা পাঠাবো নচেৎ নয়। আমাকে বাদ দিয়ে যদি তোমরা সুখে থাকতে পার, তবে সেটা সুখেরই কথা।

বুকের ব্যথায় ছটফট ক'রে ভাঙ্গা চেয়ারে বসে সারা দুপুর হাই তুলেছেন কমল বিশ্বাস এবং সারা দুপুর পাখা হাতে নিয়ে তাঁর মাথায় বাতাস দিয়েছে যে, সে হলো কেতকী। সুধাময়ীকে ঘরের কোন কাজই করতে দেয় না কেতকী, এমন কি কমলবাবুর মাথায় পাখার বাতাস করবার কাজটুকুও না।—আপনিই যদি এই ভাঙ্গা

শরীর নিয়ে এসব কাজ করবেন, তবে আমাকে এখানে এনেছেন কেন? শাশুড়িকে এই ধরণের কথা অনেকবার শুনিয়ে দিয়েছে কেতকী। শুনে সুখাধময়ীর দু'চোখ ভরে অদ্ভুত এক আনন্দের জ্যোতি হেসে উঠেছে, আর কমলবাবু হাঁউ-মাউ ক'রে কেঁদে ফেলেছেন।

বড় করুণ এই কান্না। কমল বিশ্বাসের চক্রান্তময় ধূর্ত জীবনটা যেন অকল্প্য এক বিস্ময় সহ্য করতে গিয়ে এইভাবে যখন তখন কেঁদে ফেলে। কে জানে কার আশীর্বাদে তাঁর জীবনের সকল বিষ হঠাৎ মধু হয়ে গেল? কেতকী, কেতকী মা! ডাক দিয়েই ছোট ছেলের মত কঁকিয়ে কঁকিয়ে কাঁদতে থাকে পঁয়ষট্টি বছর বয়সের মানুষটা।

কেতকী এসে ধমকের সুরে কথা বলে—আপনি অকারণ এরকম হা হুতাশ করলে আমি বড্ড রাগ করবো।

কমলবাবু—রাগ কেন, তুমি প্রাণভরে আমাকে ঘেন্না কর কেতকী, তাহলে বরং আমি একটু খুশি হতে পারব।

উত্তর দেয় না কেতকী। নিজের মনের আবেগে ঘুরে ফিরে কাজ করতে থাকে। এবং নিজেও আশ্চর্য হয়ে, মনের অনেক প্রশ্ন চিন্তা সন্দেহ আর যুক্তিগুলিকে খাটিয়ে খাটিয়ে বুঝতে চেষ্টা করে, কেন, কেন এবাড়ির এই দুটো বুড়ো মানুষের মুখের দিকে তাকালে এত মায়া লাগে? মামা বলেন, এরা হলো ভয়ানক চক্রান্তের বুড়ো-বুড়ি, মানুষের সংসারকে ঠকিয়ে শুধু দুপয়সা বাগাবার জন্য মতলব ফাঁদছে। কিন্তু কেতকী যে নিজের চোখেই স্পষ্ট ক'রে দেখতে পেয়েছে; জীবনে কিছুই বাগাতে পারেনি এই বুড়োবুড়ি। বরং মনে হয়, মানুষের সংসারটাই ওদের ঠকিয়ে একেবারে কাঙ্গাল ক'রে দিয়ে আর ভেঙ্গে-চুরে একটা কাঁটাবনের ভিতর ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে।

কমলবাবুও উঠে গিয়ে জীর্ণ শরীরটাকে টেনে টেনে ঠাকুর-দালানের দরজার উপর গিয়ে শ্রান্তভাবে এলিয়ে দেন। বাবুই

পাখির ছেঁড়া বাসা, বুড়ো সাপের খোলস, শিরীষের শুকনো শুঁটি গরম হাওয়ার ঝড়ে ছিটকে এসে বারান্দায় ছড়িয়ে রয়েছে। এই জীর্ণতার সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে দিয়ে চুপ ক'রে বুকের অন্য রকমের একটা ব্যাথা সহ্য করতে চেষ্টা করেন। না, কাঁদবার দরকার কি? অনেক পুণ্য ছিল জীবনে, নইলে যে মেয়ের সৌভাগ্যকে খুন করা হলো, সে মেয়েই এই বাড়ির সৌভাগ্য হয়ে উঠবে কেন?

—সুধা! ডাক দিতেই সুধাময়ী আসেন।

একটা গল্প বলেন কমলবাবু।

—দক্ষিণ দরজার যে পুকুরটা শুকিয়ে গিয়েছে, তার তলা থেকে ছোট একটা ইঁটের ঘর উঁকি দিয়ে রয়েছে, চোখে পড়েছে তো সুধা?

—হ্যাঁ।

—ঐ ঘরের ভিতর কি আছে জান?

—না।

—এই বাড়ির একটা পুরনো অভিশাপের চিহ্ন ওর ভিতরে লুকিয়ে আছে।

—অভিশাপের চিহ্ন? ভয় পেয়ে প্রশ্ন করেন সুধাময়ী।

—হ্যাঁ, একটা খড়্গ, যে খড়্গে একবার নরবলি দিয়ে দেবীর তুষ্টি করেছিলেন চার পুরুষ আগের ভৈরব বিশ্বাস।

সুধাময়ী—ওতে কি আর দেবী তুষ্ট হন, কখনই না।

কমলবাবু হাসেন।—দেবী তুষ্ট হয়েছিলেন কিনা জানি না, কিন্তু সেই ভৈরব বিশ্বাস ঐ খড়্গ দিয়ে এক সুন্দরী বিধবাকেও দু' টুকরো ক'রে কেটে ফেলেছিলেন।

শিউরে ওঠেন সুধাময়ী—কেন?

কমলবাবু—সেই বিধবা ছিল পরমা সুন্দরী; এই বাড়িরই দাসী

ছিল। পরম শাক্ত ভৈরব বিশ্বাসের সঙ্গে নির্জনে বসে তন্ত্রমন্ত্র করতে রাজি হয়নি, এই ছিল তার অপরাধ।

সুধাময়ী—তারপর ?

কমলবাবু—তারপর আর কি ? ফাঁসি থেকে বাঁচবার জন্য লাখ টাকা খরচ ক'রে মামলা লড়লেন, শেষ পর্যন্ত বেঁচেও গেলেন ভৈরব বিশ্বাস। রাজযক্ষ্মায় যেদিন মারা গেলেন ভৈরব বিশ্বাস, সেদিনই তাঁর ছেলেরা পূজো ক'রে মাটির গভীরে সেই নরবলির খড়্গকে ইঁটগাঁথা করে পুঁতে ফেললেন, আর তার উপরে ছোট একটা পুষ্করিণী বেঁধে দিলেন। কিন্তু বিশ্বাসবাড়ির ভাগ্যে সেই যে ভাঙ্গন ধরলো, তা আর থামলো না। আজও থামেনি সুধা।

সুধাময়ী সান্ত্বনা দেন—এসব গল্প ভুলে যাওয়াই ভাল।

চেঁচিয়ে ওঠেন কমল বিশ্বাস—কি করে ভুলবো ? আমিও যে নরবলির মত কাজ করেছি।

সুধাময়ী তেমনি অবিচলিত স্বরে আবার কমল বিশ্বাসের আত্মধিক্কারের জ্বালাগুলিকে শান্ত করতে চেষ্টা করেন,—তুমি বিশ্বাস কর, কেতকী সব ভুলে গিয়েছে, সে আমাদের একটুও ঘেন্না করে না। নিজের মুখে কেতকী আমাকে বলেছে, আমরা চলে যেতে না দিলে সে কখনও চলে যাবে না।

কমলবাবুর গলার স্বর কুণ্ঠিত হয়ে কাঁপতে থাকে।—কিন্তু এইবার বোধহয় চলে যেতে বলতে হবে।

সুধাময়ী—কেন ?

কমলবাবু—আর যে দশটা টাকাও হাতে নেই। সব ফুরিয়েছে। বাস্তুর বিয়ের খরচ কুলিয়ে যা হাতে ছিল তাই দিয়ে একটা বছর চলেছে। কিন্তু আর তো চলবে না।

একটু থেমেই ফুঁপিয়ে ওঠেন কমল বিশ্বাস—কিন্তু আমি তো আর পারবো না সুধা। ভগবান এসে সাহস দিলেও আর আমার পক্ষে মানুষকে কথার চালাকিতে ভুলিয়ে দুটো টাকা বাগাবার

চেষ্টা সম্ভব হবে না। উপোস ক'রে মরে যাবার জন্য তৈরী থাক সুধা, আর, সেজন্য এক ফোঁটা দুঃখ করো না। মরবার আগে ঠাকুরকে বলে যাব, শেষ পর্যন্ত ভালই করলে ঠাকুর।

সুধাময়ী চোখে আঁচল চাপা দেন। কমলবাবু বলেন—শুধু কেতকীকে কোনমতে ভুলিয়ে-ভালিয়ে ওর মামার কাছে পাঠিয়ে দিতে হবে।

সুধাময়ী বলেন—তা না হয় হ'লো, কিন্তু কেতকীর জীবনটা কি এভাবে সিঁথিতে সিঁদুর রেখেও বিধবা হয়ে থাকবে?

কমল বিশ্বাসের কোটরগত চোখ থেকে আগুনের আভা ছিটকে পড়ে। গলার রগগুলি আবার হিংস্র হয়ে কিলবিল করে। চেঁচিয়ে ওঠেন কমল বিশ্বাস—যদি সত্যি কথা আমার কাছ থেকে শুনতে চাও সুধা, তবে বলতে পারি।

সুধাময়ী—বল।

কমল বিশ্বাস—কেতকীর বিধবা হয়ে যাওয়াই ভাল।

সুধাময়ী চমকে উঠে আর্তনাদ করেন—ঠাকুর!

ঠাকুরদালানের বারান্দার নিভৃতে এই সব অসহায় আক্ষেপ আর আর্তনাদের বেদনাগুলিকেই চমকে দিয়ে একটা হাসিমাখা স্বর ব্যস্তভাবে কাছে এগিয়ে আসতে থাকে। কেতকীর গলার স্বর বলে মনে হয়।—মা আপনি কোথায়? ডাকতে ডাকতে এই দিকেই বোধ হয় এগিয়ে আসছে কেতকী।

এগিয়ে আসে কেতকী, কেতকীর হাতে একটা চিঠি। চিঠিটা খোলা। কেতকীর সেই কালো মুখের উপর ঝকমক করছে অদ্ভুত একটা প্রসন্নতার হাসি। তবে কি সত্যিই কেতকীর সিঁথির ঐ সিঁদুর জয়ী হয়েছে, সত্যিই কি চিঠি লিখেছে অতীন? সুধাময়ী কমল বিশ্বাসের দিকে তাকিয়ে অনুযোগ করেন—তুমি অকারণে বড় বেশি ভয়ানক কথা বলতে পার। এখন বোঝ।

কমল বিশ্বাস বুঝতে না পেরে হাঁ ক'রে তাকিয়ে থাকেন। কেতকী এসে হাসতে হাসতে বলে—এখন আপনি আমাকে অনুমতি দিন বাবা।

কমলবাবু—বল, কিসের অনুমতি চাও।

কেতকী—একটা চাকরি পেয়েছি, পাইকপাড়ার একটা মেয়ে স্কুলে পড়াতে হবে। মাইনে পঁচাশি টাকা। তিন মাস ধরে চেষ্টা করছিলাম। অনেক চিঠি লিখেছি, অনেক কেরামতির সার্টিফিকেট পেশ করেছি, তবে স্কুল কমিটি খুশি হয়েছেন। এই মাসেই, আর পাঁচ দিনের মধ্যে কাজে লেগে যেতে হবে।

কমল বিশ্বাসের শীর্ণ বুকের পাঁজরগুলি বোধ হয় এখনি কড়মড় ক'রে ভেঙ্গে যাবে। এই বিস্ময় সহ্য করবার শক্তি নেই তাঁর। মানুষকে এত মহৎ হতে দিতে রাজি নন কমলবাবু। এ কি ভয়ানক সর্বনেশে মহত্ত্ব! চিৎকার করে ওঠেন কমল বিশ্বাস—না, অনুমতি দিতে পারি না কেতকী। তুমি আমাদের বড় বেশি নীচ ঠাউরেছ। কিন্তু আমরা তা নই। উপোস করে মরতে রাজি আছি, তবু তোমাকে খাটিয়ে বেঁচে থাকবার ভাত জোগাড় করতে রাজি নই। তুমি আজই তোমার মামার কাছে চলে যাও।

চুপ ক'রে মাথা হেঁট ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে কেতকী। সুধাময়ীই সমস্যাটাকে সামলাবার জন্য বলেন—তুমি এখন ঘরে যাও কেতকী। পরে কথা হবে। হঠাৎ এরকম একটা অনুমতি চেয়ে বুড়ো মানুষকে চমকে দিতে নেই।

কেতকী চলে যাবার পর সুধাময়ী বলেন—তুমি একটা কথা বুঝতে পারছো না।

কমলবাবু—কি ?

সুধাময়ী—কেতকী কেন কিসের জন্য এখানে পড়ে থাকতে চাইছে, সেটা তুমি বুঝতে পারতে, যদি মেয়ে মানুষ হতে।

কমলবাবু—বুঝতে পারছি না ঠিকই।

সুধাময়ী—কেতকীর মনে আশা আছে, ওর স্বামীকে একদিন পাবেই পাবে। শুধু দিন গুনছে কেতকী।

বিদ্রূপ করেন কমল বিশ্বাস—কে ওর স্বামী? তোমার ঐ সুন্দর পশুর মত দেখতে ছেলেটি?

সুধাময়ী বিরক্তি হন।—কিন্তু কেতকীর ইচ্ছাকে বাধা দিও না। ধরে নাও, কেতকী তোমার নিজেরই মেয়ে। গরীব বাপ-মার সাহায্যের জন্য মেয়ে কি চাকরি করে না?

করুণভাবে হেসে ফেলেন কমল বিশ্বাস—নিজের মেয়েকেও তো দেখেছ সুধা, মিছে আর ওরকম তুলনা করো না। যাক সে কথা, নিজের স্বার্থের বেলায় পরের মেয়েকে আপন মেয়ে ভাবতে বেশ ভালই লাগে। বেশ; কেতকীকে তবে বলে দাও, আমার আপত্তি নেই। আমার আপত্তি করবার শক্তি নেই। উপায় নেই।

বলতে বলতে মাথা হেঁট করেন কমল বিশ্বাস। সুধাময়ী বলেন—দুঃখ করো না।

কমল বিশ্বাস বলেন—দুঃখ করছি না সুধা। আজ যদি কেউ সন্দেহ করে যে, এই ভাঙ্গা নোংরা বিশ্বাসবাড়ির ভেতরে সোনা আছে, তবে সেটা ভুল সন্দেহ হবে না সুধা।

দক্ষিণ দরজার বাগানের ভিতর যে ছোট পুষ্করিণী একেবারে শুকিয়ে খটখটে হয়ে গিয়েছিল, সেই পুষ্করিণী আবার জলে ভরে গিয়েছে। এবছর আসল বর্ষা নেমেছিল ভাদ্রের শেষে। সেই ছোট ইটগাঁথা কুঠুরিটা, যার ভিতরে বিশ্বাসবংশের অভিশাপের প্রতীক সেই নরবলির খড়্গ সমাধিস্থ হয়ে আছে, সে কুঠুরি আবার জলের আড়ালে ঢাকা পড়ে গিয়েছে। ঠাণ্ডা ঘোলাটে জল, সে জলের উপর ব্যাঙের দল অকারণে লাফালাফি করে।

অতীন এসেছে। চমকে উঠেছে সুধাময়ীর আশা, তবে কি

সত্যিই এতদিন পরে মনে হয়েছে অতীনের, এই ভাঙ্গা বাড়িতে সোনার মত মনের একটা মানুষ আছে? তাই তো মনে হয়। নইলে হঠাৎ এভাবে চলে আসবে কেন অতীন, এবং এসেই এত শান্তভাবে এই বাড়ির সারা দিনের যত সমাদর আর স্নেহ স্বীকার ক'রে নিয়ে ঘরের ভিতর বসে থাকবে? কমল বিশ্বাসের কঠোর অবিশ্বাসও অপ্রস্তুত হয়ে গিয়েছে। তাই তো? তবে কি এই ভাদ্রের জলে বিশ্বাসবাড়ির অভিশাপ গলে পচে মিলিয়ে গেল?

সব চেয়ে বেশি আশ্চর্য করেছে কেতকী। কমলবাবুর কাছে গিয়ে বারবার মনের আনন্দ চাপতে না পেরে ফিসফিস করেছেন সুধাময়ী, তাঁর মোমের মত সাদাটে চেহারা যেন আবার রক্তের ছোঁয়া পেয়ে একটু লালচে হয়ে উঠেছে।—কেমন? দেখলে তো, আমার কথা সত্যি হলো কি না। ঠাকুর অত নিষ্ঠুর হতে পারেন না। যা আশা করেছিলাম, তাই হলো। তুমি মিথ্যে সন্দেহ ক'রে মিছিমিছি এতদিন নিজেকে মিথ্যে কষ্ট দিলে।

সাতদিনের ছুটির আবেদন ক'রে স্কুলে চিঠি পাঠিয়েছে কেতকী। এবং, সারাটা দিন কাজের মধ্যেই ব্যস্ত হয়ে রয়েছে। সুধাময়ী লক্ষ্য করেছেন, কেতকীর এই ব্যস্ততা যেন এক ব্রতিনী মেয়ের উল্লাস আর উৎসাহ, যার মানত সফল হয়েছে এতদিনে। অতীন এসে পৌঁছবার পর দশ মিনিটও পার হয়নি, চা-এর পেয়ালা ও খাবারের ডিশ হাতে ক'রে নিজেই অতীনের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে কেতকী। এবং অতীনও নিঃশব্দে বসে চা-খাবার খেয়েছে।

অতীনের চোখের সামনে দিয়ে বার বার কতবার যাওয়া আশা করেছে কেতকী; কেতকীর ঐ শান্ত আর হাসিমাখা মুখটাকে কতবার তাকিয়ে দেখেছে অতীন; কিন্তু লক্ষ্য করেন সুধাময়ী; কেউ কারও সঙ্গে একটা কথাও বলে না। বলবেই বা কি ক'রে? দু'জনের মাঝখানে যে মস্ত একটা অভিমান জমে রয়েছে। সে

অভিমান হঠাৎ ভাঙ্গবার নয়। ভাঙ্গনের মুখে এসে পড়লে অভিমান জিনিসটা এইরকমেরই গম্ভীর ও আরও কঠোর হয়ে ওঠে।

সুধাময়ীকে ব্যস্ত হতে হয়নি, কিছুই বলতে হয়নি, কেতকী তার নিজের ইচ্ছা মত রেঁধেছে। এবং দেখে খুশি হয়েছেন সুধাময়ী, রান্নাতেও এই মেয়ের হাতে এত গুণ ছিল। যেন মনের সব সাধ আর হাতের সব যত্ন ঢেলে দিয়ে রকমারি খাবার রান্না করেছে কেতকী। জীবনের এতদিনের একটা সার্থক অপেক্ষাকে, সব চেয়ে বড় আশাকে যেন অভ্যর্থনা করছে কেতকী।

বিকাল হতেই বাগানের চারিদিকে বেড়িয়ে এসে কমলবাবুর সামনে দাঁড়িয়ে প্রথম কথা বলে অতীন—কেতকী একটা কাজটাজ করছে বলে মনে হলো।

অপ্রসন্নভাবে শুকনো চোখ তুলে উত্তর দেন কমলবাবু—হ্যাঁ। কিন্তু…।

অতীন—কি ?

কমলবাবু—তুমি কি খবরটা আগেই জানতে ?

অতীন—না। একটা মেয়ে স্কুলের গাড়ি এল আর চলে গেল, তাই দেখে সন্দেহ হলো।

কমলবাবু—সন্দেহ ?

আর কোন কথা না বলে চলে যায় অতীন। কমল বিশ্বাসের কোটরগত চোখ আবার জ্বলতে শুরু করে। বৃথা চোখ বুঁজে ঘুমিয়ে পড়বার চেষ্টা করেন কমলবাবু; ঘুম আসে না। এবং সন্ধ্যা হতেই মস্ত বড় চাঁদের আলো যখন ঘরের জানালায় লুটিয়ে পড়ে, তখন সুধাময়ীকে ডাক দিয়ে কাছে এনে বলেন—আমার সন্দেহ হয় সুধা, তুমি বৃথা আনন্দ করছো।

সুধাময়ী—কেন ?

কমল বিশ্বাস—তোমার ছেলের গলায় মানুষের গলার স্বর

শোনা গেল না। মনে দরদ থাকলে কোন ছেলে ওরকম ক'রে বাপের সঙ্গে কথা বলে না।

সুধাময়ীও হতাশভাবে বলেন—যাই হোক, আমাদের ওপর কোন দরদ থাক বা না থাক, ওর মনে কেতকীর জন্য যদি দরদ দেখা দিয়ে থাকে, তবেই ঠাকুরের দয়া হয়েছে বুঝতে হবে।

কমল বিশ্বাসের গলার স্বরও সব সন্দেহ ঠেলে দিয়ে যেন প্রার্থনার সুরের মত কেঁপে ওঠে। —তাই হোক, ঠাকুর করুন, তাই যেন হয়।

ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে ভিতরের দিকে অনেক দূরের একটা দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে সুধাময়ীর চোখে আশার আলো আবার ঝিলিক দিয়ে ওঠে। সুধাময়ী বলেন—বেশ তো দু'জনে মুখোমুখি বসে গল্প করছে দেখছি।

কমলবাবু উৎফুল্লভাবে বলেন—করুক করুক, তুমি আর ওদিকে যেওনা সুধা।

ওদিকে ভিতরের বারান্দায় যেখানে প্রকাণ্ড একটা ফাটল-ধরা আয়না দেয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে পড়ে আছে, তারই কাছে একটা চেয়ারের উপর বসে আছে অতীন, আর অতীনের চোখের সামনেই একটা মোড়ার উপর বসে আছে কেতকী। দেয়ালের একটা খোপে একটা মোমবাতি জ্বলে, তারই ছায়া পড়েছে আয়নার বুকে, এবং দেখে ঠিক বোঝা যায় না, আয়নার বুক হাসছে না জ্বলছে?

কেতকীর চোখ দেখেও বোঝবার উপায় নেই, সে চোখ জ্বলছে না হাসছে? নামে স্বামী হয়েও জীবনে স্বামী হয়নি যে সুন্দর চেহারার মানুষটি, সে-ই আজ কেতকীর চোখের কাছে বসে আছে। হালকা বাতাসে কেঁপে কেঁপে দুলছে অতীনের মাথার ঢেউ-খেলানো চুলের এক একটা হালকা স্তবক। পাতলা আদ্দির জামা ফুঁড়ে অতীনের সেই চেহারার উচ্ছল স্বাস্থ্যের রক্তিমতা যেন আভা হয়ে ফুটে উঠেছে। কালো চোখ দুটোও গভীর দীঘির

কালো জলের ছবির মত টলমল করে। কেতকীর জীবনের সব ধরা-ছোঁয়ার বাইরে একটা ভিন্ন জগতের মানুষ হয়ে গিয়েছে যে, সেই মানুষকে চোখের কত কাছে দেখতে পাচ্ছে কেতকী। তবু বোঝা যায় না, এবং কেতকী নিজেও বুঝতে পারে না, সত্যিই কি কেতকীর চোখ দুটো মুগ্ধ হয়ে যাবার জন্যে ছটফট করছে। কিসের জন্য; কেন ডেকেছে অতীন, অনুমান করতে পারেনি কেতকী। শুধু ডেকেছে অতীন, এবং ডাক শোনা মাত্র কাছে এসে বসেছে।

অতীনের অবশ্য বুঝতে একটুও দেরি হয়নি, কেন ডাক শোনা মাত্র মুহূর্তের মধ্যে কাছে এসে বসেছে কেতকী। আর সারাদিন ধরে কেতকীর কাজের ব্যস্ততাও লক্ষ্য করেছে অতীন। স্কুল থেকে সাত দিনের ছুটি চেয়ে চিঠি পাঠিয়েছে কেতকী, একথাও জানতে পেরেছে অতীন। আশ্চর্য হয়েছে অতীন, এই মেয়ের মনের লোভ আর আশার রকম দেখে একটু চিন্তিত হতেও হয়েছে। এক বছরেরও বেশি হয়ে গিয়েছে, তবু এই বাড়িতে পড়ে আছে কেতকী, এবং নিশ্চয় আরও অনেককাল পড়ে থাকবার জন্য মতলব করেছে, তা না হলে একটা চাকরিই বা ধরবে কেন? যেন প্রাণপণে একটা লটারি খেলছে এই নারী, অতীনের মত মানুষকে ঘরের ভিতরে বন্ধ করবার, আর ওর ঐ কালো কুৎসিত চেহারার একটা দুর্বার ক্ষুধা মিটিয়ে নেবার আশায়। বোধ হয় কল্পনাও করতে পারে না কেতকী, ঐ চেহারা দিয়ে অতীনের মত মানুষকে স্বামী করা যায় না। স্বামী ক'কে বলে, তাই বোধ হয় জানে না এই নারী।

ভুল করেছে কেতকী। অতীনের মনের ভিতর কেতকীর জন্য একটা দুঃখের বোধও মাঝে মাঝে চঞ্চল হয়ে ওঠে। রামকানাইবাবু যে কথা বলেছিলেন সেই কথা মেনে নেওয়াই তো উচিত ছিল কেতকীর। যে বিয়ে বিয়ে নয়, সেই বিয়েকে ওর ঘৃণা করাই ভাল ছিল। ওর চলে যাওয়াই ভাল ছিল, এবং

যার কাছে স্ত্রী হয়ে থাকবার সম্মান পাওয়ার আশা আছে, তেমন একজনকে স্বামী বলে স্বীকার করবার জন্য তৈরী হওয়া ওর কর্তব্য ছিল। যে মানুষের কাছে ওকে মানায়, সেই মানুষকে খুঁজে নেওয়া উচিত ছিল। মিছিমিছি নিজেকে এরকম অসম্মানের কাছে উৎসর্গ ক'রে রাখবার কোন দরকার ছিল না। কুৎসিত হলেও মানুষ তো, এবং ওকে ভালবাসতে পারে, এমম মানুষ পৃথিবীতে আছেও। তবে কেন...বৃথা একটা চক্রান্তের মত কাণ্ড ক'রে...না কেতকীর দোষ নয় বোধ হয়, এই বাড়ির চিরকেলে চক্রান্ত ঐ কমল বিশ্বাসের পরামর্শে পড়ে এই কাণ্ড করেছে কেতকী। আজও এখানে পড়ে আছে।

কেতকীকে মুক্তি দেবার জন্যই তৈরী হয়েছে অতীন। কিন্তু মুক্তি পেতে রাজি হবে কি কেতকী? লক্ষণ দেখে ভরসা পাইনি অতীন, তাই সারা দিন ধরে চিন্তা করতে হয়েছে, একটু উদ্বিগ্ন হতেও হয়েছে। রাগ ক'রে বললে কোন লাভ হবে না। বুঝিয়ে বলতে হবে। কিন্তু বুঝবে কি?

কেতকীর মুখের দিকে তাকায় অতীন, এবং দেখে ভয় পায়, কেতকী যেন একটা রাক্ষুসে প্রতিজ্ঞার মত লুব্ধ হয়ে অতীনেরই মুখের দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে আছে।

অতীন বলে—আমার জীবনে মিছিমিছি একটা সমস্যা সৃষ্টি ক'রে রাখা তোমার উচিত নয়, একথা তোমার স্বীকার করা উচিত।

কেতকী—হ্যাঁ।

অতীন—তাহ'লে আমাকে মুক্তি দাও, আর নিজেও মুক্তি নাও।

কেতকী—কি করতে হবে বল।

কেতকীর হাতের কাছে একটা টাইপ-করা কাগজ এগিয়ে দিয়ে অতীন বলে—এটা সই ক'রে দাও।

কেতকী—কি এটা?

অতীন—পড়ে দেখ।

কাগজের টাইপ-করা লেখাগুলি পড়ে কেতকী। পড়তে পড়তে কেতকীর বড় বড় চোখের তারা ছুটোও যেন ঝিকমিক করে। হেসে ফেলে কেতকী। —কিন্তু দরখাস্তে এত বেশি মিথ্যে কথা লেখবার কি কোন দরকার ছিল? সত্যিই তো তোমার বিরুদ্ধে আমার এরকম ভয়ানক কোন অভিযোগ নেই।

অতীন বলে—এরকম ভয়ানক অভিযোগের কথা না থাকলে আদালত ডাইভোর্স মঞ্জুর করবে না।

হাত বাড়িয়ে অতীনের হাত থেকে কলমটা তুলে নিয়ে সই ক'রে দেয় কেতকী। কাগজটাকে অতীনের হাতের কাছে এগিয়ে দিয়েই উঠে দাঁড়ায়। তার পরেই আস্তে আস্তে হেঁটে চলে যায়।

কেতকীর ঐ চলে যাবার ভঙ্গীটারই দিকে তাকিয়ে দেখতে থাকে অতীন। একটুও ছটফট না ক'রে, একেবারে শান্ত ও নির্বিকার একটা মূর্তি হেঁটে হেঁটে ঘরের দিকে চলে যাচ্ছে। অতীনের সারা দিনের দুশ্চিন্তা ভয় উদ্বেগ আর সন্দেহের বোঝাটাই হঠাৎ যেন একটা ঠাট্টার আঘাতে দুলে ওঠে। লোকে মুদির দোকানের একটা ভাউচারেও এত সহজে, এত প্রশান্ত চিত্তে, এত তুচ্ছতার সঙ্গে সই দেয় না। কিন্তু কেতকী নামে ঐ মেয়ে, ঐ বিদঘুটে চেহারার নারী, বিয়ের বিচ্ছেদ দাবি করবার এই দরখাস্তে যেন হেসে হেসে সই ক'রে দিয়ে চলে গেল। যাক্, মুক্তি পেয়েছে অতীন বিশ্বাস, কাজরী চৌধুরীর সঙ্গে বিয়ে হবার পথে যে একটি মাত্র বাধা ছিল, সে বাধা সরে গেল।

আর একটা কাজ মাত্র বাকি আছে, সেটা সারা হয়ে গেলেই এই বাধা অতীনের জীবনের দুয়ার থেকে আইনমত সরে যাবে। কেতকীর নিজের হাতে সই করা এই দরখাস্ত রামকানাইবাবুর কাছে পাঠিয়ে দিতে হবে। এই দরখাস্ত হাতে পেয়ে খুবই খুশি হবেন রামকানাইবাবু; তিনিও যে ঠিক এইরকম একটি চেষ্টা করবার জন্য ব্যাকুল হয়ে রয়েছেন, আদরের ভাগ্নীকে একটা বাজে

বিয়ের বন্ধন থেকে উদ্ধার করতে চান। আদালতে গিয়ে এই দরখাস্তের একটা গতি ক'রে ফেলতে একটুও দেরি করবেন না রামকানাইবাবু।

ছাদের উপর সেই ছোট ভাঙ্গা ঘরের ভিতরে বিছানার উপর ধড়ফড় ক'রে উঠে বসে অতীন। ঘুম ভাঙ্গতে একটু বেশি দেরি হয়ে গিয়েছে। সকাল বেলার রোদ ছাদের উপর ছড়িয়ে পড়েছে, আর সারা ছাদ জুড়ে যত জংলা পাখির কিচির-মিচির মত্ত হয়ে উঠেছে। ভোর হলেই চলে যেতে হবে, এই সংকল্প নিয়ে শুয়ে পড়লেও ঘুমের ঘোরটা সংকল্পের ধার ধারেনি। বোধ হয় মনটা বড় বেশি নিশ্চিন্ত হয়ে গিয়েছিল এবং কাজরী চৌধুরীর অনুরোধের কথাগুলি স্বপ্নের মধ্যে বড় বেশি মিষ্টি হয়ে বাজছিল, তাই ঘুম ভাঙ্গতে দেরি হয়ে গিয়েছে।

বাগানের পথের উপর দিয়ে একটা মোটর গাড়ি চলে গেল মনে হয়। টেনে টেনে হর্ন বাজিয়ে চলে গেল গাড়িটা। অতীন বিশ্বাসের নিশ্চিন্ত মনটাই আবার নীরবে চমকে উঠে প্রশ্ন করে, তবে কি রামকানাইবাবুর গাড়ি এসেছিল ? চলে গেল কেতকী ?

নীচে নেমে একটা কলরব শুনেই বুঝতে পারে অতীন, না রামকানাইবাবুর গাড়ি নয়, বোধহয় একটা ট্যাক্সি এসেছিল। বাসনার গলার স্বর শোনা যায়। মার সঙ্গে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কথা বলছে বাসনা।

ঘটনাটা সুবিধের নয়। বাসনা এসেছে। চক্ষু-লজ্জার খাতিরে অন্তত আরও একটা দিন এই বাড়িতে থাকতেই হবে। অথচ, কেতকীর কাছ থেকে রামকানাইবাবুর কাছে একটা খবর নিশ্চয় এরই মধ্যে চলে গিয়েছে। হয়তো আর দু'এক ঘণ্টার মধ্যেই রামকানাইবাবু উপস্থিত হবেন। এবং চুপ ক'রে ঘরের ভিতরে

বসে কেতকীর অন্তর্ধানের ঘটনাটা সহ্য করতে হবে। ভুল হলো, অতীনের মত মানুষকে তুচ্ছ ক'রে এবং অতীনের চোখের সামনেই বড়লোক মামার হাত ধরে গটমট ক'রে পরম অবহেলার আবেগে চলে যাবার একটা সুযোগ পেয়ে গেল কেতকী। ভোর হতেই অতীন চলে যেতে পারলে, এরকম দম্ভের একটা দাপট দেখাবার সুযোগ পেত না কেতকী।

কিন্তু কেতকীর ইচ্ছেটাকে বুঝতে কি ভয়ানক ভুলই না করেছিল অতীন! কেতকী চলে যাবার জন্য মনে মনে আগেই তৈরী হয়েছিল নিশ্চয়, তাই তো এত সহজে ঐ দরখাস্তে একটা সই ছুঁড়ে দিয়েছে। লুব্ধ হয়নি কেতকী, মুগ্ধ হবার জন্যও কোন আশা নিয়ে অতীনের মুখের দিকে তাকায়নি। শুধু বোধহয় একটা সুযোগের প্রতীক্ষায় ছিল, এবং সে সুযোগ পাওয়া মাত্র অতীনের ভুয়ো স্বামিত্বকে অনায়াসে বাতিল ক'রে দিয়ে খুশি হয়েছে, এই মুক্তিকে যেন হাত বাড়িয়ে লুফে নিয়েছে কেতকী।

কে জানে, কেতকীর মত একটা মানুষের মনে কিসের এত অহংকার! এই অহংকারের আড়ালে বোধহয় কোন রহস্য আছে। নইলে ঐ দরখাস্তের দিকে তাকিয়ে ওর চোখের চাহনিতে একটা ক্ষুদ্র বিস্ময়ের, একটা অতি ছোট আর্ত আক্ষেপের শিহরও কেঁপে উঠলো না কেন?

যাই হোক, কোন ক্ষতি নেই, লাভই হলো, বিনা ঝঞ্ঝাটে মীমাংসা হয়ে গেল। শুধু অনায়াসে তুচ্ছতা দেখাবার একটা সুযোগ পেয়ে গেল কেতকী, এইমাত্র। কিন্তু প্রতিবাদ করবার কোন অর্থ হয় না। ঐ অহংকারকে জব্দ করবার কোন উপায় নেই। তাই বোধ হয় অস্বস্তি হয়। অতীন বিশ্বাসের নিশ্চিন্ত প্রসন্ন ও হালকা মনের গায়ে একটা অসহায় নিঃশ্বাসের রাগ যেন কাঁটার মত বিঁধছে।

কেতকীর সঙ্গে কোন সম্পর্ক ছিল না, এবং সেই কাঁচা নিঃসম্পর্কতাই এইবার একেবারে পাকা হয়ে গেল; অতীনের কাছে

কেতকী আজ অচেনা কোন নারীর চেয়ে কম পর নয়। কিন্তু কেতকীর একটা আচরণের খুঁটিনাটি নিয়ে এত ছাইভস্ম চিন্তা করবারও কোন দরকার হয় না।

সুধাময়ীর ডাক শোনা যায়—বাসনা এসেছে অতু। তুই কোথায় আছিস, এদিকে একবার আয় বাবা।

এগিয়ে যায় অতীন, এবং কমলবাবুর ঘরের দরজার কাছে এসেই দেখে আশ্চর্য হয়ে যায়, ঘরের ভিতরে কেতকীও দাঁড়িয়ে আছে। স্নান সারা হয়ে গিয়েছে কেতকীর, তাই ভেজা চুলের ছোঁয়া লেগে মাথার কাপড়টা সেঁতসেঁতে হয়ে সেঁটে আছে। বেশ ঝকঝকে মাজা-ঘষা মুখটা, সিঁদুরের দাগটাও টাটকা। সাজের রকমটাও অদ্ভুত! যেন ষোল বছর বয়সের স্কুলের ছাত্রীটি, একটা রঙীন শান্তিপুরী ডুরে শক্ত ক'রে গায়ে জড়িয়েছে কেতকী; বোধহয় একটুও সন্দেহও করতে পারে না যে, ওরকম ক'রে শাড়ি পরলে ওর প্রচণ্ড স্বাস্থ্যের শোভাটা বেহায়া হয়ে ধরা পড়ে যায়।

—কখন্ এলি বাসু? প্রশ্ন ক'রেই চুপ হয়ে যায় অতীন।

—এই তো দশ মিনিটও হয়নি। আর ক' মিনিট থাকতে পারবো জানি না।

—কেন? প্রশ্ন করেন কমলবাবু।

বাসনা বলে—ওর ইচ্ছে। আমি কি আর করতে পারি বল? যখন গাড়ি পাঠাবে তখনই চলে যেতে হবে।

সুধাময়ী করুণ চোখে তাকিয়ে প্রশ্ন করেন—অজিত এখানে না এসে বন্ধুর বাড়িতে উঠলো, এটা কি ভাল হলো বাসনা?

বাসনার গলার স্বর হঠাৎ বিরক্ত হয়ে কলকল ক'রে ওঠে। —নিন্দে করতে হলে আমার নিন্দে কর। ওর নিন্দে করা অন্তত তোমাদের সাজে না। আমিই ওকে এখানে আসতে দিই নি।

সুধাময়ী আশ্চর্য হয়—তুই কি বলছিস রে বাসু? তোর মুখেও কি এসব কথা খুব ভাল সাজছে?

বাসনা—তোমাদের ভালর জন্যে, তোমাদের সম্মান বাঁচাবার জন্যেই ওকে এখানে আসতে দিইনি। বাড়ির এই চেহারা, আর ঘরের ভিতরের এই ছিরি দেখলে মানুষটা কি ভাবতে পারে, সেটা ভুলে যাচ্ছ কেন?

কমলবাবু বলেন—ঠিক বলেছিস মা, এর পর আমাদের আর কোন কথা বলা সাজে না। কোটরগত চক্ষুর একটা উদাস দৃষ্টি ছড়িয়ে দিয়ে আনমনার মত চুপ ক'রে বসে রইলেন কমলবাবু।

একবার কেতকীর দিকে তাকিয়ে, আর একবার সুধাময়ীর দিকে তাকিয়ে বাসনা বলে—চিঠিতে একটা কথা লিখিনি, তোমরা দুঃখ পাবে বলে। তোমাদের অন্যায়ের জন্য আমাকে বড় গঞ্জনা সহ্য করতে হয়েছে মা। এলাহাবাদের বাড়ির সবাই, এমন কি ঝি পর্যন্ত আমাকে কথা শোনাতে ছাড়েনি।

সুধাময়ী—অপরাধ?

বাসনা—গয়নাগুলি একেবারে বাক্সে, সব খুলে রাখতে হয়েছে। শ্বশুর নিজে মার্কেটে গিয়ে পছন্দ ক'রে এক সেট নতুন গয়না এনে দিলেন। বউ-ভাতের দিন তাই পরতে হলো।

সুধাময়ী তাকিয়ে দেখেন, হ্যাঁ, ঠিকই বলেছে বাসনা, কেতকীর গা থেকে খুলে যে-সব জিনিস দিয়ে বাসুকে সাজানো হয়েছিল, সে-সব জিনিষ নয়। বাসুর গায়ে সবই নতুন জিনিস ঝলমল করছে।

বাসনা বলে—কিছু মনে করো না বউদি, তোমার দোষও ধরছি না। তোমার মামা ভদ্রলোক কিন্তু একটু ঠকিয়েছেন। ওরকম পলকা জিনিস আজকাল কোন ভদ্রলোকের মেয়ের বিয়েতে কেউ দেয় বলে শুনিনি।

কমলবাবু বলেন—তোমরা অন্য ঘরে গিয়ে কথা বল সুধা।

সুধাময়ী অন্য ঘরে চলে যান, অতীন আর এক ঘরে। আর, বাসনা তার মনের সেই কলকল খুশির আবেগে কেতকীর হাত ধরে

টানতে টানতে আর এক ঘরের ভিতরে গিয়ে বসে।—তারপর? কি রকম ব্যাপার ট্যাপার চলছে মিসেস বিশ্বাস?

কেতকী—চলছে, চলে যাচ্ছে।

বাসনা—চলছে তো আমারও। স্বামী-জ্ঞান স্বামী-ধ্যান ক'রে দিন চালিয়ে যাচ্ছি। এই পনর মাসের মধ্যে এই প্রথম একটু ছাড়া পেলাম, তা'ও আবার ক'মিনিটের জন্য কে জানে?

কেতকী—তোমরা কলকাতায় কবে এসেছ?

বাসনা—কাল বিকালে। ওর বন্ধু অশ্বিনীবাবুর বাড়িতে উঠেছি। চেন নাকি অশ্বিনীবাবুকে?

কেতকী—না।

বাসনা—ওঃ, মস্ত বড় লোক। ঝরিয়াতে তিন তিনটে কলিয়ারী আছে।

চা তৈরী করে কেতকী। বাসনা ছটফট ক'রে আপত্তি করে—চা আর রুচবে না বৌদি, ও হাঙ্গামা ছেড়ে দাও। এলাহাবাদে ওরা সবাই কফি খায়, আমারও কফির অভ্যাস হয়ে গিয়েছে।

কেতকী হাসে—তুমি না খাও, এ বাড়িতে চা খাবার অন্য লোক আছে।

বাসনা চোখ বড় ক'রে তাকায়—ও, তোমারও দেখছি আমার মত স্বামী-জ্ঞান স্বামী-ধ্যান।

চুপ ক'রে থাকে কেতকী। কিন্তু বাসনার কথার স্রোত বন্ধ হয় না। এদিকে-ওদিকে তাকিয়ে, বেশ সাবধান হয়ে, এবং বেশ একটু লজ্জিত হয়ে চাপা-গলায় বলতে থাকে বাসনা।—বাস্তবিক, অনেক পুণ্যি করলে তবে মনের মত স্বামী পাওয়া যায়।

কেতকী হাসে—পুণ্যি?

বাসনা—হ্যাঁ, নিশ্চয়।

কেতকী—কি-রকমের পুণ্যি?

বাসনা—কুমারী মেয়ের জীবনে যেটা সবচেয়ে বড় পুণ্যি।

কেতকী—সেটা কি ?

বাসনা—ভুলেও পরপুরুষের চিন্তাকে মনে ঠাঁই না দেওয়া। আমি ভেবে পাই না বউদি, কোন্ সাহসে কোন মেয়ে বিয়ের আগে প্রেম করে। ধর, যদি তার সঙ্গে বিয়ে না হয়ে অন্য কারও সঙ্গে বিয়ে হয়ে যায়, তবে ? তবে সেটা কি স্বামী বেচারাকে ঠকানো হয় না ? তাতে কি পাপ না হয়ে পারে ?

বোধ হয় কেতকীর মনটাও ভুল ক'রে একটু অসাবধান হয়ে গিয়েছিল, কোন কথা বলবে বলে তৈরী ছিল না, তবু একটা প্রশ্ন আচমকা মুখ থেকে যেন ছুটে বের হয়ে গেল—মনের মত স্বামী কা'কে বলে ?

বাসনা হাসে—আহা, যেন গাঁয়ের মেয়েটি, কিছুই বোঝেন না।

কেতকী গম্ভীর হয়—বুঝতে চাই, কিন্তু বুঝতে পারি না।

খিলখিল ক'রে হেসে বাসনা তার সুন্দর গহনা-ঝলমল চেহারাকে দোলাতে থাকে—তাহ'লে একেবারে স্পষ্ট করেই বলে দিচ্ছি বউদি। আমার স্বামীর মত স্বামীকেই মনের মত স্বামী বলে।

গাড়ির হর্ন বাজে বাগানের পথে।

—চলি বউদি। উতলা হয়ে ঘরের ভিতর থেকে ছুটে বের হয়ে যায় বাসনা। টিপ টিপ ক'রে কমলবাবু আর সুধাময়ীকে প্রণাম ক'রে নিয়েই গাড়ির দিকে চলে যায়।

আর, চা-এর পেয়ালা হাতে নিয়ে অতীনকে খুঁজতে থাকে কেতকী।

ঘরের ভিতরে একলা হয়ে বসে থাকা অতীনের চোখ দুটো হঠাৎ চমকে ওঠে আর আশ্চর্য হয়। অতীনের হাতের কাছে চা রেখে দিয়ে চলে গেল কেতকী।

সকালবেলার পর দুপুরবেলাতেও ; অতীনকে ভাত খাবার জন্য ডাক দিতে সুধাময়ী এলেন না ; পাঁচুও এল না। ভাতের থালা হাতে নিয়ে ঘরে ঢুকলো কেতকী।

যতক্ষণ অতীনের ভাত খাওয়ার পালা শেষ না হয়; ততক্ষণ ঘরের দরজার কাছে চুপ করে দাঁড়িয়েও থাকে কেতকী। অতীনের বিস্ময় দুঃসহ অস্বস্তি হয়ে ছটফট করে।

তারপর বিকেল থেকে সন্ধ্যা; তিনঘণ্টার মধ্যে অতীনের কাছে এসে দু'বার চা দিয়ে গিয়েছে কেতকী। আর, অতীনও কেতকীর এই থিয়েটারী কাণ্ড দেখে দু'বারই চমকে উঠেছে।

সন্ধ্যাও পার হয়ে যায়। চ'লে যাবার অনেক সময় পেয়েছে অতীন, তবুও যায়নি। তাড়াহুড়ো ক'রে চলে যাবার কোন দরকার হয় না, কারণ কেতকী নামে ঐ নারীকে ভয় পাবার কোন হেতুও নেই। অতীনের মনের সেই আহত অহংকারের জ্বালাও শান্ত হয়ে গিয়েছে। অতীনের চোখের উপর দিয়ে স্বচ্ছন্দে হেসে হেসে এই বাড়ির ছায়ার সীমানা পার হয়ে অন্তর্হিত হয়ে যায়নি কেতকী। রামকানাইবাবু আসেননি, রামকানাই বাবুর গাড়িও আসেনি।

ব্যাপারটা একটা মজার ব্যাপার সন্দেহ নেই, এবং অতীনের খারাপও লাগে না। অতীনের মনের সেই বিমর্ষ অহংকারটা আবার মাথা উঁচু ক'রে কেতকীর দিকে তাকিয়ে হেসেছে। বন্ধনহীন গ্রন্থি নয়, এ যে একেবারে গ্রন্থিহীন বন্ধনের ব্যাপার। এই রকমের একটা সম্পর্কের কাছেও দাসী হয়ে থাকতে পারে কোন মেয়েমানুষের প্রাণ? কি আশ্চর্য!

গল্পে শোনা যায়, কোন্ এক সতী নারী নাকি কুষ্ঠ রোগে অথর্ব স্বামীকে কাঁধে ক'রে স্বামীর প্রিয় এক পতিতার কাছে পৌছে দিয়ে এসেছিল। কেতকীর মুখের চেহারা দেখে তাকে তো এত মাটির মানুষ বলে মনে হয় না। কিন্তু ওর কাণ্ড দেখে সন্দেহ করতে হয়, যেন বিয়ের মন্ত্রটাকেই স্বামী বলে ধারণা ক'রে বসে আছে কেতকীর মত বি-এ পড়া আধুনিকা। স্বামী নামে মানুষটাকে পাওয়া যাক বা না যাক, সেই মন্ত্রটা তো আছে, এবং বোধ হয়

তারই শাসন বরণ ক'রে নিয়ে সুখী হয়ে আছে কেতকীর অন্তরাত্মা। মন্ত্র পড়ে একবার যার হাত ধরা যায়, তাকেই চিরটা কাল স্বামী বলে স্বীকার করে যারা, কেতকী বোধ হয় তাদেরই মত একজন নিরেট সতী আর সাধ্বী।

নারকেল পাতার ঝালরে পড়ে চাঁদের আলো ঝিলমিল করে। অতীনেরও বুকের ভিতরে যেন একটা উল্লাস ঝিলমিল করে। কেতকী ইচ্ছে করেই এরকম একটা জীবন নিয়ে সুখী হতে চায়, হোক, অতীনের আপত্তি করবার কোন অর্থ হয় না। অতীনের জীবনের সুখের পথে কেতকী কোন বাধা নয়। কেতকী এখানে থাকলে নয়, এখানে না থাকলেও নয়।

ঘর থেকে বের হয়ে বাগানের চারদিকে ঘুরে বেড়াতেও ভাল লাগে। বড় পুকুরের পশ্চিমে বেল আর বাতাবী লেবুর বাগানটা একেবারে জঙ্গল হয়ে গিয়েছে, তারই মধ্যে জীর্ণ ইঁটের গোটা চারেক থাম দাঁড়িয়ে আছে। ছেলেবেলায় বাবার মুখেই গল্প শুনেছিল অতীন, এই বাগানটার নাম ক্ষেপী বউ-এর বাগান। এই বিশ্বাস বংশেরই চার পুরুষের আগের আনন্দ বিশ্বাস নামে এক ধর্মবাতিক মানুষ তীর্থ করতে গিয়ে মারা গিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর স্ত্রী সে-কথা বিশ্বাসই করেননি। ঐ জঙ্গলের ঐখানে, যেখানে ভাঙ্গা থামগুলি আজ দাঁড়িয়ে আছে, সেখানে থাকতেন আনন্দ বিশ্বাসের স্ত্রী। সর্বক্ষণ হাসতেন, মাছ খেতেন, পান খেতেন, আলতা পরতেন; বিধবা হয়েও সারা জীবন সধবার মত সেজে রইলেন সেই ক্ষেপী বউ। মরবার পর তাঁকে নাকি লালপেড়ে শাড়ি আর সিঁদুর আলতায় সাজিয়ে চিতেয় চড়ানো হয়েছিল।

অতীন বিশ্বাসের ভাবনার মধ্যে ক্ষেপী বউ-এর হাসিটাই যেন ফিসফিস সিরসির করে। কেতকীও প্রায় এইরকমেরই একটা কাণ্ড করছে। করুক, সত্যিই তো ক্ষেপী নয় আর সেকেলে গেঁয়ো খুকী নয় কেতকী। ওকে বোঝাবার কোন দরকার হয় না।

রাতের খাবার খাওয়ার সময়েও কেতকীর চোখের দিকে তাকিয়ে খুশি হয়েছে অতীন। বেশ তো শান্ত দুটি চোখ, বেশ তো নিজের খুশির আবেগে ঝিকমিক করছে। সাজটাও সুন্দর। কে জানে, বোধ হয় শাশুড়ির নির্দেশ, তাই নতুন বউটির মত বাহারে সাজে সেজেছে কেতকী। একটা রঙীন বিষ্ণুপুরীকে বেশ কায়দা ক'রে লতানো ভঙ্গীতে গায়ে জড়িয়েছে। শাড়ির জমিটার রং হাল্‌কা নীল। তার উপর খয়েরী রং-এর বুটি, আঁচলটাতে সারি সারি সোনালী জরির হংসমিথুন। মুখে স্নো মেখেছে কিনা বোঝা যায় না, কিন্তু কালো মুখেরই উপর যেন ভোরের মেঘলা আকাশের মত একটা ঢলঢল বিহ্বলতা থমকে রয়েছে।

একবার নয়, কয়েকবার ইচ্ছে করেই চোখ তুলে তাকিয়েছে অতীন। কি দেখে এত আশ্চর্য লাগছে, এবং অতীনের চোখের আশাটাই বা বারবার কেতকীর চেহারার দিকে তাকিয়ে কি খুঁজছে, জানে না অতীন। বোধ হয় জানবার চেষ্টাও করে না।

হঠাৎ আনমনার মত চমকে উঠে চোখ ফিরিয়ে নেয় অতীন। সিগারেট ধরায়, আস্তে আস্তে হেঁটে ছাদে যাবার সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যায়।

রাত গভীর হয়। ঝিঁঝিঁর ডাকে কান ঝালাপালা হয়, এমনই একটি রাত।

বিছানার উপর কেতকীর ঘুমন্ত দেহটা ধড়ফড় ক'রে উঠে বসে। রাত হয়েছে অনেক, বাতি নেভানো হয়নি, এমন কি খোঁপার চিরুনিটাও খুলে রাখতে ভুলে গিয়েছে কেতকী। চিরুনির কাঁটাগুলি ঘুমন্ত মাথাটাতে বিঁধছে, জ্বলছে মাথাটা।

ঝিঁঝির ডাকে কান ঝালাপালা শব্দের উপর যেন একটা বেসুরো শব্দ হঠাৎ ঠকঠক ক'রে বেজে ওঠে। চমকে ওঠে কেতকী। ঘরের দরজারই উপর বাজছে একটা আঘাতের শব্দ। তারপরেই মানুষের গলার শব্দ বেজে ওঠে—কেতকী।

চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে, শুধু কয়েকটি মুহূর্ত কি-যেন ভাবে কেতকী। তার পরেই দরজা খুলে দেয়।

ঘরের ভিতরে ঢুকেই অতীন বলে—আমার ধারণা ছিল, তুমি এখনও ঘুমিয়ে পড়নি।

কেতকীর উত্তর শোনবার অপেক্ষা না ক'রে অতীন আবার বলে—আমার আরও একটা ধারণা ছিল, তুমি নিজেই ছাদের ঘরে একবার যাবে।

যেন স্বপ্নের ঘোরে কথা বলছে অতীন। অতীনের কথার অর্থ বুঝতে না পেরে অপ্রস্তুতের মত তাকিয়ে থাকে কেতকী।

অতীনের কথার মধ্যে কিছু সত্য আছে। স্বপ্নের ঘোরে না হোক, নিজেরই চিন্তার একটা স্বপ্নময় আবেশের মধ্যে কেতকীর জন্য অদ্ভুত একটা মায়া হঠাৎ ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। ছাদের ঘরে বসে, ঝিঁঝি পোকার উল্লাসে অভিভূত এই মাঝ রাতের প্রহরে মনে পড়েছে কেতকীর কথা, অতীনের চোখের কাছে এসে দাঁড়াবার জন্য আকুল হয়ে আছে যে নারীর প্রাণ। রঙীন বিষ্ণুপুরীর লতানো বাঁধনে বাঁধা যে অজস্র কোমলতা আর নিবিড়তার ছবি আজ নিজের চোখে দেখতে পেয়ে আশ্চর্য হয়েছে অতীন, সে তো কেতকী নামে এক নারীরই দেহের ছবি। সে ছবি যে অতীনেরই ইচ্ছার কাছে উৎসর্গ হবার জন্য স্বপ্ন দেখছে। অতীনের বুকের ভিতরটা মাতাল হয়ে উঠেছে। কেতকীর আশা মিটিয়ে না দিলে অপরাধ হবে।

অতীন বলে—কথা বলছো না কেন কেতকী?

কেতকী—তুমি তো কোন কথা জিজ্ঞেসা করনি।

অতীনের আবিষ্ট চোখে হঠাৎ একটা রূঢ় বিস্ময়ের চমক কেঁপে ওঠে। —কোন কথা জিজ্ঞাসা করবার জন্যে তো আমি আসি নি। আমি তোমার কাছেই এসেছি।

কেতকীর চোখ ঝিক ক'রে জ্বলে ওঠে—তার মানে?

অতীন—আমি আজ রাতে এই ঘরেই থাকবো।

কেতকী—কেন?

অতীন—তোমার মনে আমি এই অভিযোগ রাখতে চাই না যে, তোমাকে আমি তুচ্ছ করেছি। তুমি যা আশা কর, আমি তাই···।

কেতকী—না, কখ্খনো না। আমি তোমার কাছে কিছুই আশা করি না।

অতীন—মিথ্যে কথা বলো না কেতকী।

কেতকী—একটুও মিথ্যে কথা নয়।

ভ্রুকুটি করে অতীন—তবে কিসের আশায় সেবাদাসীর মত এখানে পড়ে আছ, আর আমাকেই বা পতিব্রতা পত্নীটির মত রকমারি রান্না খাইয়ে সেবা করছো?

কেতকী—সে প্রশ্ন করবার অধিকার তোমার নেই।

অতীন—আছে। এখনও আদালতের রায় বের হয়নি; আইন বলবে, আমি তোমার স্বামী।

কেতকী—বললেই তুমি আমার স্বামী হয়ে যাবে না।

অতীন—মন্ত্রে বলে, আমিই তোমার স্বামী।

কেতকী—বলুক, তবু তুমি আমার স্বামী নও।

অতীন—তাহলে স্বামী কাকে বলে?

কেতকী—জানি না, যদি বুঝতে পারি কোনদিন, তবে বুঝিয়ে দেব।

অতীন বিশ্বাসের চোখে থরথর ক'রে আহত দর্পের রাগ কাঁপে; অতীনের এই সুন্দর চেহারার বুকের ভিতর যে প্রচণ্ড পৌরুষের গর্ব মাতাল হয়ে রয়েছে, যে গর্বকে দু'হাতে বুকে জড়িয়ে সুখী হয় কাজরী চৌধুরীর মত নারী, সেই গর্বকে যেন ছিন্নভিন্ন ক'রে ধূলোয় লুটিয়ে দিচ্ছে কেতকী নামে এই কুরূপিনী। অতীন বিশ্বাসকেই মিথ্যা ক'রে দিচ্ছে কেতকীর কুৎসিত দর্প। এই পরাজয় যে

অতীন বিশ্বাসের জীবনের সব চেয়ে বড় আনন্দ ধ্বংস ক'রে দেবে। কেতকীর এই ভয়ানক অহংকেরে অবাধ্যতাকে ছিন্নভিন্ন ক'রে, ঐ কালো চেহারার রক্তমাংসের স্বাদ লুট ক'রে নিতে না পারলে অতীন বিশ্বাসের প্রতি ধমনীর অপমানিত শোণিতকণা অলস ও অচল হয়ে যাবে। অতীনের নিঃশ্বাসে আগুন, চোখে আগুন। ভৈরব বিশ্বাসের অদৃশ্য প্রেতাত্মা অতীন বিশ্বাসের হাতে বোধ হয় সেই নরবলির খড়্গ ধরিয়ে দিয়েছে। হাত দুটো বিচিত্র এক হিংস্রতার আবেগে দুলে ওঠে। হঠাৎ দরজা বন্ধ ক'রে দিয়ে শক্ত হয়ে দাঁড়ায় অতীন বিশ্বাস।

কেতকীর গলার স্বরও দুঃসহ ঘৃণার জ্বালায় জ্বলে ওঠে—দরজা খুলে দাও। সরে দাঁড়াও।

অতীন—কেন ? কোথায় যাবে ?

কেতকী—অন্য ঘরে।

অতীন—না।

কেতকী প্রায় চেঁচিয়ে ওঠে—তাহলে এখনি চিৎকার ক'রে বাবা আর মাকে ডাকবো।

অতীন—তোমার ডাক শুনে এখন যদি কেউ এখানে আসে, তবে সে এই মুহূর্তে খুন হয়ে যাবে, বিশ্বাস কর কেতকী।

অতীনের চোখের দিকে তাকিয়েই শিউরে ওঠে কেতকী, তারপরেই আঁচল দিয়ে চোখ ঢেকে একেবারে নীরব হয়ে যায়।

এভাবে চলেই গেল যদি, তবে এসেছিল কেন ? ভোর হবার অনেক পরে, খোঁড়া বৈরাগীটা উষাকীর্তন গেয়ে রসিকপুরের নতুন পাড়ার দিকে চলে যাবার অনেক পরে ভাদুরে রোদ যখন তেতে ওঠে, তখনও এই বাড়ির কোথাও অতীনের সাড়া শুনতে না পেয়ে

হঠাৎ ভয়ে চমকে ওঠেন সুধাময়ী, আর বার বার মনের এই প্রশ্নটাকেই সহ্য করবার চেষ্টা করেন।

কেতকীও কিছু বলতে পারলো না, কখন চলে গিয়েছে অতীন। এবং দেখে আরও আশ্চর্য হয়ে গিয়েছেন সুধাময়ী, কেতকী তার সেই চিরকেলে শান্ত মূর্তিটি নিয়ে ঘরের ভিতরে মাতুরের উপর বসে এক মনে স্কুলের খাতা দেখছে।

কেতকীর চোখে-মুখে এক বিন্দু দুঃখের চিহ্ন নেই; এটাই বা কি কম আশ্চর্যের কথা? ঘুরে ফিরে নিজেরই অবুঝ সন্দেহ আর বেদনার জ্বালায় ছটফট ক'রে বার বার কমলবাবুর কাছে এসে ঐ প্রশ্ন করেন সুধাময়ী—এভাবে চলেই গেল যদি, তবে এসেছিল কেন?

কমলবাবুর কোটরগত চোখ যেন ধিকিধিকি ক'রে জ্বলে—আশ্চর্য হবার কিছু নেই সুধা। তোমার ছেলে চোরের মত একটা লোভ নিয়ে এসেছিল, আর ঠকে গিয়ে চোরের মতই রাগ ক'রে চলে গিয়েছে। ভালই হয়েছে।

কমলবাবুর কথাগুলিকে হেঁয়ালির মত মনে হয়, তবু সেই হেঁয়ালির একটা ভয়ানক অর্থ যেন আছে। কি যেন অনুমান করেন সুধাময়ী, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর রোগা শরীরটা থরথর ক'রে কাঁপতে থাকে। আধ-মরা মানুষের মত চোখ ক'রে কমলবাবুর রুক্ষ মূর্তির দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে ওঠেন সুধাময়ী—কি ছাই বলছো, আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না।

কমলবাবু—বুঝে কাজ নেই, বুঝলে মরতে ইচ্ছে করবে।

সুধাময়ীর আধমরা চোখ যেন এইবার একেবারে স্তব্ধ হয়ে যাবে। কমলবাবুর চোখের নিষ্ঠুর চাউনিটা তবুও কঠোর হয়ে থাকে। বিড়বিড় ক'রে বলতে থাকেন কমলবাবু—কেন? কেতকীর বুঝি সম্মান বলে কিছু থাকতে নেই? কেতকীর কোন জেদ থাকতে পারে না? মনে করেছ, তোমার ছেলেকে ঘেন্না করবার অধিকার

কেতকীর নেই ? ঠিক করেছে, বেশ করেছে কেতকী। না করলে আমিই কেতকীকে অমানুষ মনে করতাম।

মরণময় আগুণের জ্বালা গায়ে লাগলে আধমরা মানুষও মরিয়া হয়ে বাঁচবার জন্য লাফিয়ে ওঠে। সুধাময়ী সেই রকমই একটা কাণ্ড করলেন। ছটফট ক'রে উঠে বসলেন। মরতে ইচ্ছে হয় না, বাঁচতেই চান তিনি। তাই বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না। তাঁর এত সাধের আশার ফুল পুড়ে গিয়েছে, বিশ্বাস হয় না। কেতকী সে মেয়ে নয়, অতীনকে ঘেন্না করবার মত মেয়ে নয় কেতকী। শত হোক অতীন যে কেতকীর স্বামী, এই সত্য অস্বীকার করতে পারে না ঐ মেয়ে, যে-মেয়ে এই বাড়ির মাটি কামড়ে পড়ে রয়েছে।

ঘর থেকে টলতে টলতে বের হয়ে আসেন সুধাময়ী। চিৎকার ক'রে ডাকতে থাকেন—কেতকী! বউমা! কেতকী!

স্কুলের খাতা ফেলে রেখে ব্যস্তভাবে কেতকীও ছুটে আসে। কেতকীর একটা হাত আকঁড়ে ধরে কেতকীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন সুধাময়ী। বড় অলস শিথিল আর করুণ সেই দৃষ্টি। সুধীময়ী যেন নিঝুম হয়ে একটা স্বপ্নের আশ্বাস খুঁজছেন।

যেমন রোজই সকালে স্নান সেরে নেয় কেতকী, তেমনই আজও সকালে স্নান সেরেছে। কেতকীর কালো মুখের এই ধোয়ামোছা শুচিতার আভাটুকু নতুন কোন জিনিষ নয়। ঢাকাই তাঁতের যে শাড়িটা গায়ে জড়িয়েছে, সেটাও কোন নতুন সাজ নয়। হাতে দুগাছি চুড়ি আছে, কানেও দুল দোলে। ঘরের ভিতরেও কেতকীর পায়ে এক জোড়া লাল বনাতের চটি লেগে থাকে। আজও আছে। কোন পরিবর্তন নেই। এই কেতকী যে ঠিক সেই কেতকী। মনের সব আশা আর সব স্নেহ ঢেলে দেখতে থাকেন সুধাময়ী, না, কেতকীকে ভয়ানক ভুল সন্দেহ করেছেন কেতকীর ঐ রাগী শ্বশুর।

কিন্তু পর মুহূর্তেই সুধাময়ীর বুক ভেদ ক'রে একটা আর্তস্বর

ঠিকরে বের হয়।—একি কাণ্ড করেছ কেতকী? তোমার সিঁথিটা এত সাদা কেন? সিঁদুর নেই কেন?

সত্যিই সিঁদুরের একটা কণিকাও নেই কেতকীর সেই শূন্য সিঁথির রেখার উপর। থাকবে কেমন ক'রে? কেতকী নিজেই যে আজ তার কঠোর হাতের পীড়নে তেল দিয়ে ঘসে ঘসে আর সাবান দিয়ে রগড়ে রগড়ে রঙীন সিঁথিটাকে একেবারে সাদা ক'রে দিয়েছে।

—ক্ষেপী বউও এমন কাণ্ড করেনি কেতকী। সত্যি বিধবা হয়েও সে সধবা হয়ে থাকবার সাধ ছাড়তে পারেনি। কিন্তু তুমি এ কি করলে? সত্যি সধবা হয়েও বিধবা হয়ে থাকবার সাধ ধরলে? ছি ছি!

কেতকীর চোখের কোণে জলের ফোঁটা তুলতে থাকে। আস্তে আস্তে বলে—মাপ করবেন মা।

—না। সেই মূহূর্তে কেতকীর হাত ছেড়ে দিয়ে আবার তেমনি টলতে টলতে চলে গেলেন সুধাময়ী। সোজা ঘরের ভিতরে গিয়ে বিছানার উপর লুটিয়ে পড়লেন।

দশ মিনিটও পার হয়নি, সুধাময়ীর বিছানার কাছে দাঁড়িয়ে কেতকীই ডাক দিল—বাবা, শিগগির আসুন।

জ্ঞান হারিয়েছেন সুধাময়ী। এবং জ্ঞান ফিরে আসতেও বিকাল হয়ে গেল।

কেতকীর চিঠি নিয়ে নতুন পাড়ার পাচু রামকানাইবাবুকে একটা খবরও দিয়ে এল। ডাক্তার সঙ্গে নিয়ে রামকানাইবাবুর গাড়ি যখন এল, তখন সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে। ক্লান্ত কাকের ডাক আর শোনা যায় না। বাঁশ ঝাড়ের মধ্যে অন্ধকারের শরীরটা যেন কটকট মটমট ক'রে হাড় বাজায়। তার সঙ্গে পেঁচার কর্কশ স্বর।

ডাক্তার বলেন—সেরে উঠতে বেশ সময় লাগবে।

কমলবাবু উদাসভাবে হাসেন—তার মানে শয্যা নিলেন।

শ্যামবাজারের মেসবাড়ির ছোট ঘরের খাটের উপর রোজই ঘুম থেকে যখন জেগে ওঠে অতীন, তখন রসিকপুরের একটি ভোরের ছবি অতীনের চোখ কাঁপিয়ে ছটফট ক'রে ওঠে। রসিকপুরের সেই রাত্রির শেষে, ঠিক ভোর তখনও হয়নি, ভোরের আভাস মাত্র, ঘর থেকে বের হয়ে এবং কোন শব্দ না করেও নীচের ঘরের সামনের সেই বারান্দাটা তাড়াতাড়ি পার হবার জন্য এগিয়ে যেতেই একবার থমকে দাঁড়িয়েছিল অতীন। কেতকীর ঘরের ভিতরে আলো জ্বলছে বলে মনে হয়।

অনেকক্ষণ চুপ ক'রে দাঁড়িয়েছিল অতীন। একটা চোরা কৌতুহল, ভীরু অথচ লোভী। কিংবা কেতকীর সেই ক্রুদ্ধ শঙ্কিত ও হতাশ মুখটা আর একবার দেখবার জন্য একটা নির্লজ্জ মায়া। অথবা কেতকীকে একটা কথা একটু ভাল ক'রে বলে যারার ইচ্ছা।

বলতে ইচ্ছা করেছিল, রাগের মাথায় একটা কাণ্ডই হয়ে গেল, অন্যায় কাণ্ড, না হলেই ভাল ছিল। কিন্তু আমি যে একটা পুরুষ, সেটা তোমারও বুঝতে না পারা ভাল হয়নি কেতকী। যাই হোক, কিছু মনে করো না!

বলে যাওয়াই ভাল। ইচ্ছাটাকে বাধা দেয়নি অতীন, এবং কেতকীর ঘরের দরজার কপাট আস্তে একটা ঠেলা দিয়ে ও একটু ফাঁক ক'রে উকি দিয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়েছিল।

চমকে শিউরে উঠেছিল অতীনের সুন্দর চেহারার ভয়ানক কালো ছায়া। চোখের উপর যেন একটা চাবুকের আঘাত আছড়ে পড়েছে। তবু দেখতে থাকে অতীন। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ভেজা তোয়ালে দিয়ে সিঁথিটাকে কি ভয়ানক আক্রোশ নিয়ে ঘষে মুছে একেবারে সাদা ক'রে দিচ্ছে কেতকী! কেতকীর চোখ দুটো পাগলা শিয়ালের চোখের মত জ্বলছে।

আর এক মুহূর্তও দেরি করেনি অতীন। ঐ কুৎসিত মেয়ের অহংকারের কাছে আরও অপমানের কামড় খাবার দুর্ভাগ্য থেকে বাঁচতে হলে এখনি চলে যাওয়া উচিত।

ভাঙ্গা দেউড়ির পচা গলা ইঁটের ঢিবিগুলির পাশ কাটিয়ে এবং বেশ জোরে জোরে হেঁটে চলে যাবার সময় আর একবার একটু ভয় পেয়ে থমকে দাঁড়াতে হয়েছিল। পথের উপর দাঁড়িয়ে ধুঁকছিল একটা খাটাস। ঢিল মেরে জানোয়ারটাকে তাড়িয়ে দিয়ে, তারপর একটা দৌড় দিয়ে ছুটে এবং একেবারে যশোর রোডের উপর এসে দাঁড়াবার পর হাঁফ ছাড়ে অতীন।

শ্যামবাজারের মেসবাড়ির ছোট ঘরের ভিতরেও পর পর কয়েকটা রাত চোখের সামনে একটা ছায়া দেখতে পেয়েছে অতীন। সেই জানোয়ারটার চোখ মুখের মত বিশ্রী ভঙ্গী ক'রে চোখের সামনের এই ছায়াটাও যেন ধুঁকছে। তারপর আর নয়। এই ছায়াদেখা ভয়টা ক'দিনের মধ্যেই চোখের উপর থেকে সরে গেল।

কাজরী চৌধুরীর সুন্দর মুখও একটি অনাবিল ও উচ্ছল হাসি হেসে অতীনের এই ভয়টাকে তাড়িয়ে দেয়। একেবারে নিশ্চিন্ত ও নির্ভয় হয়ে যায় অতীন বিশ্বাসের মনের সেই গর্বময় পৌরুষ, সেই আত্মগৌরবের মাথা উঁচু করা মূর্তিটা, যাকে কেতকীর মত একটা কুরূপা নারী তুচ্ছ ক'রে আর ধিক্কার দিয়ে একেবারে ধুলোমাখা ক'রে ছেড়ে দিয়েছে।

দেখা হতেই প্রশ্ন করে কাজরী—পর পর দুটো দিন টেলিফোন করেও পাত্তা পেলাম না কেন?

—বাড়ি গিয়েছিলাম।

—কেন?

—একটা উদ্দেশ্য ছিল, সে উদ্দেশ্য সফলও হয়েছে।

পকেট থেকে দলিলের মত একটা বস্তু বের করে অতীন। একটা দরখাস্তের নকল।

—কি এটা? প্রশ্ন করে কাজরী।

—পড়ে দেখ। দরখাস্তটাকে কাজরীর চোখের কাছে এগিয়ে দেয় অতীন।

দরখাস্ত পড়েই কাজরীর চোখে যেন তীব্র একটা চমক কেঁপে ওঠে—আশ্চর্য।

অতীন—কিসের আশ্চর্য?

কাজরী—ঐ মহিলা। তোমার মত মানুষের ওপর কোন ভালবাসার টান নেই, এমন অহংকার তো চারটিখানি কথা নয়। হয় মাথা খারাপ, নয়···যাক্‌গে ওসব নিয়ে আমার মাথা ঘামাবার দরকার নেই।

সুন্দরতার নারী, কাজরী চৌধুরীর মত নারীর এই কথাগুলিই যে একটা সুন্দর অভ্যর্থনার ভাষা। অতীন বিশ্বাসের বুকের ভিতরে যে বিমর্ষ অহংকার চোরের মত মুখ লুকিয়ে বসেছিল, কাজরীর ঐ কথাগুলি যেন সঞ্জীবনী মন্ত্রের মত এক নিমেষে সেই অহংকারকে প্রাণ পাইয়ে দেয়। কি আসে যায় সেই কুৎসিতার একটা তুচ্ছতায়? রূপের রাজার মত অতীনের এই ত্রিশ বছর বয়সের চেহারাটার জন্য কেতকীর মত মাথা-খারাপ মেয়ের পক্ষে লুব্ধ না হওয়াই তো স্বাভাবিক।

অতীন বিশ্বাস আর কাজরী চৌধুরী, দু'জনের দু'টি মনের মাঝখানে কোন বেড়া নেই। কোন গোপনতা, কোন না-বলা সত্য এবং না-জানানো ঘটনা নেই। অনায়াসে বর্ণনা ক'রে বলতে পারে অতীন, এরই মধ্যে সিঁথির সিঁদুর মুছে ফেলেছে কেতকী। কেতকীর এই ডাইভোর্স দাবির দরখাস্তটা অতীন নিজেই এক উকীলকে দিয়ে তৈরী করিয়েছে। নিজেই কেতকীর কাছে গিয়ে দরখাস্তে সই আদায় করেছে, এবং নিজেই সেই দরখাস্ত রামকানাইবাবুর কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে।

অতীন বিশ্বাসের চেষ্টার এই জটিল ইতিহাস শুনতে শুনতে

ছলছল ক'রে ওঠে কাজরীর চোখ। —তোমার জন্য দুঃখ হয় অতীন।

অতীন—দুঃখ কেন কাজরী?

কাজরী—ভালবাসার জন্য মানুষ যে এমন ভয়ানক ঝঞ্ঝাট সহ্য করে, নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাসই করতে পারতাম না।

কেতকী এক মুহূর্তও দ্বিধা না ক'রে এই দরখাস্তে একটা অবহেলার স্বাক্ষর ছুঁড়ে দিয়েছে, এই ঘটনার গল্পটা শুনতে গিয়ে কাজরীকে বেশ একটু কষ্ট সহ্য করতে হয়। তীব্র বিদ্যুতের মত ঝিলিক দিয়ে ওঠে চোখ দুটো।

অতীনের এই অকপট জীবনটার জন্য, এক মূর্খ নারীর কাছে তুচ্ছতায় অপমানিত এই সুন্দর মানুষটার জন্য কাজরীর চোখের মায়াটাই যেন একটা উগ্র ঝিলিক দিয়ে তারপর শান্ত হয়ে যায়। অতীনকে আরও ভাল লাগে।

হুহু ক'রে ছুটে আসছে গঙ্গার বুকের জলো বাতাস। কাজরীর শাড়ির আঁচল পতাকার মত উড়তে থাকে। চন্দননগরের বাড়ির ছোট বারান্দাটার আলো যেন দু'টি আবিষ্ট নিঃশ্বাসের ঝড়ে নিভে যায়। অতীনের হাতে হাত রেখে বসে থাকে কাজরী।

এক এক দিন বেড়িয়ে বাড়ি ফিরবার পথে কাজরীর মনের একটা সংকল্প মৃদুল গুঞ্জনের মত গুনগুন করে। —একটা কথা মনে রেখ অতীন।

অতীন—বল।

কাজরী—কেতকীর মত এত বড় অহংকার আমার নেই। তুমি আমার কাছ থেকে কোনদিন মুক্তি পাবে না।

কাজরীও অকপট মনের মেয়ে। এবং কাজরীর এই অকপট মনটাকেও বড় মায়াময় মনে হয়, বড় ভাল লাগে অতীনের। নভেলী প্রেমের মত কোন সর্বত্যাগী প্রেম বা আত্মত্যাগী প্রেমের কথা ব'লে নিজের মনের মস্ত একটা মহিমার বাখান করে না কাজরী।

দিনের পন দিন ফুরিয়ে যায়, এবং বিয়ের তারিখটা ঠিক না হলেও একটি সন্ধ্যাও বৃথা যায় না। দু'জনের ভালবাসার সম্পর্কটা এজন্য উপোস ক'রে বসে থাকে না। প্রতিদিন ঠিক সময়ে এই বিনা রাখীর বন্ধনটাই উৎসবের আবেশে চঞ্চল হয়ে ওঠে। এমন একটি সন্ধ্যাও বাদ যায় কিনা সন্দেহ, যে সন্ধ্যায় কাজরীর খোঁপার সুগন্ধ অতীনের সিল্কের পাঞ্জাবির বুক অভিষিক্ত না করেছে। কী তৃপ্তিময় সেই উপহার! ঐ পরশ পরশরতনই বটে। অতীনের সুন্দর চেহারার যত রক্তকণিকা যেন সোনা হয়ে যাচ্ছে।

না, আর ভয় করবার কি আছে? অতীনের চোখে কোন রাতে আর কোন ছায়া দেখা দেয় না। শুধু একটি চিন্তা আছে, এবং সেই চিন্তার মধ্যে মাঝে মাঝে অন্যরকমের একটা ভয় চঞ্চল হয়ে ওঠে। দেরি হবে বোধ হয়। কে জানে কোথা থেকে আবার কোন্ আইনের আর প্রমাণের আপত্তি এসে দরখাস্তের দাবিটাকে একটা-দুটো বছরের মত স্থগিত ক'রে রেখে দেবে? শুধু এই একটা আশঙ্কা অতীনের আশার পথে দাঁড়িয়ে যেন সেই খাটাসের ছায়ার মত দিনের পর দিন ধুঁকতে থাকে।

কিন্তু বেশি দিন নয়; এই নতুন ভয়টাও শুধু আর কয়েকটা মাস অতীনের মনের অস্বস্তি ঘটিয়ে তারপরেই সরে গেল। কেতকীর দরখাস্তের দাবি মঞ্জুর করেছে আদালত। শুভ বিচ্ছেদের সংবাদটা খবরের কাগজের পাতাকেও চমকে দিয়ে হেসে ওঠে।

চন্দননগরের গঙ্গার জলে আবার একদিন চাঁদের আলো নাচে। ঘাটের কাছে বেড়াতে বেড়াতে অতীন বলে—মুক্তি পেয়েছি কাজরী। ডাইভোর্স মঞ্জুর হয়েছে।

কাজরী হাসে—শুনেছি। আমার সৌভাগ্য।

আর বাধা কোথায়? এইবার কাজরীর সঙ্গে অতীনের, দুটি জীবনের অবাধ ও সর্তহীন ভালবাসার একটা আইনগত বন্ধন সম্পন্ন হয়ে যেতে বাধা নেই। শুধু চিন্তা করতে হয়, এমন কি মাঝে মাঝে

টেলিফোনেও ছু'জনে আলোচনা করে, কবে বিয়ে হতে পারে? কোন্ সময়ে হলে ভাল হয়?

নতুন পাড়ার পাঁচু এবং ওরই মত আর ছু'চার জন হাভাতে মানুষ ছাড়া রসিকপুরের আর কোন মানুষ এই ভাঙ্গা রাজবাড়ির ছায়ার কাছেও আসে না। তবে একটা বিষয়ে খোঁজখবর করবার ইচ্ছা অনেকেরই চিন্তায় ও কথায় লক্ষ্য করা যায়। কমল বিশ্বাস তার ঐ প্রকাণ্ড বাস্তু আর বাগান কবে বেচবে? ধ্বংসস্তূপের মত দশা হয়ে গেলেও ওটা ভূসম্পত্তি হিসাবে মন্দ নয়। সম্পত্তিটা কারও কাছে বন্ধক রেখেছে কি কমল বিশ্বাস? মিউনিসিপালিটির ট্যাক্স নিয়মিত দিচ্ছে তো? লোকটার বিরুদ্ধে কোন পাওনাদারের মামলা, কোন বডি ওয়ারেণ্ট, কোন ডিক্রি, কিংবা কোন ক্রোকী পরোয়ানা ঝুলছে কি? কমল বিশ্বাসের মত চিরকেলে ঠগ আর ধূর্ত মানুষের সম্পত্তি কিনতে হলেও খুব সাবধান হয়ে এবং বেশ ভাল ক'রে সার্চ করিয়ে তবে কেনা উচিত। ঐ ভাঙ্গা রাজবাড়ির ঐ জঙ্গলের মত বাগানগুলিতে যত কাঁটা আছে, তার চেয়ে অনেক বেশি কাঁটা আছে কমল বিশ্বাসের বুদ্ধির মধ্যে। টাকা দিয়ে কিনলেও সে সম্পত্তি বাগিয়ে ধরা যাবে কি? না, কমল বিশ্বাসের বুদ্ধির খোঁচায় হাত সরিয়ে নিতে হবে, ঠকতে হবে?

এই ভৎর্সনা কমল বিশ্বাসের জীবনে নতুন কোন ভৎর্সনা নয়। কমল বিশ্বাস জানেন যে, রসিকপুরের ভিতরে ও আসে-পাশের মানুষের সমাজ তাঁকে অমানুষ বলে মনে করে। করুক, সেই ভৎর্সনা ও নিন্দার মুখরতা তাঁর মনে কোন দাগ ধরাতে পারে নি; কোন দিনও ব্যথিত ও বিচলিত হয়ে নিজের মনুষ্যত্বকে সন্দেহ করেননি কমল বিশ্বাস। ওদের তুলনায় অন্য রকমের মানুষ হলেই ওরা তাকে অমানুষ বলে। বলুক; যে অবস্থায় পড়লে যা করা

উচিত, তিনি, তাই ক'রে এসেছেন। উপায়হীন অবস্থার চাপে অসহায়ের মত গুঁড়ো হয়ে না গিয়ে, নিজের সাধ্যমত চেষ্টার জোরে নিজের স্বার্থ বাঁচিয়েছেন ; সে চেষ্টার মধ্যে দশটা মিথ্যা কথা আর পাঁচটা ভূয়ো সই আর দুটো বাজে গল্প থাকলেই বা কি আসে যায় ?

আগে প্রায়ই সুধাময়ীর কাছে একটা দার্শনিক গল্প বলতেন কমল বিশ্বাস, আজকাল অবশ্য আর বলেন না। ভগবান কৃষ্ণকে কাছে পেয়ে কালিয় নাগ বিষ ঢেলে দিয়ে পূজা করেছিল। তা ছাড়া আর কি দিয়ে পূজা করবে কালিয় নাগ! বিষ ছাড়া অন্য কোন সম্বল যে তার ছিল না। আমিও, আমিও আমার ভাগ্যের ভগবানকে আমার যা সম্বল, আমার পক্ষে যা সাধ্য, তাই দিয়ে পূজা করেছি। লাখ টাকা থাকলে আমি তোমার বড়দিকে ফাঁকা কথায় ভুলিয়ে সামান্য কয়েকটা টাকা হাত করতাম না সুধা।

দমদমের স্কুলের সেই ফণ্ডের টাকা সরাবার ব্যাপারটা? হ্যাঁ, যদিও সে আজ প্রায় পঁচিশ বছর আগের ব্যাপার, তবু এই সেদিনও সুধাময়ীর কাছে গল্প করতে করতে নানা কথার মধ্যে বেশ রাগ ক'রে চেঁচিয়ে উঠেছিলেন কমল বিশ্বাস—ঠিক করেছিলাম, কোন অন্যায় করিনি, সে জন্য আমি আজও একটুও লজ্জিত নই সুধা।

চুপ ক'রে, এবং হয়তো স্বামীর ঐ দার্শনিক যুক্তি মেনে নিয়ে এই সেদিনও যে রোগা মোমের মত সাদাটে চেহারার, বোকা সরল ও দুঃখে উদ্বেগে জর্জর মানুষটা হাসিমুখে কমল বিশ্বাসের উত্তপ্ত মাথায় পাখার বাতাস দিয়েছিল, সে মানুষটা শয্যা নিয়েছে। এই ভাঙ্গা বাড়ির দুর্ভাগ্যের কদর্যতা সহ্য করতে না পেরে ভয়ানক এক বিদ্রোহ ক'রে বসে আছে সুধা। বোধহয় আর উঠতে চায় না সুধা। চলে যাবার জন্য ছটফট করছে। মাঝে মাছে যে-রকম অসাড় হয়ে পড়ে থাকে সুধা, দেখে মনে হয় চলেই গিয়েছে। এবং যদিও মুখে বলতে পারেন না কমল বিশ্বাস, কিন্তু মনের ভিতরে

একটা অভিমান ডুকরে ওঠে। এ-কি করেছো সুধা? তুমিই না বলেছিলে যে, আমাকে একা ফেলে রেখে তুমি চলে যেতে চাও না?

সুধাময়ীর জন্যই ওষুধ আনবার কাজে সেদিন বাইরে যেতে হয়েছিল, নতুন পাড়ার পাঁচুকে পাওয়া যায় নি। নিজেই লাঠি হাতে নিয়ে ঠুকঠুক ক'রে দমদম পর্যন্ত হেঁটে গেলেন কমলবাবু, ওষুধ নিয়ে ফিরে এলেন, এবং ঠাকুরদালানের বারান্দার উপর ধপ ক'রে বসে পড়ে ঠকঠক ক'রে অনেকক্ষণ ধরে কাঁপলেন। যে সন্দেহ কোনদিন হয়নি, সেই সন্দেহ তাঁর বুকের ভিতর হিমাক্ত বাতাসের ছোঁয়ার মত সিরসির করছে। অমানুষ, কমল বিশ্বাস সত্যিই অমানুষ। কমল বিশ্বাসের জীবনটাই নতুন ক'রে এই গালি খেয়ে চমকে উঠেছে।

কৈলাস বাবুর বাড়ির সামনের রোয়াকের উপর ভদ্রলোকদের দাবা আর গল্পের আসর মেতে উঠেছিল। সন্ধ্যার অন্ধকার গায়ে জড়িয়ে খুটখাট ক'রে সেই রোয়াকের নিকট দিয়েই পথ হেঁটে বাড়ি ফিরছিলেন কমল বিশ্বাস। শোনা গেল গল্প, কে যেন বলছে —কমল বিশ্বাস তার দুষ্কর্মের জীবন থেকে রিটায়ার করেছে বলে মনে হচ্ছে। আজকাল লোকটার কোন সাড়া শব্দই পাই না।

আর একজন উত্তর দিল—কি যে বলেন মশাই! লোকটা আজকাল একেবারে আস্ত একটা কশাই হয়ে উঠেছে। ভাঁওতা দিয়ে, সাতপুরুষের জমানো সোনা ভিটের নীচে পোঁতা আছে, এই গল্পের জোরে নিজেকে বড়লোক ব'লে জাহির ক'রে কোন্ এক বড়লোকের মেয়েকে ঘরের বউ ক'রে নিয়ে এসে, সেই মেয়েকে দিয়েই আবার চাকরি করিয়ে টাকা বাগাচ্ছে। আজকাল দিব্যি সুখে আছে কমল বিশ্বাস।

দৌড়বার শক্তি নেই, নইলে বোধহয় দৌড়েই চলে আসতেন কমল বিশ্বাস। সারা জীবন ভৎর্সনা নিন্দা অপমান অপবাদ আর

গঞ্জনায় নির্বিকার কমল বিশ্বাসের অন্তরাত্মা কোনদিন এরকম শিউরে ওঠেনি, বুকব্যথার আঘাতেও ঐ জীর্ণ শরীর এরকম ঠক ঠক ক'রে কোনদিন কাঁপেনি।

নিজের ছেলে আর নিজের মেয়ে পর হয়ে গিয়েছে; কিন্তু পরের মেয়ে কেতকীকে আপন মেয়ে বলে ভাবতে যে এত ভাল লাগছে, সেটা কি সত্যিই একটা বাপের মনের মত মনের স্নেহ ?

স্নেহ নয়, মায়া নয়, ওটা একটা চমৎকার ধূর্ততা, চতুর স্বার্থ; তোমার বুড়ো বয়সের বুদ্ধির সব চেয়ে বড় চক্রান্তের আহ্লাদ। কমলবাবুর মনে হয়, তাঁর পাঁজরগুলি ঠক ঠক ক'রে কেঁপে এই ধিক্কার দিচ্ছে।

একেবারে খাঁটি সত্য ঐ ধিক্কারের ভাষা। কেতকীকে চলে যেতে বলতে মন চায় না। কেতকী চলে গেলে যে সুধাময়ীর জন্য এই ওষুধটুকুও কিনবার উপায় থাকবে না। কেউ একটা পয়সাও ধার দেবে না, দয়া করবে না, ধূর্ত কমল বিশ্বাসের উপর নিষ্ঠুর হয়ে রয়েছে সারা জগতের মন। উপায় নেই, কেতকী চলে গেলে উপোস ক'রে মরতে হবে।

এই তো আসল ভয়। নিজের মনটাকে ভুল ক'রে একটু শ্রদ্ধা করে ফেলেছিলেন, নিজেকে আজকের মত এত স্পষ্ট ক'রে চিনতে পারেন নি, তাই একদিন, এই বাড়িতেই দেড় বছর আগের এক সন্ধ্যায় কেতকীকে কাছে ডেকে নিয়ে আবেদন করেছিলেন—তুমি রাগ ক'রে চলে যেও না কেতকী। তুমি চলে গেলে এই বুড়ো বুড়ির দুটো মায়ার বুক উপোস ক'রে মরে যাবে। দু'টো ক্ষুধার পেট উপোস ক'রে মরে যাবে, এই ভয়টাকেই সেদিন ওরকম একটা ভদ্রভাষায় বেশ কৌশল ক'রে কেতকীর কাছে জানিয়ে কেতকীর মন গলাতে পেরেছিলেন।

মনেও পড়ে কমল বিশ্বাসের, কেতকী নামে ঐ মেয়ে এই বাড়ির ভয়ানক চক্রান্তের সব ইতিহাস জানতে পেরেও হেসে

উঠেছিল। অনায়াসে কমল বিশ্বাসকে সান্ত্বনা দিয়েছিল, আপনারা যেতে না দিলে আমি যাব না বাবা।

ঐ সেদিন, জীবনে বোধ হয় মাত্র ঐ একটি দিন কমল বিশ্বাসের চোখে সত্যিকারের অশ্রু টলমল ক'রে উঠেছিল। একটা পরের মেয়ের মনের এত বড় আপন-করা মহত্ত্ব দেখবার আনন্দে নয় বোধ হয়, আজ বিশ্বাস করেন কমল বিশ্বাস, নিজেরই জীবনের একটা স্বার্থপর সৌভাগ্যের আনন্দে সেদিন তিনি কেঁদে ফেলেছিলেন।

আজ এত বেশি ক'রে এই সব কথা ভাবতে হচ্ছে, আর ভয় পেতে হচ্ছে কেন, তা'ও জানেন কমল বিশ্বাস। এইবার কেতকী সত্যিই চলে যেতে পারে, এমন আশঙ্কা একেবারে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সিঁদুর মুছে দিয়ে যে-মেয়ে বিধবা সেজেছে, সে মেয়ে তার জীবনের বিদ্রোহ এতদিনে একেবারে স্পষ্ট ক'রে দিয়েছে। ভয়ে ভয়ে এই দুটি মাস কাটিয়েছেন কমল বিশ্বাস। কেতকীর মুখের দিকে মুখ তুলে তাকাবার সাহস পান নি। এবং হঠাৎ রামকানাইবাবুর কাছ থেকে একটা ভয়ানক অভদ্র ভাষার চিঠি এসে গিয়েছে। জানিয়েছেন রামকানাইবাবু, এইবার একটা হেস্তনেস্ত ক'রে ছাড়বেন। শাসিয়েছেন, মিষ্টি কথার চালাকিতে বোকা মেয়েটার আরও সর্বনাশ করবার মতলব এইবার ছাড়ুন মশাই। ভাল চান তো কেতকীকে আটকে রাখবার চেষ্টা করবেন না। এই চিঠি পাওয়া মাত্র কেতকীকে এখানে পাঠিয়ে দিন।

কেতকী সিঁদুর মুছেছে, এই খবর রামকানাইবাবু পেলেন কেমন ক'রে? কেতকীই কি চিঠি লিখে জানিয়েছে? নইলে এত রুষ্ট হয়ে হেস্তনেস্ত করবার জন্য প্রতিজ্ঞা ক'রে আর শাসিয়ে চিঠি দেবেন কেন রামকানাইবাবু? ভদ্রলোক মাঝে তো বেশ শান্ত হয়েই গিয়েছেন বলে মনে হয়েছিল।

ঠাকুরদালানের বারান্দার এক কোণে বসে মনে মনে রামকানাইবাবুর রাগের রহস্যটা বুঝতে চেষ্টা করেন কমল বিশ্বাস।

হঠাৎ চোখে পড়ে দক্ষিণ দরজার বাগানের পথের উপর যেন একটা মোটরগাড়ি নিঃশব্দ হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। গাড়ির লাল রং-এর একটা আলো জ্বলছে।

কা'র গাড়ি? রামকানাইবাবুর? কখন এল গাড়িটা? তাহ'লে চলে যাচ্ছে কেতকী? কমল বিশ্বাসের বুকের ভিতরে একটা বোবা আর্তনাদ চমকে ওঠে। যেন সর্বস্ব লুট হয়ে যাচ্ছে, রসিকপুরের রাজবাড়ির সত্যিকারের সোনা কেড়ে নিতে এসেছে এক দুর্ভাগ্যের ডাকাত।

বাধা দিতে হবে। কিন্তু কেমন ক'রে বাধা দেওয়া যায়? সেই জোর কোথায়? ঠাকুর পদ্মনাভ যে কমল বিশ্বাসের জীবন থেকে সেই ধূর্ততার জোরটুকুও কেড়ে নিয়েছেন, বোধ হয় কেতকী যেদিন এসেছে সেইদিন থেকে। কি অদ্ভুত দুর্বলতা, চেষ্টা করলেও সামান্য একটা মিথ্যাকথা আর বলতে পারা যায় না! অসহায় শিশুর মত একটা আতঙ্কিত মুখ নিয়ে আস্তে আস্তে হেঁটে ঘরের দিকে এগিয়ে যান কমলবাবু, এবং শুনতে পান, রামকানাইবাবুর প্রশ্নে আর গর্জনে এই ভাঙ্গা-বাড়ির ঘরের বাতাস কাঁপছে।

—যাবি না মানে? তোর কি সত্যই মাথা খারাপ হলো কেতকী? নিজেই আদালতে দরখাস্ত ক'রে ডাইভোর্স নিলি, আর দরখাস্তে নিজেই স্বীকার করেছিস যে, স্বামীর সঙ্গে কোনদিন সম্পর্ক হয় নি, স্বামীর উপর কোন অনুরাগ তোর নেই, তার পরেও আবার এসব কি কথা? এর মানে কি?

—রাগ করো না মামা। আমি এখন যেতে পারবো না।

—কবে যাবি?

—তা'ও বলতে পারি না।

—তাহ'লে বুঝলাম, এই বুড়োবুড়ি মন্ত্র-পড়া শিকড়-বাকড় খাইয়ে তোর বুদ্ধিসুদ্ধিকে তুক করেছে।

কেতকী—ওঁদের কোন দোষ নেই।

রামকানাইবাবু ভ্রূকুটি ক'রে বলেন—হ্যাঁ, অগত্যা আমাকেও তাই বিশ্বাস করতে হচ্ছে। দোষ তোমার, তোমার কপালের।

দরজার বাইরে আড়ালে দাঁড়িয়ে-থাকা কমল বিশ্বাসের মূর্তিটা আরও একটু সরে গিয়ে আরও বেশি আড়াল হয়ে যায়। গটমট ক'রে ঘরের ভিতর থেকে বের হয়ে আসেন রামকানাইবাবু, এবং দুপদাপ ক'রে হেঁটে ভাঙ্গা-বাড়ির জিরজিরে বুকের ইটগুলিকে কাঁপিয়ে দিয়ে চলে যান। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে শুনতে থাকেন কমল বিশ্বাস, দক্ষিণ দরজার বাগানের পথটাকেও গম্ভীর গর্জনে চমকে দিয়ে চলে গেল রামকানাইবাবুর গাড়ি।

খালি হাতে চলে গেল ডাকাত, এই ভাঙ্গা-বাড়ির সৌভাগ্যের সঞ্চয় লুট ক'রে নিয়ে যেতে পারলো না। ভীত শিশুর মত করুণ চোখ ক'রে এতক্ষণ তাকিয়ে থেকে এইবার হাঁপ ছাড়েন কমল বিশ্বাস এবং চোখের চাহনিও যেন হেসে ওঠে।

আনন্দটা যেন এক বিজয়বন্ত বীরের আনন্দ। চেঁচিয়ে ডাক দেন কমলবাবু—কেতকী! কেতকী মা!

কেতকী সামনে এসে দাঁড়ায়। প্রশ্ন করেন কমলবাবু—রামকানাইবাবু এসব কি অদ্ভুত কথা বললেন কেতকী?

কেতকী—কোন্ কথা?

কমলবাবু—ডাইভোর্স।

কেতকী—হ্যাঁ, আমিই দরখাস্ত করেছিলাম, আপনার ছেলেও তাই চেয়েছিল।

কমলবাবু অনেকক্ষণ গম্ভীর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। কেতকীর মুখের দিকেও অপ্রস্তুতভাবে বারবার তাকান। কেতকীর মাথার কাপড়টা একটা দমকা বাতাসের আঘাতে পড়ে গিয়েছে। সাদা সিঁথির দু'পাশে ফুরফুর করছে কালো চুলের গুচ্ছ। কিন্তু শাড়িটা তো বেশ রঙীন, কানের দুল জোড়াও ঝিক ঝিক ক'রে দোলে।

পায়ে লাল বনাতের চটি। কমল বিশ্বাসের সংসারে দিব্যি ফুটফুটে একটি কুমারী মেয়ে যেন বাপ-মা'র আদরে নিশ্চিন্ত হয়ে রয়েছে।

কি বুঝতে গিয়ে কি বুঝে ফেলছেন কমল বিশ্বাস, চোখে বোধহয় ধাঁধাঁ লেগেছে। কেতকী যাবে না, কেতকী যেতে চায় না, কিন্তু কেন? আরও ভাল ক'রে জেনে আরও নিশ্চিন্ত এবং আরও আশ্বস্ত হতে চান কমল বিশ্বাস।

আদরের সুরে প্রশ্ন করেন কমলবাবু—কিন্তু···তবু তুমি চলে যেতে চাও না কেন কেতকী?

মাথা হেঁট করে কেতকী।

সেই মুহূর্তে আতঙ্কিতের মত চেঁচিয়ে উঠেন কমল বিশ্বাস—ও কি? কি হলো? তুমি কাঁদছো কেন কেতকী?

টুপটাপ ক'রে এক একটা বড়-বড় জলের ফোঁটা আজ ঝরে পড়ছে কেতকীর সেই চোখ থেকে, যে চোখ এই বাড়ির সব চক্রান্তের মালিন্যের গ্লানির আর দারিদ্র্যের দিকে তাকিয়েও এতদিন শান্তভাবে ঝিকমিক ক'রে হেসেছে।

যে মেয়েকে কোন মুহূর্তেও উতলা হতে দেখেননি কমল বিশ্বাস, সেই মেয়ে, সেই কেতকী হঠাৎ উতলা হয়ে আর চোখ দুটোকে আঁচল চাপা দিয়ে ছুটে চলে গেল। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকেন কমল বিশ্বাস, কেতকীর উপর রাগ ক'রে শয্যা নিয়ে মরবার জন্য চেষ্টা করছে যে মানুষটা, সেই সুধাময়ীর ঘরের ভিতরে গিয়ে যেন আছড়ে পড়লো কেতকী।

কি-যেন সন্দেহ করেন কমল বিশ্বাস, ভয়ানক বিষাক্ত একটা সন্দেহ। ভৈরব বিশ্বাসের লালসার অভিশাপে বিষাক্ত একটা সরীসৃপ কেতকীর জীবন দংশন ক'রে পালিয়ে গিয়েছে। তাই কি? সন্দেহটার সঙ্গে যেন লড়াই করতে করতে, কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়েন কমল বিশ্বাস। স্তব্ধ হয়ে বসে থাকেন কিছুক্ষণ।

তারপরেই আস্তে আস্তে সুধাময়ীর ঘরের দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ান।

আর এক বিস্ময়। বিছানার উপর উঠে বসেছেন সুধাময়ী, আর কেতকীর গলা ধরে চুমো খেয়ে আত্মহারা হয়ে যাচ্ছেন, তবু যেন তাঁর তৃপ্তি পূর্ণ হচ্ছে না। চোখের উপর তেমনই শাড়ির আঁচল চেপে নিঝুম হয়ে রয়েছে কেতকী। কিন্তু সুধাময়ী এ কি কাণ্ড করছেন? বোঝা যায় না, কেন কেতকীকে বার বার বুকে জড়িয়ে ধরছেন, মাথায় হাত বুলোচ্ছেন। কোথা থেকে আর কেন এরকম একটা প্রাণশক্তি উথলে উঠলো এই মোমের মত সাদাটে মানুষটার রোগা শরীরে, দু'মাস হলো আধমরা হয়ে বিছানায় পড়ে আছে যে? সত্যিই বুঝতে পারেন না কমল বিশ্বাস; সুধা কি ক্ষমা চাইছে, না প্রায়শ্চিত্ত করছে, কিংবা কোন নতুন খুশির আবেগে পাগল হয়ে গিয়েছে?

কি ভয়ানক তীব্র স্বরে চেঁচিয়ে উঠলেন সুধাময়ী।—বেশ করেছ কেতকী, ও সিঁদুর মুছে ফেলাই উচিত ছিল। জানলে আমি নিজের হাতে ঐ হতভাগার চোখের সামনেই তোমার সিঁথির সিঁদুর মুছে দিতাম।

চোখ বন্ধ ক'রে দাঁড়িয়ে সুধাময়ীর এই ভয়ানক প্রলাপ শুনতে থাকেন কমলবাবু। থামছে না সুধা, ওর মোমের মত সাদাটে চেহারার ভিতর থেকে যেন আগুনের জ্বালা ফুটে বের হচ্ছে, আর কথাগুলিও যেন দাউ দাউ ক'রে জ্বলছে।—আমি মানুষের মা নই কেতকী, আমি সাপের মা। তবু...তবু...আমাকে ঘেন্না করো না কেতকী। আমি যে স্বপ্নেও ভাবিনি, কোন মানুষ তোমাকে এত বড় অপমান করতে পারে।

বলতে বলতে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠেন সুধাময়ী—এমন কথা শোনার চেয়ে তুমি সত্যি বিধবা হয়েছ জানলেও যে আমার এত দুঃখ হতো না।

সুধাময়ীকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করেন না কমলবাবু। প্রলাপ নয়। মেয়েজাতের মনের সেই আদিম অভিমান, মেয়ে জীবনের সব চেয়ে বড় অপমানের জ্বালা সুধাময়ীরই ঐ কান্নার স্বরে ক্ষমাহীন ধিক্কারের সঙ্গীতের মত বাজছে। এখানে কোন পুরুষের মুখের সান্ত্বনা সাজে না, সে সান্ত্বনা দেবার অধিকার নেই কমল বিশ্বাসের।

নিজেই শান্ত হন সুধাময়ী। কেতকীও আস্তে আস্তে উঠে, চোখের উপর তেমনি আঁচল চাপা দিয়ে নিজের ঘরের দিকে চলে যায়।

কমল বিশ্বাস বলেন—আমি সব কথা না জেনেও বোধ হয় ঠিকই সন্দেহ করেছি সুধা।

ক্লান্ত পাগলের মত সুধাময়ীও মৃদুস্বরে বিড়বিড় করেন—হ্যাঁ, কেতকীর ছেলে হবে। তোমারই ছেলে ভয় দেখিয়ে···জোর ক'রে ···রাক্ষসের মত···।

—শুনতে চাই না, শুনতে চাই না। বলতে বলতে ঘরের বাইরে চলে যান কমল বিশ্বাস।

সেই মনুমাসি, অর্থাৎ সুধাময়ীর বড়দি, যিনি এই দু'বছরের মধ্যে কোনদিন তাঁর এই বোনের বাড়িতে আসবার সময় পাননি, তিনিই এলেন একদিন। সুধাময়ীর চেয়ে দশ বছর বয়সের বড় হলেও চলতে ফিরতে আর বেড়াতে তাঁর ঐ বার্ধক্যের শক্তি দেখলে আশ্চর্য হতে হয়। গাড়িও আছে তাঁর, এবং তাঁর গাড়ি সকাল সন্ধ্যা দু'বেলা সারা কলকাতার পথে দৌড়াদৌড়ি ক'রে যত কুটুম্বাড়ি, আত্মীয়ের বাড়ি আর চেনাশোনা পরিবারের বাড়িতে তাঁকে নিয়ে যায়। কা'র নতুন বাড়ি হলো, কা'র ছেলের ভাল চাকরি হলো, এবং কা'র মেয়ের কি-রকম ভাল ঘরে বিয়ে হলো,

শুধু এইরকমের যত সৌভাগ্যের তথ্য জানবার জন্য তাঁর চিন্তার ও ব্যস্ততার যেন অন্ত নেই। অনেকদিন পরে রসিকপুর নামে এই জায়গাটাকে, রাজবাড়ি নামে এই ভাঙ্গা-বাড়িটাকে, এবং এক ভাঙ্গা-কপালের বোনকে হঠাৎ মনে পড়ে গিয়েছে, তাই এসেছেন।

—তোরা তো আমাকে ভুলেই গিয়েছিস সুধা, কিন্তু আমি ভুলবো কি করে? তাই এলুম।

তারপরেই কমলবাবুর দিকে তাকিয়ে দাবি করেন মনুমাসি। —এইবার সাহেবের কাছ থেকে আমার সেই পাঁচশো টাকা আদায় ক'রে দাও কমলবাবু। একটা ঠগ সাহেব আমার পাঁচশো টাকা হজম ক'রে দেবে, এ জ্বালা কি আমি ভুলতে পারি বল? তাই এলুম তোমাকে মনে করিয়ে দিতে।

কমল বিশ্বাসের ভীরু চোখ দুটো কিছুক্ষণ অদ্ভুতভাবে ধিকিধিকি ক'রে জ্বলতে থাকে। তারপরেই চেঁচিয়ে ওঠেন কমল বিশ্বাস। —সাহেব নয়, আপনার ঐ টাকা আমিই হজম করেছি বড়দি।

বড়দি হো হো ক'রে হেসে ওঠেন। —তুমি আজও তোমার সেই রগুড়ে স্বভাবটি ছাড়তে পারনি কমলবাবু। কি ভয়ানক হাসাতে পার তুমি! যাই হোক, সাহেবটা কবে আমার টাকা ফেরত দেবে বল?

কমলবাবু—আমিই ফেরত দেব।

বড়দি হাসেন—ঐ একই ব্যাপার হলো। কিন্তু কবে?

কমলবাবু—দেখি কবে পারি।

বড়দি—বেশি দেরি করো না।

কমলবাবু—না, দক্ষিণ দরজার বাগানটা বেচতে যতটুকু দেরি হতে পারে, তার বেশি নয়।

মনুমাসি বড় খুশি হয়ে আশীর্বাদের মত স্বরে বলতে থাকেন—ভগবান তাই করুন। শাস্ত্রে বলেছে, যে মানুষ অঋণী, তার

জীবনের শেষদিনে স্বয়ং মহাদেব তার চোখের সামনে এসে দেখা দেন।

উঠলেন মনুমাসি। যেতে যেতে কেতকীর দিকে চোখ পড়তেই থমকে দাঁড়ালেন। —অঁ্যা, বউ-এর চোখ-মুখ দেখে কেমন যে মনে হচ্ছে সুধা। কোন অসুখ-বিসুখ নয় তো?

সুধাময়ী ভয়ে ভয়ে বললেন—না।

মনুমাসির চোখ দুটো তবু কটকট ক'রে তাকিয়ে থাকে।—তবে পোয়াতি?

চমকে ওঠেন সুধাময়ী—হঁ্যা।

—ভাল কথা। বলতে বলতে এগিয়ে যান মনুমাসি, এবং একটু দুঃখিত স্বরে বলেন—ছেলের আর মেয়ের বিয়ে দিয়েছিস, খবরগুলো সময়মত পেয়েছিলাম ঠিকই, কিন্তু এমনই দুর্ভাগ্যি যে, বিয়েতে আসতেই পারলুম না। গাড়িটা বিকল হয়ে পড়ে রইল। বাসনাকে আর তোর ছেলের বউকে যে একটু সোনা দিয়ে আশীর্বাদ ক'রে যাব, ভগবান সে সুযোগও দিলেন না। ...তা, বাসনার বিয়ে দিলি কোথায়?

সুধাময়ী—হয়তো চিনবেন, এলাহাবাদের পার্থবাবুর ছেলের সঙ্গে।

মনুমাসি—অঁ্যা? বলিস কিরে সুধা? বউ আনলি কাদের ঘর থেকে? কার মেয়ে?

সুধাময়ী—খড়দ'র রামকানাইবাবুর ভাগ্নী।

মনুমাসির বিস্ময় যেন ডুকরে ওঠে—অঁ্যা? একটা কাণ্ডই করেছিস সুধা!

ভাঙ্গা সিঁড়ির উপর একবার দাঁড়ালেন মনুমাসি। তারপর আক্ষেপ করলেন।—রামকানাই-এর বুদ্ধি-সুদ্ধি সুবিধের নয়। টাকার কুমীর, এই একমাত্র গুণ। ঘরে কোন মেয়েছেলেও নেই যে ওকে একটা সুপরামর্শ দেবে। নইলে...নইলে আমার

ভাসুর-পো অজয়ের সঙ্গে ওর ভাগ্নীর বিয়ের প্রস্তাবটা তুচ্ছ ক'রে এখানে ভাগ্নীর বিয়ে দিল কি দেখে? দেখা হলে রামকানাইকে মিষ্টি মিষ্টি দুটো কথা না শুনিয়ে ছাড়বো না।

সুধাময়ীর দিকে তাকিয়ে মিষ্টি ক'রে হেসে উঠলেন মনুমাসি—যাই সুধা।

মাসগুলিও ফুরিয়ে যেতে থাকে কত তাড়াতাড়ি। এক একটা মাস যেন এক একটা রঙীন প্রজাপতির মত ফুরফুর ক'রে উড়ে পালিয়ে যাচ্ছে। ক্যালেণ্ডারের পাতা ছিঁড়তে গিয়ে বুঝতে পারে অতীন, অনেকগুলি মাস পার হ'য়ে গিয়েছে।

অতীনের আশার পথে আর কোন সমস্যার খাটাস বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে নেই। একটা বেশ ভাল নিরিবিলি জায়গায়, একটা নতুন বিল্‌ডিং-এ একটা ফ্ল্যাট ভাড়া নিতে হবে। মনের মত ফ্ল্যাট পাওয়া যায় না। সন্ধান করতে হয়। পেলেই বিয়ের তারিখটা ঠিক ক'রে ফেলা হবে। শো-রুমে আর অফিস-ঘরের মধ্যে নানা ব্যস্ততার ফাঁকে ফাঁকে অতীনের এই চেষ্টাও ব্যস্ত হয়ে ওঠে।

কিন্তু একেবারে আচমকা, বিনা ঝড়ে ধুলোর আঁধির মত একটা ঘটনা অতীনের জীবনটাকে যেন ধাঁধিয়ে দেবার জন্যই ছুটে এল। হঠাৎ ভয়ে চমকে উঠতে হ'লো, কারণ এধরনের একটা ভয়াল খবরের ভ্রূকুটি দেখবার জন্য প্রস্তুত ছিল না অতীন, এবং এরকমটা হবে বলে কল্পনাতেও কোন সন্দেহ দেখা দেয়নি কোনদিন!

ঘরে ফেরার জন্য অফিস-ঘর থেকে বের হয়ে ফুটপাথের উপর এসে দাঁড়াতেই দেখতে পায় অতীন, একটা ট্যাক্সি থেকে গড়িয়ে গড়িয়ে নামছে অজয়। মনুমাসির ভাসুরপো হয়, সেই রেস্‌্তুড়ে অজয়। মদ খেয়ে লোকটা একেবারে বেহেড হয়ে এসেছে।

—হাউ ডু ইউ ডু মাই ডিয়ার বয় ? বলতে বলতে কাছে এসে লম্বা একটা টেকুর তুলে হাসতে থাকে অজয়।

অতীন মুখ সরিয়ে নিয়ে হাসতে চেষ্টা করে।—পথের ওপর আবার এসব কীর্তি কেন ?

অজয় বলে—কিন্তু মানুষকে পথে বসাতে তুমি যে কীর্তির ডিউক অব ওয়েলিংটন বাবা !

অজয় মাতালকে খুব ভাল ক'রে চেনে অতীন। ভাল কথা বলে অনুরোধ ক'রে বাধা দিলে ওর মাতলামি আরও মত্ত হয়ে ওঠে, এবং গলা টিপে ধরলে আরও বেশি খিস্তি বমি করে। অজয়ের কথার কোন উত্তর না দিয়ে পাশ কাটিয়ে চলে যেতে থাকে অতীন। কিন্তু থমকে দাঁড়াতে হলো। চমকে উঠেছে অতীনের হৃৎপিণ্ডের রক্ত। কি ভয়ংকর একটা কথা বলে ফেলেছে অজয় মাতাল !

—ছিঃ, ফাই অতীন ফাই ! যে নারী তোমাকে লাইক করে না, তোমাকে হেট করে, সেই নারীটাকেও ভুলিয়ে ভালিয়ে···ছি।

—আস্তে কথা বল অজয়। দাঁতে দাঁত ঘষে হুমকি দেয় অতীন।

এক গাল হেসে আবার যেন গড়িয়ে পড়তে চায় অজয়, এবং আরও জোরে চেঁচিয়ে ওঠে—আরও আস্তে ? অ্যাঁ ? লজ্জা করছে বুঝি ?

লজ্জায় জিভ কাটে অজয় মাতাল। তার পরেই যেন সান্ত্বনা দেবার ভঙ্গীতে বলে—চিন্তা করো না অতীন।

অতীন ধমক দেয়—আমি কোন চিন্তা করি না। তুমি কি বলতে চাইছো বল।

বুক টান ক'রে অজয় বলে—বলতে চাইছি, এই অবাঞ্ছিত আনহ্যাপি অনর্থক মাদারহুড সহ্য করবার পাত্রী নয় কেতকী। এবং সে বেচারার এরকম একটা ন যযৌ ন তস্থৌ অবস্থা আমরাও

সহ্য করতে রাজি নই। রামকানাইবাবুর সম্পত্তি বাগাবার জন্য কেতকীর কাছে তুমি একটি বংশধর গছিয়ে রাখবে, সেটি হতে দিচ্ছি না।

বিমূঢ়ের মত তাকিয়ে থাকে অতীন। অজয় মাতাল ভ্রূকুটি ক'রে বলে—আমরা মানে কারা, সেটা বুঝতে পেরেছেন তো মিষ্টার ডন জুয়ান? আমরা হলাম, মনুখুড়ি পুলকমাসি আর আমি। তাই বলছি সাবধান···দোহাই তোমার, তুমি আবার হুট ক'রে হাজির হয়ে কেতকীর মনে ভাংচি দিয়ে···মাইরি, তোর পায়ে পড়ছি দাদা, ওরকম চেষ্টাটি আর করিস নি।

অতীনের কানের দু'পাশ দিয়ে যেন একটা হিমাক্ত শিহর সিরসির ক'রে গড়িয়ে পড়ছে। কি ভয়ানক সংবাদ! খাটাসের ছায়া নয়, অতীনের জীবনের আশার পথে এইবার একটা বিষধরের ছায়া দেখা দিল। সেই কুৎসিতার শরীরের ভিতরটাও কি ভয়ানক খলতায় উর্বর হয়ে রয়েছে! অতীনের জীবনটাকে মুক্তি দিয়েও একটা অভিশাপের অটুট শিকলে বেঁধে রাখলো কেতকী। বোধ হয় এখন খোরপোষের মামলা করবার জন্য তৈরী হয়ে আর হেসে হেসে গড়িয়ে পড়ছে কেতকীর হিংস্র ইচ্ছাটা।

না, খোরপোষের মামলাটা অতীনের জীবনের আসল ভয় নয়। দাগটা ধরা পড়ে গেল, দাগী হয়ে গেল জীবনটা। এবং শেষ পর্যন্ত কাজরীর মনও কি এইরকম একটা দাগী জীবনকে ভয় পেয়ে ওর ঐ সুন্দর ভালবাসার মুখ ফিরিয়ে নেবে না?

অজয় মাতাল সিগারেট ধরাতে গিয়ে হাত পোড়ায় এবং হাতে ফুঁ দিয়েই অতীনের মুখের দিকে তাকিয়ে মুখ টিপে হাসে।—এই তো দিব্যি চিন্তা করছো যাদু।

অজয় মাতালকে ধিক্কার দেবার মত কোন সাহস আর বুকের ভিতর খুঁজে পায় না অতীন। অজয় মাতালই চেঁচিয়ে হেসে ওঠে।—ডোণ্ট ঘাবড়াও। কেতকী তোমার বিরুদ্ধে খোরপোষের

মামলা করবে না। শী উইল বি ফ্রী। মাত্র দু'তিন মাসের কলঙ্ককে মেডিক্যালি কিওর ক'রে দিতে ক'টাকার ওষুধ লাগে, আর কতক্ষণই বা সময় লাগে বাবা!

কখন এবং কতক্ষণ হলো চলে গিয়েছে অজয় মাতাল, তা'ও বুঝতে পারেনি অতীন। যখন রুমাল দিয়ে কপালের ঠাণ্ডা ঘাম মোছে অতীন, তখন পার্ক স্ট্রীটের দু'পাশে আলোর মেলা জেগে উঠেছে। সন্ধ্যা পার হয়ে গিয়েছে অনেকক্ষণ। মনে হয় অতীনের বুকের ভিতরটা অনেকক্ষণ ধরে ঢিপঢিপ করেছে, আর মাথার ভিতরে তীক্ষ্ণ একটা বস্তু বারবার বিঁধছে।

অজয় মাতালের সঙ্গে দেখা হয়ে ভালই হলো। সব কথার শেষে যে কথাগুলি বলে গেল অজয়, তাই তো সবচেয়ে বড় সান্ত্বনার কথা। অতীনের বুকজোড়া ভয়ের গুমোট ভেঙ্গে গিয়েছে।

বোকা নয় কেতকী। কেতকীও মুক্তি পেতে জানে। দেহের ভিতর থেকে একটা ঘৃণার পিণ্ডকে আবর্জনার মত দূরে ছুঁড়ে ফেলতে একটুও দ্বিধা করবে, এমন নরম মনের মেয়েই নয় কেতকী।

সব ভাল যার শেষ ভাল। মনে হয় অতীনের, এই নতুন ভয়ের বাধাটাও ভালয় ভালয় সরে যাবে। যাকে স্বামী বলেই স্বীকার করেনি, তারই একটা আক্রোশের স্মৃতিকে আদর ক'রে পুষে রাখতে পারে না কেতকী।

পথে চলতে চলতে দু'বার হঠাৎ থমকে দাঁড়ায় অতীন। তাই তো, এটা যে একটা অন্য রাস্তা, সোজা দক্ষিণ বালিগঞ্জের দিকে চলে গিয়েছে। কপালের ঠাণ্ডা ঘাম মুছে কপালটাকেই যেন সান্ত্বনা দেয় অতীন। কেতকীর মনটা বেশ কঠোর এবং ঘেন্নাগুলিও বেশ হিংস্র, তাই রক্ষা। তাই কোন সমস্যা দেখা দেবে না।

মেসবাড়ির ছোট ঘরটার ভিতরে ঢুকে আবার বিরক্ত হয় অতীন। সেই ছায়াটা আবার কোথা থেকে এসে অতীনের চোখের

সামনে ধুঁকছে। মনেও পড়ে একটা দৃশ্য। একটা কুৎসিত মেয়ে পাগলা শিয়ালের মত চোখ ক'রে ভেজা তোয়ালে দিয়ে তার সিঁথিটাকে ঘষছে।

কিন্তু ভালই তো, ওটাই যে কেতকীর ইচ্ছার ভয়ানক স্পষ্ট একটা প্রমাণ। বিশ্বাস করতে পারে অতীন, ঐরকমই হিংস্র চোখ নিয়ে কেতকী তার রক্তের নতুন রং ধুয়ে মুছে সাদা ক'রে দেবে।

না, ঐ ছায়াটা কিছু নয়, চোখের একটা ক্লান্তি মাত্র।

——না না না, কখনই না। একটা বোবা উদ্বেগের ভাষা ঠোঁট কাঁপিয়ে দিতেই অতীনের ঘুম ভেঙ্গে যায়; বিছানার উপর উঠে বসে অতীন।

তা'হলে কি এতক্ষণ ধরে স্বপ্নের মধ্যে ঐ বোবা কথাগুলিকে শুনছিল অতীন? হ্যাঁ। স্বপ্ন না হোক, স্বপ্নেরই মত অলীক অসার একটা ভাবনার ঘোর। ভাবনার ছবিটাও অদ্ভুত! কোন বাধা মানছে না কেতকী। কেতকীর হাতটাকে অতীন কত শক্ত ক'রে চেপে ধরেছে; তবুও ওষুধের গেলাস ছেড়ে দিচ্ছে না কেতকী —না না না, কখনই না। এই আবর্জনার বোঝা বইতে পারবো না।

আলো জ্বেলে বিছানার উপর বসে সিগারেট ধরাবার পর অতীনের জাগা চোখ দুটো যেন হঠাৎ শান্ত হয়ে মৃদু মৃদু হাসতে থাকে। মিথ্যে ভয় করেছে অজয় মাতাল। কেতকীর প্রতিজ্ঞা আজ অতীনের কোন আবেদনের ভাংচিতে ভাঙ্গবার নয়। এই স্বপ্নালু উদ্বেগের ছবিটা যে অতীনেরই মুক্তির ছবি। অতীনের জীবনের পথে কোন সমস্যার কাঁটা না রেখে সরে যাচ্ছে, একেবারে ফ্রী হয়ে যাচ্ছে কেতকী।

দক্ষিণ দরজার বাগানে, বড় বড় নিম আর অর্জুনের ডালে ও পাতার ঝোপে ছাতারে বুলবুলের দল লাফালাফি করে। বেলা

হয়েছে। স্কুলে যাবার জন্য তৈরী হয়েছে কেতকী। সুধাময়ী অলসভাবে কিছুক্ষণ ঘরের দাওয়ার উপর বসে থাকেন, তারপরেই উঠে গিয়ে কমলবাবুকে যেন একটা প্রতিবাদ নিয়ে আক্রমণ করেন। —তুমি, তুমি কোন্ আক্কেলে বড়দির কথায় রেগে গিয়ে দক্ষিণ দরজার বাগানটাকে বেচে দেবার কথা বললে?

কমলবাবু হাসেন—দেনা শোধ করতে হবে তো, নইলে শেষ দিনে মহাদেবের সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে না।

সুধাময়ী—পাঁচশো টাকার জন্য অত বড় বাগানটাকে বেচবার দরকার হয় না। গাছের জঙ্গলগুলিকে বেচে দিলেই তো হয়।

আশ্চর্য হয়ে সুধাময়ীর মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল ক'রে তাকিয়ে থাকেন কমল বিশ্বাস। সুধাময়ীর মনের ভিতর এ আবার কোন্ আশার উৎপাত দেখা দিল? সম্পত্তির জন্য সুধাময়ীর দরদ? কিসের জন্য? কা'র জন্য? এই বাড়ির অভিশপ্ত অদৃষ্টের যত ঘৃণা আর গ্লানির পঙ্কিলতার মধ্যে কি একটা মুক্তার ঝিনুক দেখতে পেয়েছে সুধা? তাই বোধ হয় ঐ রোগা আর রক্তশূন্য চেহারার বুকের ভিতরে একটা সাধ উথলে উঠেছে। এই অদ্ভুত ক্ষতবিক্ষত অদৃষ্টের কোলে নতুন একটা মানুষ আসবে। হাসবে কাঁদবে খেলা করবে। বড় হয়ে উঠবে। বেঁচে থাকবে। তারই সুখের জন্য আজ সম্পত্তি রক্ষা করবার স্বপ্ন দেখেছে সুধা। কি নির্লজ্জ স্বপ্ন!

—কি বলছো বল? আমার কথাটা কানে গেল কি? সুধাময়ীর প্রশ্নে চমকে উঠে উত্তর দিলেন কমলবাবু—বেশ, তাই হবে।

সারা দুপুরটা ঘর ও ঘরের বাইরে ঘুরঘুর ক'রে বেড়ালেন কমলবাবু। সুধাময়ীর স্বপ্নটাকে নির্লজ্জ বলে মনে করবার মত শক্তি আর পচ্ছেন না। ওটা স্বপ্ন নয়, নির্লজ্জও নয়; ওটা যে একটা সুমধুর উপহারের প্রতিশ্রুতি। কেতকীর ছেলে হবে, এই ভাঙ্গাবাড়ির ভাগ্যটাই যে মিষ্টি হয়ে যাবে। বুকব্যথার রোগে কাতর কমল বিশ্বাসের পাঁজরগুলিতে যেন ছোট ছোট দুটি কোমল

পায়ের মায়াময় মিষ্টি লাথির ছোঁয়া লুটোপুটি করছে। সাধ উথলে উঠছে কমল বিশ্বাসেরও বুকের ভিতরে। শেষ দিনে চোখ বুজবার আগে চোখের সামনে সাক্ষাৎ মহাদেবকে দেখতে পেলে কি এমন আনন্দ আর কতটুকু আনন্দ হবে কে জানে? কিন্তু কেতকীর ছেলেকে দেখতে পেলে? সে আনন্দটাকে যেন এরই মধ্যে চোখে দেখতে পাচ্ছেন কমল বিশ্বাস।

সারা বিকেলটাও ঠাকুরদালানের বারান্দার উপর বসে রইলেন কমল বিশ্বাস আর সুধাময়ী। ভাঙ্গা অদৃষ্টের এক বুড়ো আর এক বুড়ি যেন আবার এক চক্রান্তের আনন্দে বিভোর হয়ে ফিসফাস করে। দুটো আধ-মরা প্রাণের ভিতর থেকে সব মায়া নিংড়ে বের ক'রে একটা কচি প্রাণকে কোলে তুলে নেবার চক্রান্ত। দু'জনের মুখের ভাষাগুলিও যেন আধ-পাগলের প্রলাপের মত হয়ে যায়। গরু কিনতে হবে, প্রস্তাব করেন কমলবাবু। একটা ঝি রাখতে হবে, পরামর্শ দেন সুধাময়ী। কেতকীকে আর বেশি খাটতে দেওয়া উচিত নয়।

এই প্রসন্নতার মধ্যেও হঠাৎ আচমকা একটা ভয়-পেয়ে অন্য সুরে কথা বলেন কমল বিশ্বাস—ভাবতে কেমন যেন ভয়-ভয় করছে, আর একটু আশ্চর্যও লাগছে সুধা। জগতের যত নিয়ম আর অনিয়মের পরীক্ষা করবার জন্য ভগবান যেন এই বিশ্বাস বংশটাকে আর এই ভাঙ্গা-বাড়ির অদৃষ্টটাকে বেছে নিয়েছেন, কিন্তু···।

কমলবাবুর কথা ফুরোয়নি, ঠিক তখনই বাড়ি ফিরলো কেতকী, সঙ্গে একজন প্রৌঢ়া মহিলা।

প্রৌঢ়া মহিলার হাতে একটা ব্যাগ। হাই হিল জুতো পায়ে। ফুল-হাতা জ্যাকেট গায়ে। বিনা পাড়ের সাদা সিল্কের শাড়ি আঁটসাট ক'রে পরা।

প্রৌঢ়া মহিলা সোজা টান হয়ে হাঁটেন, মচমচ ক'রে বাজে তাঁর

জুতোর শব্দ। কমলবাবু ও সুধময়ীর চোখের সামনে এগিয়ে এসে পা-ঠুকে প্যারেডের হল্টের মত একটা ভঙ্গী ক'রে দাঁড়িয়ে পড়েন মহিলা। শরীরটাকে অস্থিরভাবে এপাশে-ওপাশে দোলাতে থাকেন। তারপরেই চেঁচিয়ে ওঠেন—আমার পরিচয় আমিই সংক্ষেপে সেরে দিচ্ছি। আমি ডাক্তার পুলকিতা দে, কেতকীর মামির খুড়তুতো বোন। ডু ইউ ফলো জেণ্টেলম্যান এণ্ড লেডি ?

ডাক্তার পুলকিতার মাথায় যদি ঐ অত বড় একটা খোঁপা না থাকতো, তবে বোধ হয় পৃথিবীর কারও বোন বলে সন্দেহ করবার মত অন্য কোন প্রমাণ ওর চেহারার মধ্যে পাওয়া যেত না। ডাক্তার পুলকিতার কাঁচা-পাকা জুলপি প্রায় চিবুক পর্যন্ত নেমে এসেছে। কর্কশ রোমে ছাওয়া একটা ক্ষীণ গোঁপের রেখাও দেখা যায়। গলার স্বর যেমন মোটা তেমনই খসখসে। ডাক্তার পুলকিতার চোখে কাজলের টান আঁকা আছে, আর ঠোঁটে লাল রং-এর প্রলেপ।

ডাক্তার পুলকিতা বলে—রামকানাইবাবুর একটা মিসফরচুন এই যে, ওঁকে একটা সুপরামর্শ দেবার মত ফেয়ার সেক্স ওঁর বাড়িতে নেই। কাজেই শেষ পর্যন্ত আমাকেই ডাকতে বাধ্য হয়েছেন।

একটা হাঁটুকে খুব জোরে বার পাঁচেক দুলিয়ে ডাক্তার পুলকিতা বলেন—থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ। মনুদিকে দিয়ে যথাসময়ে রামকানাইবাবুকে সমস্যার খবরটা আপনারা জানিয়েছেন। দেরি করলে ভুল হতো।

—মনুদি কে ? প্রশ্ন করেন কমলবাবু।

ডাক্তার পুলকিতা বলেন—মনুদি, যিনি আপনাদের রিলেশন, এবং আমাদেরও।

কমলবাবু—কিন্তু রামকানাইবাবুকে কোন খবর জানাবার জন্য আমরা মনুদিকে বলিনি।

ডাক্তার পুলকিতা—মোটকথা মন্নুদিকে জানিয়েছেন। তাই রামকানাইবাবুও জানতে পেরেছেন।

হাঁটু দোলানো থামিয়ে কেতকীর দিকে তাকিয়ে কাজল পরা চোখ বড় বড় ক'রে ডাক্তার পুলকিতা যেন একটা অর্ডার হাঁকেন। —কুইক কেতকী, কুইক! সময় নষ্ট ক'রে লাভ নেই। যাও, তৈরী হয়ে চলে এস।

ঘরের দিকে চলে যায় কেতকী। কমলবাবু প্রশ্ন করেন—কোথায় যাবে কেতকী?

ডাক্তার পুলকিতা—আমার সঙ্গে আমার ক্লিনিকে যাবে; আমিই আবার ফিরিয়ে দিয়ে যাব। কোন চিন্তা করবেন না।

সুধাময়ীর গলা ভেদ ক'রে একটা করুণ আর্তনাদ ফুটে ওঠে—কেতকী যাবে না।

গালের মাংস কাঁপিয়ে প্রকাণ্ড একটা হাসি টেনে ডাক্তার পুলকিতা বলেন—নো নো নো, আপনার ভুল ধারণা। কোন চিন্তা করবেন না, কেতকী রাজি হয়েছে। রামকানাইবাবুর কাছ থেকে সমস্যাটা জানতে পেরে, তখুনি, সেই দুপুরেই সোজা ওর স্কুলে গিয়ে ওকে পাকড়াও করেছি। বেশি বোঝাতে হয়নি, মেয়েটার ভেরি স্ট্রং কমনসেন্স।

ক্ষীণ স্বরে আর্তনাদ করেন কমলবাবু—কি বললেন? কেতকী রাজি হয়েছে?

ডাক্তার পুলকিতা—ইয়েস স্যার। রাজি না হবার তো কোন কারণ নেই। এরকম ফুলিশ মাদারহুডের কেন অর্থ হয় না।

সুধাময়ী—কি বিশ্রী কথা বলছেন আপনি?

ডাক্তার পুলকিতা হাসেন—স্বামী ছাড়বে, অথচ সেই স্বামীরই সঙ্গে সম্পর্কের অবাঞ্ছিত পরিণাম আজীবন বোকার মত বইবে, এ তো হতে পারে না দিদি। শী মাস্ট বি ফ্রী।

দেরি করেনি কেতকী। ঠাকুরদালানের বারান্দায় স্তব্ধ হয়ে বসে আর ফ্যালফ্যাল ক'রে তাকিয়ে দেখতে থাকে ভাঙ্গা-বাড়ির এক বুড়ো আর বুড়ি, কেতকী আসছে ; যদিও কেতকীর মুখটা বেশ গম্ভীর, কিন্তু কত স্বচ্ছন্দে ও কত সহজে তরতর ক'রে হেঁটে চলে আসছে।

ডাক্তার পুলকিতা বলেন—ব্যবস্থার কথাটা আপনাদের জানাবার ভার আমারই উপর চাপিয়েছে কেতকী। তাই আসতে হলো, নইলে স্কুল থেকেই কেতকীকে নিয়ে সোজা আমার ক্লিনিকে চলে যেতাম।

কেতকীর ইচ্ছা? বুড়ো আর বুড়ির দুটো রোগা গলা কেউ যেন শক্ত ক'রে টিপে ধরে বোবা ক'রে দিয়েছে। একটা আর্তনাদও করবার সাধ্য নেই। আপত্তি করবার কোন অধিকার নেই। অভিশাপ দেবার কোন যুক্তি নেই। বুড়ো আর বুড়ির জীবনের শেষ সাধের স্বপ্নকে রক্তাক্ত ক'রে কোন্ এক হাসপাতালের ডাস্টবিনে আবর্জনার মত ফেলে দেবার জন্য একটা উল্লাস শব্দ ক'রে চলে যাচ্ছে।

হ্যাঁ, দেখতে থাকেন কমলবাবু আর সুধাময়ী, ডাক্তার পুলকিতার হাত ধরে চলে যাচ্ছে কেতকী। শুনতে থাকেন, ডাক্তার পুলকিতার জুতোর শব্দ মচমচ ক'রে বেজে বেজে চলে যাচ্ছে। কিন্তু নড়তে পারেন না কেউ, এক জোড়া পরম অসহায়তা শুধু স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে।

চলে গিয়েছে কেতকী, ডাক্তার পুলকিতার জুতোর মচমচ শব্দও আর শোনা যায় না, ছটফট করেন, কাঁপতে থাকেন কমল বিশ্বাস। সুধাময়ী মেঝের উপর গড়িয়ে পড়েন। রোগা-রোগা দুটো মূর্তি যেন দুঃসহ শাস্তির ভার সহ্য করতে গিয়ে গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে। ছি, ছি ; কোথায় গেল কেতকী।

কলকাতার চৌরঙ্গী থেকে বেশি দূরে নয় ডাক্তার পুলকিতার

ক্লিনিক। ডাক্তার পুলকিতা আদরের সুরে প্রশ্ন করেন—রেডি কেতকী ?

সোফার উপর অনেকক্ষণ নিঝুম হয়ে বসেছিল কেতকী। প্রশ্ন শুনেই ছটফট ক'রে উঠে দাঁড়ায়। থরথর ক'রে গলার স্বর কাঁপিয়ে উত্তর দেয়—না পুলকমাসি।

—কেন, এত ভাবছো কি কেতকী ?

—ভাবছি, না ভেবে পারছি না, বড় অন্যায় হচ্ছে পুলকমাসি।

—তার মানে ?

—আমাকে ছেড়ে দিন, আমি চলে যাই।

—কি আশ্চর্য ! চেঁচিয়ে ওঠেন ডাক্তার পুলকিতা।

—আমার একটুও আশ্চর্য মনে হচ্ছে না। আমি যাই।

—ভেবে দেখ কেতকী, বোকামি ক'রো না।

—ভেবে দেখেছি পুলকমাসি।

ডাক্তার পুলকিতার হাত ঠেলে সরিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ায় কেতকী। জলে ভরে গিয়ে কেতকীর চোখ দুটো টলটল করতে থাকে।

—ও কি ? বিরক্ত হয়ে ধমক দেন ডাক্তার পুলকিতা।

কেতকীর প্রাণটাও যেন এক বিচিত্র নির্লজ্জতার আবেগে চেঁচিয়ে ওঠে। আমার জিনিস আমি হারাতে পারবো না।

হেসে ফেলেন পুলকিতা—তোমার জিনিষ ? ছিঃ, এরকম বাজে কথা কোন পাগল মেয়েও বলে না।

কেতকী—আমি পাগলের চেয়ে বেশি পাগল।

পুলকিতা ঠাট্টা করেন—ধর্মভীরুতা দেখাচ্ছো কেতকী ?

কেতকী—ধর্ম কাকে বলে জানি না, আর ভীরুতাও কাকে বলে জানি না। আমি শুধু জানি···।

—কি জান ?

পুলকমাসির এই রূঢ় প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে মুখ ফিরিয়ে নেয়

দেরি করেনি কেতকী। ঠাকুরদালানের বারান্দায় স্তব্ধ হয়ে বসে আর ফ্যালফ্যাল ক'রে তাকিয়ে দেখতে থাকে ভাঙ্গা-বাড়ির এক বুড়ো আর বুড়ি, কেতকী আসছে; যদিও কেতকীর মুখটা বেশ গম্ভীর, কিন্তু কত স্বচ্ছন্দে ও কত সহজে তরতর ক'রে হেঁটে চলে আসছে।

ডাক্তার পুলকিতা বলেন—ব্যবস্থার কথাটা আপনাদের জানাবার ভার আমারই উপর চাপিয়েছে কেতকী। তাই আসতে হলো, নইলে স্কুল থেকেই কেতকীকে নিয়ে সোজা আমার ক্লিনিকে চলে যেতাম।

কেতকীর ইচ্ছা? বুড়ো আর বুড়ির দুটো রোগা গলা কেউ যেন শক্ত ক'রে টিপে ধরে বোবা ক'রে দিয়েছে। একটা আর্তনাদও করবার সাধ্য নেই। আপত্তি করবার কোন অধিকার নেই। অভিশাপ দেবার কোন যুক্তি নেই। বুড়ো আর বুড়ির জীবনের শেষ সাধের স্বপ্নকে রক্তাক্ত ক'রে কোন্ এক হাসপাতালের ডাস্টবিনে আবর্জনার মত ফেলে দেবার জন্য একটা উল্লাস শব্দ ক'রে চলে যাচ্ছে।

হ্যাঁ, দেখতে থাকেন কমলবাবু আর সুধাময়ী, ডাক্তার পুলকিতার হাত ধরে চলে যাচ্ছে কেতকী। শুনতে থাকেন, ডাক্তার পুলকিতার জুতোর শব্দ মচমচ ক'রে বেজে বেজে চলে যাচ্ছে। কিন্তু নড়তে পারেন না কেউ, এক জোড়া পরম অসহায়তা শুধু স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে।

চলে গিয়েছে কেতকী, ডাক্তার পুলকিতার জুতোর মচমচ শব্দও আর শোনা যায় না, ছটফট করেন, কাঁপতে থাকেন কমল বিশ্বাস। সুধাময়ী মেঝের উপর গড়িয়ে পড়েন। রোগা-রোগা দুটো মূর্তি যেন দুঃসহ শাস্তির ভার সহ্য করতে গিয়ে গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে। ছি, ছি; কোথায় গেল কেতকী।

কলকাতার চৌরঙ্গী থেকে বেশি দূরে নয় ডাক্তার পুলকিতার

ক্লিনিক। ডাক্তার পুলকিতা আদরের সুরে প্রশ্ন করেন—রেডি কেতকী ?

সোফার উপর অনেকক্ষণ নিঝুম হয়ে বসেছিল কেতকী। প্রশ্ন শুনেই ছটফট ক'রে উঠে দাঁড়ায়। থরথর ক'রে গলার স্বর কাঁপিয়ে উত্তর দেয়—না পুলকমাসি।

—কেন, এত ভাবছো কি কেতকী ?

—ভাবছি, না ভেবে পারছি না, বড় অন্যায় হচ্ছে পুলকমাসি।

—তার মানে ?

—আমাকে ছেড়ে দিন, আমি চলে যাই।

—কি আশ্চর্য ! চেঁচিয়ে ওঠেন ডাক্তার পুলকিতা।

—আমার একটুও আশ্চর্য মনে হচ্ছে না। আমি যাই।

—ভেবে দেখ কেতকী, বোকামি ক'রো না।

—ভেবে দেখেছি পুলকমাসি।

ডাক্তার পুলকিতার হাত ঠেলে সরিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ায় কেতকী। জলে ভরে গিয়ে কেতকীর চোখ দুটো টলটল করতে থাকে।

—ও কি ? বিরক্ত হয়ে ধমক দেন ডাক্তার পুলকিতা।

কেতকীর প্রাণটাও যেন এক বিচিত্র নির্লজ্জতার আবেগে চেঁচিয়ে ওঠে। আমার জিনিস আমি হারাতে পারবো না।

হেসে ফেলেন পুলকিতা—তোমার জিনিষ ? ছিঃ, এরকম বাজে কথা কোন পাগল মেয়েও বলে না।

কেতকী—আমি পাগলের চেয়ে বেশি পাগল।

পুলকিতা ঠাট্টা করেন—ধর্মভীরুতা দেখাচ্ছো কেতকী ?

কেতকী—ধর্ম কাকে বলে জানি না, আর ভীরুতাও কাকে বলে জানি না। আমি শুধু জানি···।

—কি জান ?

পুলকমাসির এই রূঢ় প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে মুখ ফিরিয়ে নেয়

কেতকী। বোধ হয় উত্তর দেবার মত ভাষা খুঁজে পায় না। কেতকীর রক্তের যদি ভাষা থাকতো, নিঃশ্বাসের যদি সঙ্গীত থাকতো, মেয়েলি বুকের এই কোমলতার যদি স্তব থাকতো, তবে পুলকমাসিকে বুঝিয়ে দিতে পারা যেত, কেন মুক্তি পেতে চাইছে না মন।

পুলকিতা তাঁর খসখসে গলার স্বর আরও কর্কশ ক'রে কথা বলেন—যে স্বামীকে ভালবাসতে পারলে না, আদালতে দরখাস্ত ক'রে যাকে সরালে, তারই সঙ্গে সম্পর্কের একটা ইয়েকে··· ।

কেতকী বাধা দিয়ে বলে—স্বামীকে ছাড়িনি। স্বামী হতে জানে না, এরকম একটা লোককে ছেড়েছি।

পুলকিতা—না হয় তাই হলো, কিন্তু স্বামী পেতে কি সাধ হয় না ?

কেতকী—না।

পুলকিতা—কেন ?

কেতকী—স্বামী কা'কে বলে জানি না, বুঝতে পারি না।

পুলকিতা হাসেন —আমি বলতে পারি।

কেতকী হাসে—আপনি ?

পুলকিতা ভ্রূকুটি করেন—কেন, আমি চিরকুমারী বলে কি নারী নই ? তুমি কি আমাকে একটা পুরুষ ঠাওরালে কেতকী ?

কেতকী—আপনি ভুল বুঝলেন, সেকথা আমি বলছি না।

পুলকিতা—গুরুজনের কথা যদি হেসে না উড়িয়ে দাও, তবে বলিতে পারি।

কেতকী—বলুন।

পুলকিতা—স্ত্রীর মুখের দিকে মুখ তুলে তাকাতে ভয়···আই মীন লজ্জা করবে, সব সময় স্ত্রীকে শ্রদ্ধা করবে, স্ত্রী না বললে হ্যাঁ বলবার সাহস···আই মীন অভদ্রতা করবে না, সেই পুরুষকেই স্বামী বলে মনে করা যায়।

হেসে ফেলে কেতকী, কিন্তু ডাক্তার পুলকিতা কেতকীর সেই

হাসিকে এক বিন্দুও গ্রাহ্য না ক'রে অদ্ভুত উৎসাহিত স্ব'রে বলতে থাকেন—তুমিও ইচ্ছে করলে এরকম মনের মত স্বামী পেতে পার কেতকী।

কেতকী আরও জোরে হেসে ফেলে—ইচ্ছে করলেই বোধ হয় পাওয়া যায় না পুলকমাসি।

পুলকিতা—ইচ্ছে করলে তবে তো পাওয়া যাবে?

কেতকী হাসে—না হয় ইচ্ছে হলো, তারপর?

পুলকিতা—তারপর অজয়কে বিয়ে কর।

কেতকী—কা'কে?

পুলকিতা—মনুদির ভাসুরপো অজয়কে। তেমার লাইফের সব ট্র্যাজেডির কথা সে শুনেছে, তবু তোমাকে বিয়ে করতে রাজি আছে। এমন বেশি কিছু টাকা দাবি করেনি অজয়। যা চেয়েছে অজয়, রামকানাইবাবু তারও কিছু বেশি দিতে রাজি আছেন।

হঠাৎ গম্ভীর হয়ে, এবং সব কৌতুকের হাসি যেন এক নিঃশ্বাসে গিলে ফেলে পুলকিতার প্রস্তাবের রহস্যটাকে বুঝতে চেষ্টা করে কেতকী। পুলকিতা নিজেই এই রহস্যকে আরও পরিষ্কার ক'রে দেন—সেই জন্যেই বলছি, একেবারে ফ্রী হয়ে যাও কেতকী, তা'হলে অজয়ের সঙ্গে তোমার বিয়ে হয়ে যেতে কোন বাধা থাকবে না।

পুলকিতার রোমশ হাতের সমাদরের স্পর্শ হঠাৎ একটা কঠোর ঠেলায় সরিয়ে দিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে যায় কেতকী।—চললাম পুলকমাসি। একাই যেতে পারবো, আপনাকে আর সঙ্গে আসতে হবে না।

দরজার কাছে এসে পর্দা সরিয়ে একবার থমকে দাঁড়ায় কেতকী। তার পরেই ভয়-পাওয়া পাগলের মত হুড়দাড় ক'রে ছুটে চলে যায়।

অতীনের সুন্দর চেহারা আরও সুন্দর হয়েছে। সেই সঙ্গে চাকরির মাইনেটা আর একটু সুন্দর হয়ে উঠলে ভাল ছিল। কিন্তু হয়নি। মালিকের অনুগ্রহে মাইনেটা বেড়েও মাত্র দু'শো টাকা হয়েছে।

এই যে মাইনেটা বেড়ে দু'শো টাকা হয়েছে, এটাও কাজরীর চেষ্টার ফল। একটি মাত্র যে খরিদ্দার পার্টিকে একটা গাড়ি গছাতে পেরেছে অতীন, সে পার্টি হ'লো কাজরীদের পরিবারের উপকারী বন্ধু সেই অসিত দত্ত। কাজরী বেশ জোর তাগিদ দিয়ে চেপে ধরেছিল বলেই অসিত দত্ত খুশি হয়ে পার্ক ষ্ট্রীটের অটোমোবিল শো-রুমে এসে সেলসম্যান অতীন বিশ্বাসের মারফৎ একটি গাড়ি কিনে নিয়ে চলে গিয়েছে। তাই মালিক খুশি হয়ে অতীনের মাইনে বাড়িয়ে দিয়েছেন। কাজরী যদি এই চেষ্টাটা না করতো, এবং অসিত দত্তের মত একটা খরিদ্দার পার্টিকে মালিকের সামনে উপস্থিত করবার সুযোগ না পেত অতীন, তবে চাকরিটাই থাকতো কিনা সন্দেহ। আশ্চর্য, কাজরী চৌধুরী নামে এই নারীর মন এবং সেই মনের ভালবাসা। অতীনের ভালর জন্য সব করতে পারে কাজরী।

কোন ঘিঞ্জি নেই, চারদিকটা বেশ খোলা-মেলা, এদিকে ক্যামাক ষ্ট্রীট এবং ওদিকে ল্যান্সডাউনের শেষ, যে জায়গাটাকে চোখে দেখলেও মন জুড়িয়ে যায়, সেই জায়গাতেই কাজরীর নামে একটা নতুন বাড়ির একটা ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়েছে অতীন। ভাড়া দেড়শো টাকা। ভাড়ার টাকার জন্য অতীনের দুশ্চিন্তা শান্ত ক'রে দিয়ে কাজরীই বলেছে—ভাববার কি আছে? ভাড়ার টাকাটা আমিই দেব। দেড় শো টাকা ভাড়া দেখে ভয় পাবার কিছু নেই।

মনে পড়ে অতীনের, কয়লা ঘাটের সেই জাহাজ অফিসের সেকেণ্ড ক্লার্ক কাজরী চৌধুরীর মাইনে আরও এক'শো টাকা বেড়েছে। কাজরীর জীবনের এই মাইনে বৃদ্ধির আনন্দকে এই

তো ক'দিন আগে কাজরী নিজেই আরও মধুময় ক'রে দিয়েছে। সেদিন মার্কেটে গিয়ে নিজে পছন্দ ক'রে একটা সোনার কাজ-করা আইভরির সিগারেট কেস কিনে নিয়ে এসে অতীনকে উপহার দিয়েছে কাজরী। বনের লতাও তার প্রিয় কোন শাল-পিয়ালকে এমন ক'রে এত একরোখা আগ্রহে জড়িয়ে ধরে থাকে না। কাজরী যেন তার জীবনের পরম-পাওয়া একটা ঐশ্বর্যকে দু'হাত দিয়ে বুকের কাছে আঁকড়ে ধরে রাখছে। মানুষের জীবনে সৌভাগ্য কত সুন্দর হয়ে দেখা দিতে পারে, সেটা আজ নিজের জীবনের দিকে আর কাজরী চৌধুরীর মুখের দিকে তাকিয়ে মনে-প্রাণে বুঝতে পারে অতীন। কাজরীও যে অতীনের জীবনের এক-পরম-পাওয়া উপহার।

আজ নয়, মাত্র এই একটি দিন পার হলেই কাল চন্দননগরের সন্ধ্যায় যখন আলো জ্বলে উঠবে, তখন পৃথিবীর চোখের সামনে কাজরী চৌধুরীর হাত ধরবে অতীন। কাজরীর বাবা সাধনবাবু নিজেই এসেছিলেন। তাঁর মেয়ের নতুন জীবনের বাসা হবে যে ফ্ল্যাট, সেই ফ্ল্যাটের সুশ্রী চেহারাটা দেখে এবং বেশ একটু খুশি হয়ে এই তো কিছুক্ষণ আগে চলে গিয়েছেন। জানিয়ে গিয়েছেন, তাহ'লে কালই বিয়ের দিন ঠিক করা হ'লো অতীন। আশা করি তা'তে তোমার কোন অসুবিধা হবে না।

—না, কোন অসুবিধা হবে না। তিন দিনের ছুটি নিয়েছে অতীন।

কিছুক্ষণ আগে একটা চিঠি এসেছে। টেবিলের উপর চিঠিটা পড়েছিল। কে জানে কার চিঠি! সাধনবাবু চলে যেতেই চিঠিটার দিকে তাকায় অতীন। কোন সন্দেহ নয়, বিরক্তিও নয়, নিজের মনের আবেশের সঙ্গে যেন নীরবে কথা বলতে বলতে আনমনার মত হাত বাড়িয়ে চিঠিটা তুলে নেয় অতীন।

চিঠি পড়ে অতীন। কিন্তু চিঠিটার মধ্যে বোধ হয় কালো

ধোঁয়ার একটা ফোয়ারা আছে। পড়তে পড়তে অতীন বিশ্বাসের সুন্দর মুখের পর যেন কালির প্রলেপ ছড়িয়ে পড়তে থাকে। মনে হয়, আগামী কালের সন্ধ্যায় চন্দননগরের সাধনবাবুর বাড়িতে যে আলো হেসে উঠবে বলে তৈরী হয়েছে, সেই আলো নিভিয়ে দেবার চক্রান্ত নিয়ে কালি-ঝুলি ভরা একটা কুৎসিত ঝড়ের ফুৎকারও আড়ালে তৈরী হয়ে উঠেছে। চক্রান্ত এমন ভয়ানক হতে পারে, এর আগে কখনও কল্পনা করতে পারেনি অতীন। কাজরী চৌধুরীর মত নারীর দুঃসাহসময় ভালবাসাকেও ভয় পাইয়ে দমিয়ে দিতে পারে এই চক্রান্ত।

এই ভয়ানক বিষাদের আবেশ থেকে মনটাকে জোর ক'রে ছাড়িয়ে নিয়ে নতুন আতঙ্কটাকেই পাল্টা প্রশ্ন করে অতীন। কেন? ভয় পাবে কেন কাজরী? কাজরীর ভালবাসার দুঃসাহস এই চক্রান্তকেও অনায়াসে হেসে হেসে তুচ্ছ করতে আর একেবারে ব্যর্থ করে দিতে পারে। এরকম হতাশ হবার কোন অর্থ হয় না।

চিঠিটাকে পকেটে ফেলে সেই মুহূর্তে বের হয়ে যায় অতীন, এবং চন্দননগরের ভরা দুপুরের রোদের মধ্যে পথের উপর এসে দাঁড়াতে দু'ঘণ্টারও বেশি সময় লাগে না।

চিঠিটা অতীনের সিল্কের পাঞ্জাবির বুক-পকেটের ভিতরে খসখস করে। খসখস করে একটা দুঃসহ অস্বস্তি। শুনে চমকে উঠবে কি কাজরী? কেঁদে ফেলবে? কিংবা বজ্রাহত মানুষের মত স্তব্ধ হয়ে যাবে? অতীন বিশ্বাসের সুন্দর পৌরুষের একটা চুরির প্রমাণ পৃথিবীর চোখের সামনে যে একেবারে জীবন্ত ক'রে ধরে রেখেছে কেতকী! সে খবর শুনে সত্যিই কি মুখ ফিরিয়ে নেবে কাজরী?

চিঠি লিখেছেন মনুমাসি—অজয় ভাসুরপোর কাছ থেকে তোর ঠিকানা জানতে পারলুম। কেমন আছিস বাবা? কত মাইনে পাচ্ছিস?

শুধু এই পর্যন্ত লিখে যদি ক্ষান্ত হতেন মনুমাসি, তবে তো

ভালই ছিল। অতীন বিশ্বাসের জীবনের স্বপ্ন এত আতঙ্কিত হয়ে উঠতো না।

মনুমাসি আরও লিখেছেন—একটু সময় ক'রে পঁয়তাল্লিশ নম্বর হালদার রোডে একবার আসতে পারবি কি? আমারই এক জায়ের বোনের বাড়ি। বোনঝি অমিয়া বি-এ পাশ করেছে।

মনুমাসির এই বক্তব্যটাও ভয় পাইয়ে দেবার মত কোন বস্তু নয়। চিঠির শেষ দিকের কথাগুলিতে একটা আক্ষেপ করেছেন মনুমাসি—এ কি-রকম সমস্যা হলো অতীন? যে বউ তোকে ঘেন্না ক'রে আর আদালতে দরখাস্ত ক'রে সম্পর্ক ছাড়লো, সে কেন একটা বাচ্চা কোলে নিয়ে তোমাদেরই বাড়িতে এখনও পড়ে থাকে? তোদের সম্পাত্তির কি গতি হবে? পাগল কমল বিশ্বাস কি শেষ পর্যন্ত এরকম একটা বে-আইনী নাতিকে অত বড় সম্পাত্তিটা লিখে দিয়ে যাবে?

বে-আইনি? মনুমাসির মন্তব্যটা পড়তেই যেন বুকের ভিতর একটা ধাক্কা খেয়েছিল অতীন। ভুল সন্দেহ করেছেন, বৃথা আক্ষেপ করেছেন মনুমাসি, এবং তাঁর ভাবাটাও বড় বেশি কুৎসিত।

যাক, কিন্তু অজয় মাতাল তা'হলে একটা মিথ্যা কথার সান্ত্বনা দিয়েছিল সেদিন। সিঁদুর মুছে দিয়ে সিঁথি সাদা ক'রে দেয়নি কেতকী। অতীন বিশ্বাসের সুন্দর চেহারার একটা ক্ষণিকের ভুল, একটা হঠাৎ লোভের মত্ততাকে সেদিন চুপ ক'রে সহ্য করলেও, কেতকীর জীবনের আক্রোশটা চুপ ক'রে থাকেনি। প্রতিশোধ নিয়েছে কেতকী। কাজরী চৌধুরীর মত সুন্দরতার নারীকে ভালবাসে যে মানুষ, সে'ও যে কেতকীর মত কুরূপার দেহের কাছে পৌরুষ উৎসর্গ ক'রে দিতে পারে, তারই প্রমাণ কোলে নিয়ে বসে আছে কেতকী। আজ না হোক কাল, না হয় এক মাস কিংবা এক বছর পরে কাজরীও শুনতে পাবে। তখন কাজরীর কাছে মাথা হেঁট করার চেয়ে এখনই মাথা হেঁট ক'রে ফেলাই ভাল। ঘৃণা যদি

করতে চায় কাজরী, তবে এখনই করুক। কাজরীর কাছে কোন ভুল গোপন ক'রে লাভ নেই।

মানুষের কোন শুভ আশার পথ ফুলছড়ানো পথ নয়। সে পথে কাঁটা থাকে এবং কাঁটার মুখে বিষও থাকে। কিন্তু ভয় করলে এগিয়ে যেতে পারা যায় না। ভয় ক'রে লাভ নেই।

বুঝতে পারেনি অতীন, কখন এতটা পথ হেঁটে পার হয়ে একেবারে কাজরীদের বাড়ির বারান্দার কাছে সে এগিয়ে এসেছে। চোখ তুলে তাকাতেই দেখতে পায় অতীন, সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে হাসছে কাজরী। —তুমি যে আজ এই দুপুরে হঠাৎ এসে দেখা দেবে, আমি ভাবতে পারিনি অতীন।

অতীনের মুখে শুকনো হাসি—আমিও ভাবতে পারিনি যে হঠাৎ আজ এখানে তোমার কাছে আসতে হবে। কিন্তু না এসে পারলাম না, কারণ···।

কাজরীর পাশে পাশে হেঁটে ঘরের ভিতরে ঢুকেই কাজরীর হাতে মনুমাসির চিঠিটা তুলে দিয়ে চেয়ারের উপর বসে পড়ে অতীন। অতীনের সুন্দর চেহারাটা হঠাৎ অলস ও অবশ হয়ে যায়।

কাজরী চৌধুরী সেই চেয়ারের হাতলের উপর আলগা হয়ে বসে, এবং অতীনের কাঁধের উপর একটি হাতের ভর এলিয়ে দিয়ে চিঠি পড়তে থাকে। পড়তে পড়তে গম্ভীর হয়ে যায় কাজরীর মুখ, এবং গম্ভীর হতে হতে সেই মুখই আবার ঝিক ক'রে হেসে ওঠে। চিঠিটাকে একটা লঘু অবহেলার আবেগে দুমড়ে মুচড়ে অতীনেরই সিল্কের পাঞ্জাবির বুক-পকেটের ভিতরে গুঁজে দেয় কাজরী। —এ চিঠি আমাকে দেখিয়ে তোমার কি লাভ হলো অতীন?

অতীন—লাভ এই যে, তোমার কাছে আমার কোন ইতিহাস গোপন রইল না।

একটু আশ্চর্য হয় কাজরী—তোমার ইতিহাস মানে? কেতকী

যদি লুকিয়ে লুকিয়ে কারও সঙ্গে একটা কীর্তি ক'রে একটা ছেলের বে-আইনি জন্মের জন্য দায়ী হয়, তবে···তাতে···।

ভীরু চোখ দুটোকে কাঁপিয়ে ক্ষীণ আর্তনাদের মত স্বরে হঠাৎ আপত্তি ক'রে ওঠে অতীন—না না না, বে-আইনি নয়; তুমি ভুল বুঝেছ কাজরী।

চমকে ওঠে কাজরীর চোখ—তার মানে···সত্যি তোমার সঙ্গে কেতকীর সম্পর্ক হয়েছিল ?

অতীন—হ্যাঁ।

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে কি-যেন ভাবে কাজরী, অকারণে হাত দু'টোকে দু'বার ছটফটিয়ে দু'বার খোঁপাটাকে ভাঙ্গে এবং দু'বার নতুন ক'রে বাঁধে। অপলক চোখের গভীর দৃষ্টি দিয়ে অতীনের মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে। তারপরেই কাজরীর সেই ক্ষণচিন্তিত মুখের গম্ভীরতা গনগনে আগুনের আভা ছড়িয়ে হঠাৎ হেসে ওঠে। কাজরী বলে—এসব ইতিহাস নিয়ে আমার মাথা ঘামাবার কোন দরকার হয় না অতীন।

অতীনের দু'চোখ ছাপিয়ে এবং বোধ হয় বুক ছাপিয়েও সেই বিস্ময় নতুন ক'রে জেগে ওঠে। এ কি বলছে কাজরী ? নির্মেঘ আকাশের মত উদার, এমন একটা মন পাওয়া কি কোন মেয়ের পক্ষে সত্যই সম্ভব ? কাজরী যে সেই অসম্ভবকে একেবারে একটা সহজ বাস্তবের মত সত্য ক'রে দিয়েছে !

নিজের মনের আবেগে বলতে থাকে কাজরী—কেতকীর ইচ্ছাকে তুমি তুচ্ছ করতে পারনি, সেটা তোমার ভুল নয়, দুর্বলতাও নয় অতীন। সেটা তোমার এই সুন্দর চেহারার দয়া।

কাজরীর মুখের দিকে তাকায় অতীন। বিহ্বল হয়ে গিয়েছে কাজরীর টানা-টানা কালো চোখ, যেন থমথম করছে কাজরীর বুকের ভিতর একটা নিঃশ্বাসের ঝড়; বিচিত্র এক বেদনার রসে ভিজে গিয়ে চকচক করছে কাজরীর ঠোঁট দুটি। অতীনের ঐ

সুন্দর বলিষ্ঠতার অফুরান দয়ার ঐশ্বর্যকে যেন অভিনন্দিত করছে কাজরী।

কিন্তু অতীনের জীবনের সবচেয়ে বড় গর্বটা আজ কাজরী চৌধুরীর এত বড় অভিনন্দনেও যেন খুশি হয়ে উঠতে পারছে না। কেতকীর ইচ্ছা? এর চেয়ে বড় মিথ্যা যে আর কিছু হতে পারে না। কি ভয়ানক ভুল ধারণা করেছে কাজরী!

কাজরীর ধারণার এই ভুল এখনি ভেঙ্গে দিতে পারা যায়। কিন্তু ভেঙ্গে দেওয়া উচিত হবে কি? কুণ্ঠাভীরু একটা বাধা এসে অতীনের মুখের ভাষা চেপে ধরছে। কেতকী নামে এক কুৎসিতার সেই ভয়ানক অনিচ্ছার গৌরবটাই যেন ঠাট্টা ক'রে অতীনের পাঁজরের আড়ালে কাঁটার খোঁচার মত খচখচ ক'রে বাজছে যদি সাহস থাকে, তবে তোমার ভালবাসার নারীর কাছে সেই সত্য কথাটা বলে দাও দেখি? ফাঁকি রাখা তো উচিত নয়।

বলবার জন্য প্রস্তুত ছিল না অতীন, কিন্তু সত্য কথাটা চেঁচিয়ে বলে দেবার জন্য অতীনের মনের একটা মাতাল দুঃসাহস বোধ হয় সেই মুহূর্তে পাগল হয়ে যায়। কেতকীর এই মিথ্যা অপবাদটাই যেন দুঃসহ জ্বালায় জ্বলে উঠেছে। চেঁচিয়ে ওঠে অতীন—না কাজরী কেতকীর কোন ইচ্ছা ছিল না।

—সে কি? কাজরীও চমকে ওঠে।

হ্যাঁ, নিতান্ত আমারই ইচ্ছার ভুলে···হঠাৎ রাগের মাথায়··· পাগল হয়ে···কোন আপত্তি গ্রাহ্য না ক'রে ··।

মাথা হেঁট করে অতীন। যেন কারও কাছে ক্ষমা চাইছে অতীন।

অনেকক্ষণ কথা বলে না কাজরী, এবং অতীনও অনেকক্ষণ চোখ তুলে তাকায় না। শুধু কল্পনা করতে পারে অতীন, গোপন ইতিহাসের শেষ কথাটা শোনবার পর কাজরী চৌধুরীর মুখের হাসিতে সেই অভিনন্দনের রঙীন আভা এতক্ষণে দুঃসহ ধোঁয়ার

জ্বালায় একেবারে কালো হয়ে গিয়েছে। এই মুহূর্তে কাজরী চৌধুরী তার আহত ভালবাসার শেষ আর্তনাদ শুনিয়ে দিয়ে অতীনের ছায়ার স্পর্শ থেকে চিরকালের মত দূরে সরে যাবে।

চমকে ওঠে অতীন, এবং বিশ্বাসই করতে পারে না, এমন অসম্ভবও সত্য হতে পারে। অতীনের মাথা দু'হাতে জড়িয়ে ধরছে কাজরী, এবং একেবারে অতীনের চোখের কাছে চোখ এগিয়ে দিয়ে হাসছে। ভয় পায়নি, একটুও ব্যথিত হয়নি; কোন আতঙ্ক বা বিমূঢ়তার, কোন ঘৃণাহত ধারণার বেদনা ও লজ্জা বা বিরক্তির কোন কুপিত ধিক্কারের চিহ্ন নেই কাজরীর চোখে।

বিস্মিত হয়ে কাজরীর সেই বিলোড়িত মূর্তির, সেই নর্মাকুল শরীরের অদ্ভুত এক স্পর্শের স্বাদ বরং অনুভব করতে থাকে অতীন। কাজরীর দেহের সকল স্নায়ু ও শিরায় যেন একটা উল্লাস তপ্ত হয়ে উঠেছে। শুনতেও পায় অতীন, কাজরী বলছে—ওটা তোমার ভুল নয় অতীন। ওটা তোমার এই বত্রিশ বছর বয়সের সুন্দর ক্ষমতা। তুমি জান, কাজরী চৌধুরী কেন তোমাকে দেবতা বলে মনে করে।

অতীন—তুমি আশ্চর্য করলে কাজরী।

কাজরীও তার উতলা নিঃশ্বাসের সবচেয়ে বড় আশার স্বপ্নকে যেন আরও মাতিয়ে দিয়ে অদ্ভুত এক দর্পবিহ্বল স্বরে বলতে থাকে—আশ্চর্য হবার কিছু নেই। তোমার কোন ভুলের গল্প শুনে আমার কোন লাভ নেই। আমার কাছে তুমি নির্ভুল, এই যথেষ্ট। আমার জীবনে তুমি হ'লে শুধু তুমি। আর কিছু বুঝি না, জানতেও চাই না!

কাজরীর হাত ধরে অতীন। কাজরী ভ্রূভঙ্গী করে। এবং নিবিড় এক লজ্জার আবেশে অভিভূত হয়ে, অদ্ভুত একটি অভিমানিত সুন্দরতায় রক্তিম হয়ে ছোট একটি সুস্মিত ভর্ৎসনাও ধ্বনিত করে—তুমিই তো আমার এই পাগল দশা ক'রেছ।

মনে পড়ে অতীনের, আগামী কালের সন্ধ্যার বুকে যে উৎসবের ছবিটা দেখা দেবে। এইখানে এসে ঠিক এইভাবে কাজরীর হাত আবার ধরতে হবে। হেসে ওঠে অতীন—আপাততঃ···আসি তা'হলে কাজরী।

কাজরী হাসে—এস।

যে মামা এই দুটি বছর ধরে তার বোকা ও একগুঁয়ে ভাগ্নীর উপর বারবার অনেকবার রাগ করেও সে মেয়ের জন্য তাঁর প্রবল স্নেহের আকর্ষণ তুচ্ছ করতে পারেন নি, এবং স্নেহের সম্পর্কও ছিন্ন করতে পারেন নি, সেই মামা এইবার ঘৃণা ক'রে সম্পর্কটাকেই একেবারে ভুলে গেলেন। রাগ করতেন যখন, তখন তবু দু'একটা চিঠি লিখে মাঝে মাঝে খোঁজ নিতেন। কিন্তু আর নয়, রামকানাইবাবুর কাছ থেকে কেতকী আর কোন চিঠি পায়নি। ঘৃণা ক'রে চিঠি লেখাই বন্ধ ক'রে দিয়েছেন।

মামার কথা মনে পড়লে কেতকীর মনের ভিতরটা দুঃসহ ব্যথায় কাতরাতে থাকে ; কিন্তু উপায় নেই, মামার উপর মনের সব শ্রদ্ধা আর মায়া রেখেও, মামার স্নেহের মূল্য একটুও বিস্মৃত না হয়েও কেতকী মামার এই ঘৃণার অর্থ বুঝতে পারে না। কেতকীর ভালর জন্য মনুমাসি রামকানাইবাবুকে একটা উপায় বলে দিয়েছেন, পুলকমাসিও রামকানাইবাবুকে গ্যারেন্টি দিয়ে সেই উপায়ের পথে কেতকীকে টেনে নিয়ে যেতে চেষ্টা করেছেন। রহস্যটা এখন আর কেতকীর কাছে রহস্য নয়, বুঝতে কিছু বাকি নেই কেতকীর। কেতকীর ভাল হবে, এই বিশ্বাস ছিল বলেই না মামা পৃথিবীর দু'জন উপকেরে মাসির পরামর্শে মত দিয়েছেন। কিন্তু এত ঘৃণা করলেন কেন মামা ? স্বামিহীনা মেয়ের কোলে একটা শিশুকে দেখতে পাওয়া কি এতই ঘৃণার ব্যাপার ?

নারকেল গাছের পাতা ঝুরঝুর শব্দ করে। স্নিগ্ধ বাতাস ফুরফুর ক'রে উড়ে বেড়ায়। ঘরের ভিতর জানালার কাছে একটা

চৌকির উপর বসে কেতকী তার নিজেরই মায়ালস নতুন দেহের ভার ঝুঁকিয়ে দিয়ে একটা শিশুর ঘুমন্ত মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। এই তো, এই তুলতুলে একটা প্রাণময় কোমলতাকে ভয়ানক একটা সমস্যা বলে কেন ভয় পেলেন আর ঘেন্না করলেন মামা? কেতকীর ছেলে, শুধু এই নামের গৌরব নিয়ে বেঁচে থাকতে পারে না কি পৃথিবীর এই একটা প্রাণ? মামারই বা কিসের ক্ষতি?

সুধাময়ীর মোমের মত সাদাটে চেহারাটা বেশ লালচে হ'য়ে উঠছে বলে মনে হয়। রক্তশূন্যতার রোগটা কি সেরে গেল? সুধাময়ীর বুড়ো বয়সের রোগা চেহারার ভিতর থেকে যেন জোর ক'রে বেঁচে থাকবার একটা আবেগ রঙীন হয়ে উথলে উঠছে। রান্না-বান্না থেকে সুরু করে কাপড়-কাচা পর্যন্ত, দু'বেলা ঘর-নিকানো, এমন-কি কেতকীর জন্য চা তৈরী করবার কাজটা পর্যন্ত নিজের হাতেই সেরে দেন সুধাময়ী। বুড়ো বয়সের ঐ রোগা রোগা হাড় থেকে যেন নতুন ক'রে শক্ত খাটুনিব শক্তি উপচে পড়ছে।

সত্যিই একটা গরু কিনে ফেলেছেন কমলবাবু। দুটো বাগানের সব বাঁশঝাড় আর গোটা ত্রিশেক নিম আর অর্জুন বিক্রি করে দিয়েছেন। মনুমাসির পাওনা পাঁচশো টাকা মনি-অর্ডার ক'রে পাঠিয়ে দিয়েছেন। —বাস্, আর আপনি দয়া ক'রে এই বাড়িতে আসবেন না, এই কথাটাও মনুমাসিকে চিঠিতে লিখতে চেয়েছিলেন কমলবাবু। কিন্তু আপত্তি করেছেন সুধাময়ী—থাক্, বড়লোককে চটিয়ে লাভ নেই, চটে গেলে আবার কোন্ ক্ষতি করতে উঠে-পড়ে লেগে যাবেন, কে জানে?

শুধু ঐ বড়দিকে নয়, সারা জগৎটাকেই আজকাল বড় ভয় করেন সুধাময়ী। ঘেন্না করে সবাই দূরে সরে থাকুক, কেউ যেন এই ভাঙ্গা-বাড়ির স্বপ্নের ঘরে উঁকি দিতেও না আসে। নজর দেবে, নজর দেবে, এই ভাঙ্গা-বাড়ির এত বড় সুখ ওদের চোখে

সইবে না। নিন্দে রটছে চারদিকে, ভয়ানক নিন্দে, রসিকপুরের নতুন-পাড়ার ভদ্রলোকেরা সামাজিক বয়কট করবে বলে হরিসভার প্রাঙ্গনে বসে আলোচনা করেছেন, এসব খবর শুনে খুশিই হন সুধাময়ী।

নতুন-পাড়ার পাঁচুর কাছ থেকেও মাঝে মাঝে নানারকম খবর শোনেন কমলবাবু, এবং শুনেই হেসে ফেলেন। পাঁচু বলে—বাবুরা আপনার ওপর বড় রাগ করেছেন কর্তা।

—কেন ?

—আপনি নাকি সম্পত্তি বেচবেন না ?

না।

—যুধিষ্ঠিরবাবুকে নাকি আপনি ধমক দিয়েছেন ?

—হ্যাঁ, সম্পত্তি বেচে দেবার জন্য আমাকে পরামর্শ দিতে এসেছিল যুধিষ্ঠির।

—তাই ওনারা ক্ষেপেছেন।

বাড়িয়ে বলেনি পাঁচু। ভদ্রলোকেরা রেগে ক্ষেপেই গিয়েছেন। তার প্রমাণ, নিকুঞ্জবাবুর মেয়ের বিয়েতে সারা রসিকপুরের মানুষ নিমন্ত্রিত হলো, শুধু বাদ পড়লো রসিকপুরের এই ভয়ানক ভাঙ্গাচোরা কুৎসিত বাড়ির মানুষগুলি।

দুঃখের দিনে আর সুখের দিনে যে মস্ত একটা পার্থক্য আছে, সেই সত্য মর্মে মর্মে অনুভব করেছেন কমলবাবু।—আজকাল দিনগুলি যে দেখতে দেখতে কেটে যাচ্ছে সুধা ? বুঝতেই পারিনি যে দাদার বয়স ছ'মাস হতে চললো।

হ্যাঁ, দিনগুলি কোন আঘাত না দিয়ে তরতর ক'রে পার হয়ে যাচ্ছে। টাকা-পয়সার যখনই যা দরকার হয়েছে, কেতকীই দিয়েছে। বাগানের গাছ বেচবার আর দরকার হয়নি। সেজন্যও কোন দুর্ভাবনা নেই। এই ভাঙ্গা-বাড়ির সংসারের দায়-দাবি আর ক্ষুধা-তৃষ্ণার জন্য গাদা-গাদা টাকার দরকার হয় না। যেটুকু

দরকার, সেটুকু কেতকীই জুগিয়ে যাচ্ছে। নিশ্চিন্ত হয়ে এই অদ্ভুত সৌভাগ্যের আবেশে বিভোর হয়ে আছেন কমল বিশ্বাস ও সুধাময়ী।

এই নিশ্চিন্ততার আবেশ খট ক'রে ভাঙ্গা-পাঁজরের ব্যাথার মত বেজে উঠতে পারে কোনদিন, ঐ সন্দেহটা যাদের মনের ভিতর মরে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল, তারাই ভয় পেয়ে চমকে উঠলো সেদিন, যেদিন সারা সকালটা গম্ভীর হয়ে রইল কেতকী, কারও সঙ্গে একটা কথাও বললো না।

বাজারের পয়সা চাইবার জন্য অন্য দিনেরই মত অক্লেশে, সহজ ও স্বচ্ছন্দে অভ্যাসের আবেগে কেতকীর সামনে গিয়ে সেই সকালেও যখন দাঁড়ালেন কমলবাবু, তখন কেতকীই সেই গম্ভীর মুখ আরও গম্ভীর ক'রে বলে—টাকা নেই! স্কুলের কাজে জয়েন না করলে ছুটির মাসের মাইনেগুলিও পাওয়া যাবে না।

ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করেন কমলবাবু—স্কুল কমিটি কি রাগ ক'রেছে?

কেতকী—হ্যাঁ। প্রথমে যে চার মাসের ছুটি মঞ্জুর ক'রেছিল, তার মাইনে দিতে রাজি হয়েছে। তার পরেও চার মাসের বিনা মাইনের ছুটি মঞ্জুর করেছে। কিন্তু আর ছুটি দিতে রাজি নয়। এইবার কাজে না গেলে চাকরিও থাকবে না, আর ঐ ছুটির মাসের মাইনেও দেবে না।

স্তব্ধ হয়ে, আর সেই পুরনো অসহায়তার দৃষ্টিটাকে একেবারে অপলক ক'রে তাকিয়ে থাকেন কমলবাবু। কেতকী বলে—আমার হাতে যা জমা ছিল, সব ফুরিয়েছে।

কমলবাবু—কবে কাজে জয়েন করতে বলছে ওরা?

কেতকী—আজই শেষ তারিখ।

কোন উত্তর না দিয়ে চলে আসছিলেন কমলবাবু। কেতকীই বলে—আর একটা কথা।

—কি ?

—মামা একটা চিঠি লিখেছেন।

—কি লিখেছেন ? দুই চোখের ভীরুতা সামলাতে সামলাতে ক্ষীণস্বরে প্রশ্ন করেন কমল বিশ্বাস।

কেতকী হাসে—মামা আমাকে ক্ষমা করেছেন।

কমলবাবু আতঙ্কিতের মত চমকে ওঠেন—তার মানে ?

কেতকী—বেবিকে নিয়ে আমি যেন এইবার তাঁরই কাছে গিয়ে থাকি, এই তাঁর ইচ্ছা। আমাকে আর চাকরি করতে দিতে তিনি চান না।

কমলবাবু—তুমিও কি চাও না ?

উত্তর না দিয়ে কেতকী তার চোখ দুটো আরও বিমর্ষ ক'রে একেবারে আনমনার মত আকাশকোণের সাদা সাদা মেঘগুলির দিকে তাকিয়ে থাকে। কমলবাবুর ব্যগ্র ব্যস্ত আর ভীত কৌতূহলের প্রশ্নটা যেন শুনতেই পায়নি কেতকী।

আর কি শোনবার আছে ? কোন কথা না বলেও যে একটা স্পষ্ট ও কঠোর উত্তর শুনিয়ে দিচ্ছে কেতকী। মাথা হেঁট ক'রে আস্তে আস্তে চলে যান কমলবাবু।

এবং তারপরেই এই ভাঙ্গা-বাড়ির অদৃষ্টের সেই চিরকেলে দৃশ্যটাই দেখা দেয়। ঠাকুর দালানের বারান্দার উপর এই ভগ্ন বিগলিত ও অভিশপ্ত এক রাজবাড়ির স্বার্থপর দুটি আত্মার চক্রান্তের দৃশ্য। মুখোমুখি বসে থাকেন কমলবাবু ও সুধাময়ী। চাপাস্বরে আলোচনা করেন। কি হবে উপায়, যদি কেতকী চলে যায় ? ওকে আটকে রাখবার কি কোন উপায় নেই ? কেতকীর ঐ হঠাৎ বিদ্রোহকে শান্ত করবার কি কোন কৌশল নেই ?

কমলবাবু—কেতকী অনায়াসে চাকরিটা করতে পারতো সুধা।

সুধাময়ী—ইচ্ছে নেই যখন, তখন আর কি করা যাবে বল ?

কমলবাবু রাগ করেন—তুমি না বুঝেসুঝে ওরকম বড় বড় কথা

বলো না সুধা। কেতকী চলে গেলে তোমার আমার কি দশা হবে, সেটা বুঝতে পারছো ?

সুধাময়ী হাসেন—আমার কথা ছেড়ে দাও, আমার জন্যে কোন ভাবনা ভাবতে হবে না, আমার প্রাণ পাথর হয়েই গিয়েছে।

কমলবাবু—কি বললে ?

সুধাময়ী—দাদাটার জন্যে কেঁদে কেঁদে তুমি যে নিজের কি দশা করবে, তাই ভেবে .....।

চেঁচিয়ে ওঠেন কমলবাবু—আবার একটা বড় কথা, একেবারে মিথ্যে কথা বলে ফেললে সুধা। ওসব কথা নয়।

সুধাময়ী—তবে কি ?

কমলবাবু—না খেয়ে মরতে হবে।

নিজেদের চিনতে আর ভুল করে না ভাঙ্গা-বাড়ির বুড়ো আর বুড়ি। এই দুই অক্ষম অসহায় আর নিঃস্ব জীবনের ভিতরে কোন কপট বড়াই আর মুখর হয়ে ওঠে না। নতুন পাড়ার হরিসভার প্রাঙ্গনে যে নিন্দা মুখর হয়ে ওঠে, সে নিন্দা শুনে রাগ করবার শক্তি নেই, কারণ নিন্দাটাকে মিথ্যে বলে মনে করেন না কমলবাবু, এবং তাঁর স্বার্থপর জীবনের চিরকেলে চক্রান্তের সঙ্গিনী ঐ সুধাময়ী। কোন্ এক ভদ্রলোকের বোকা মেয়েকে নকল আদরে বশীভূত ক'রে, মেয়েটার সকল রকম সর্বনাশ ঘটিয়ে, এবং সেই মেয়েটারই রোজগারে মহাসুখে আছে ঐ বুড়ো ঘুঘু ও তার বুড়ি। অভিযোগটা শুনতে খারাপ, কিন্তু একটুও মিথ্যে তো নয়।

কমলবাবু বলেন—তুমি একবার হাত ধরে কেতকীকে সেধে দেখ সুধা।

সুধাময়ী—যদি তাতে না মানে ?

কমলবাবু—তারপর তো আমি আছিই, আমার চোখের জল দেখে কি কেতকী ঘাবড়ে যাবে না ?

এই অদ্ভুত চক্রান্তের পরেই চোখ দুটোকে নিংড়ে দিয়ে একটা

ছলছল ভাব ফুটিয়ে তোলবার জন্য যখন চেষ্টা করছেন কমল বিশ্বাস ঠিক তখন, কেতকী কোথা থেকে আচমকা এসে সামনে দাঁড়ায়। আপনি এবার ঘরের ভেতরে যান মা। বেবি একা আছে।

সুধাময়ী ফ্যালফ্যাল ক'রে তাকিয়ে এবং দুঃসহ একটা আতঙ্ক বুকের কাছ থেকে জোর ক'রে ঠেলে দিয়ে প্রশ্ন করেন।—তুমি কোথায় চললে?

কেতকী—দশটা প্রায় বাজে, আমি স্কুলে চললাম।

কমলবাবু—তুমি যে এখনই বললে...।

কেতকী হাসে—আমি কিছু বলিনি; মামা তাঁর চিঠিতে বলেছেন। কিন্তু আমি...আমাকে যে চাকরি করতেই হবে।

বাসনা এসেছে। শুধু চোখের দেখা দিতে নয়, শুধু একটি চরম কথা জানিয়ে যেতে। এই শেষ, আর এই বাড়িতে আসতে পারবে না বাসনা, যদি রামকানাইবাবুর ঐ ভাগ্নী এই বাড়ি থেকে চলে না যায়। এলাহাবাদের পার্থবাবু, বাসনার শ্বশুর একেবারে দিব্যি দিয়ে নিষেধ ক'রে দিয়েছেন, বাপ-মার কাছে গিয়ে শুধু একটা চোখের দেখা দিয়ে আসতে পারো বউ-মা, কিন্তু সাবধান, ভুলেও জলগ্রহণ করতে পারবে না।

কলকাতার সেই অশ্বিনীবাবুর বাড়িতে এসে উঠেছে বাসনা আর বাসনার স্বামী অজিত। বুড়ো শ্বশুর আর শাশুড়ির কাছে একবার চোখের দেখা দিতে অজিতের ইচ্ছা হয়েছিল। কিন্তু বাসনা বলে, একেবারে স্পষ্ট ভাষায় গলা খুলে এই ভাঙ্গাবাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে কমলবাবুর আর সুধাময়ীকে শুনিয়ে দেয়—সে আসতে চেয়েছিল, কিন্তু আমিই আপত্তি করেছি। রামকানাই-বাবুর ভাগ্নী যতদিন এই বাড়িতে থাকবে, ততদিন কোন্ সাহসে ওকে এখানে আসতে দিতে পারি বল?

চা আনে কেতকী। বাসনা চেঁচিয়ে আপত্তি করে—তোমার ছোঁয়া চা খাওয়া দূরে থাক্, এই বাড়ির ঠাকুর ঘরের জল খেতেও আমার মানা আছে।

বাসনার মুখের দিকে তাকিয়ে শুধু আশ্চর্য হয়ে, বাসনার এই বিদ্রোহের কোন অর্থ না বুঝতে পেরে, দুটো হতভম্ব বোকা চোখ নিয়ে, চা-এর পেয়ালা হাতে তুলে নিয়ে চলে যায় কেতকী।

সুধাময়ী বলেন—এরকম একটা পাগলামি করবার জন্যই কি তুই এতদিন পরে দেখা দিতে এলি বাসু? ছিঃ।

বাসনা চিৎকার করে—ছিঃ কর নিজেকে। ওরকম একটা মেয়েমানুষের ছোঁয়া জল খেতে তোমাদের লজ্জা করে না?

কমল বিশ্বাসের চোখ ধিক ধিক করে।—কিসের লজ্জা রে বাসু?

বাসু—শুনতে পাও না, চারদিকের মানুষ কি বলছে? এলাহাবাদ পর্যন্ত পৌঁছে গেল যে কেলেঙ্কারির কথা, সেটা কি তোমরা জান না?

কমলবাবু আশ্চর্য হন—কিসের কেলেঙ্কারি, কার কেলেঙ্কারি?

বাসনা—রামকানাবাবুর ভাগ্নীর! স্বামীর সঙ্গে যার কোন দিন সম্পর্ক হয়নি, যে নিজে দরখাস্ত ক'রে এই কথা স্বীকার ক'রে আদালতের সাহায্য নিয়ে স্বামীকে তাড়িয়েছে, সে মেয়েমানুষের কোলে ছেলে আসে কোথা থেকে? তোমরা পাগল হয়ে গিয়েছ, নইলে এত বড় অপমানেরও বোধ নেই কেন? কী অদ্ভুত কাণ্ড একটা বে-আইনী ছেলেকে নাতি-নাতি ক'রে আদর দিয়ে···ছি ছি···তোমাদের মাথা খারাপ হয়েছে।

সোজা টান হয়ে উঠে দাঁড়ান কমলবাবু। দু' পা এগিয়ে এসে বাসনার মুখের দিকে কটমট ক'রে তাকিয়ে বলেন—তোর এখানে আসাই উচিত হয়নি বাসু। ভুল করেছিস।

বাসনার চোখ ছলছল করে—তা তো জানিই। কিন্তু তোমাদেরই জন্য মায়ায় পড়ে এই ভুল করেছি।

অশ্বিনীবাবুর গাড়িটা বাগানের পথের উপরেই দাঁড়িয়েছিল। বাসনাও আর এক মিনিট দেরি করে না। চোখ মুছতে মুছতে অস্পৃশ্য বাড়ির ভাঙ্গা সিঁড়ি ধরে আস্তে আস্তে নেমে, তারপর প্রায় একটা দৌড় দিয়ে গাড়ির দিকে চলে যায়।

ঘরের ভিতর স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিল কেতকী, যদিও আধঘণ্টা হলো চলে গিয়েছে বাসনা। বুঝতে পারে কেতকী, তার কান দু'টো একটা আগুনের জ্বালা লেগে পুড়ছে। বাসনার মুখের ঐ কথাটা যেন সারা জগতের চিৎকার হয়ে বাজছে—বে-আইনি ছেলে।

অভিযোগটা কি মিথ্যা? বাসনা অনেক কিছুই জানে না, তাই ঐ ছেলের প্রাণটাকে বে-আইনি বলে গাল দিয়েছে। কিন্তু সব কিছু জানলেও যে ঐ একই ধিক্কার দিত বাসনা। কেতকীর প্রাণ যাকে স্বামী বলে স্বীকার করে নি, এমনই একটা পুরুষের দেহের দস্যুতাকে ভয় পেয়ে সহ্য করতে হয়েছিল। কেতকীর ছেলে হলো কেতকীর ঐ একটি ক্ষণের আতঙ্কিত ও অসহায় জীবনের সহ্যের সৃষ্টি। মিথ্যে নয়, নতুন পাড়ার পাঁচুর কোলে চড়ে বেড়াতে চলে গেল ঐ যে বেবি, সে শুধু কেতকীরই ছেলে। বেবির বাপ নেই।

বাসনার ধিক্কারকে নয়, চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে কেতকী তার নিজেরই মনের একটা কল্পনাকে যেন দু' চোখের যত ভয় নিয়ে দেখতে থাকে, আর মাঝে মাঝে শিউরে ওঠে। বেবিটা যেন অনেক বড় হয়ে উঠেছে, স্কুলে ভর্তি হবে বেবি, ভর্তি হবার একটা ফরম কেতকীর চোখের সামনেই পড়ে রয়েছে। ফরমের সব ঘর পূর্ণ করা হয়েছে। শুধু শূন্য হয়ে আছে একটি ঘর। ছাত্রের বাপের নাম কি? কলম হাতে নিয়ে চুপ ক'রে বসে আছে কেতকী,

লিখবার মত কোন ভাষাই খুঁজে পাচ্ছে না। আর, বেবিটাও ব্যস্ত হয়ে চেঁচিয়ে বলছে—শিগগির আমার বাবার নামটা লিখে দাও মা।

কি ভয়ানক কল্পনা! ঝর ঝর ক'রে ঝরে পড়া চোখের জলের সঙ্গে যেন শাড়ির আঁচল দিয়ে লড়াই করে কেতকী। কিন্তু চোখ দুটো শুকনো হতেই চায় না। কেতকীর ছেলের প্রাণটা বিনা দোষে এত বড় একটা অপবাদের বোঝা নিয়ে এই পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াবে?

বিকাল শেষ হয়ে গিয়েছে অনেকক্ষণ। সন্ধ্যা হলেই কেতকীকে আজকাল একবার বইরে যেতে হয়, নতুন একটা কাজের দায়ে; মাসে চল্লিশ টাকা মাইনের একটা কাজ। রেলওয়ের অ্যাকাউন্টেন্ট নীহারবাবুর মেয়ে চিত্রাকে গান শেখাতে হয়। পাইকপাড়ার মেয়েস্কুলের গানের টিচার বিরজাদি কেতকীর জন্য এই গান শেখাবার কাজটা জোগাড় করে দিয়েছেন—আমার সময় নেই কেতকী, তুমিই কাজটা নাও, চিত্রাদের বাড়িটাও তোমার রসিকপুরের খুব কাছে। তা ছাড়া, মাসে চল্লিশটা টাকা, মন্দ কি?

হ্যাঁ, মন্দ নয়, বরং খুবই দরকার; এরকমই একটা কাজ খুঁজছিল কেতকী। বেবি ছাড়া, এই বাড়ির আর দুটো বুড়ো মানুষও যে একেবারে অসহায় বেবি। পঁচাশি টাকার মাইনেতে এই সংসারের খরচ কুলোয় না; শনিবার দিনটাতে স্কুলে অতিরিক্ত একটা কাজের দায় নিয়ে, ড্রইং শেখাবার ভার নিয়ে পঁচিশ টাকা অ্যালওয়েন্স পাওয়া যায়, কিন্তু তবুও যে খরচ কুলোয় না।

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। চিত্রাও বোধহয় এতক্ষণে এসরাজ হাতে নিয়ে তার কেতকীদির দেরি দেখে আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছে। হোক আশ্চর্য, চিত্রা এখন কল্পনাও করতে পারবে না যে, তার গানের টিচার কেতকীদির গলার গান এখন বদ্ধ আর্তনাদের মত কেতকীদিরই গলার ভিতরে আটকে রয়েছে।

দরজার বাইরে একটা ছায়া নড়চড় করে। দেখেই বুঝতে পারে কেতকী, সুধাময়ীর ছায়া। একেবারে দরজার কাছে এসে সুধাময়ী বলেন---মন ভাল না থাকলে আজ আর তোমার গান শেখাতে গিয়ে কাজ নেই কেতকী।

কেতকী হাসে—কাজ যখন, তখন যেতেই হবে।

যাবার জন্যই তৈরী হয়ে কেতকী এদিক-ওদিক তাকিয়ে কি-যেন খুঁজতে থাকে। সুধাময়ী বলেন—কি?

কেতকী—পাঁচু কি বেবিকে নিয়ে এখনও ফেরেনি?

সুধাময়ী—না।

কেতকী—রোজই এরকম দেরি করে নাকি?

সুধাময়ী—হ্যাঁ, আমি তো পাঁচুকে আর বলে বলে পারি না। ফিরতে বড় দেরি ক'রে পাঁচু; রোজই ভরা সন্ধ্যাটার মধ্যে ঘুমন্ত ছেলেটাকে নিয়ে বাড়ি ফেরে, আমার একটুও ভাল লাগে না।

শুনে কেতকীরও ভাল লাগে না। গাঁজা খাওয়ার অভ্যেস আছে পাঁচুর, তাই বোধহয় দেরি করে। কে জানে কোথায় বেবিকে বসিয়ে রেখে গাঁজা খায় পাঁচু?

গান শেখাবার কাজ থেকে কেতকীর বাড়ি ফিরতে রোজ সন্ধ্যা পার হয়ে যায়। বাড়ি ফিরে কতবার দেখেছে কেতকী, সুধাময়ীর কোলে ঘুমিয়ে রয়েছে বেবি। এবং বেবিকে কোলে নিয়ে জামা ছাড়াতে গিয়েই চমকে উঠেছে। এ কি কাণ্ড? পাঁচুটা তো গাঁজা খায়, কিন্তু বেবির জামায় সিগারেটের গন্ধ এবং সেই সঙ্গে পাউডার আর সেন্টের একটা মিষ্টি গন্ধ কেন? এ রকমের মিষ্টি গন্ধ তো এই বাড়ির কোন পাউডারে নেই।

—বেবিকে নিয়ে কোথায় গিয়েছিলে পাঁচু? কতবার প্রশ্ন করেছে কেতকী। পাঁচুও আশ্চর্য হয়ে ঐ একই কথা বলে রোজ উত্তর দিয়েছে।—কোথায় আর যাব বউদিদি? তুমি কি মনে কর

যে, বেবিকে আমি গাঁজার কেলাবে নিয়ে গিয়েছি? কখ্‌খনো না, সেটি হতে পারে না।

বেবিকে নিয়ে পাঁচু এখন বাড়ি ফিরবে না। কোনদিনই এসময় ফিরে আসে না। কিন্তু ছাত্রীকে গান শেখাতে হলে আর দেরি করাও যায় না।

রোজই যেমন বের হয়, তেমনি গানের স্বরলিপির একটা বই হাতে নিয়ে আজও ঘর থেকে বের হয়ে যায় কেতকী। রোজ যেমন, আজও তেমনই চিত্রাদের বাড়ির দিকে যেতে যেতে রেলওয়ের নতুন তৈরী কোয়াটারগুলির নিকটে এসে ছোট পার্কটার কাছে ডানদিকের রাস্তাটা ধরে আরও এগিয়ে যায় কেতকী। কিন্তু আজ হঠাৎ থম্‌কে দাঁড়ায়। বেবির কথা ভাবতে ভাবতে সত্যিই যেন বেবির মুখটাকে দেখতে পেয়ে চমকে উঠেছে কেতকী। চুপ ক'রে, অদ্ভুত বিস্ময়ে অবশ একটা মূর্তি নিয়ে চোখেরই সামনে একটা কোয়াটারের ছোট বারান্দাটার দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে থাকে। আলো জ্বলছে বারান্দায়। গেঞ্জি গায়ে এক ভদ্রলোক আরাম চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে বসে আছেন। ভদ্র-লোকের হাতে একটা পত্রিকা। কিন্তু পত্রিকা পড়ছেন না ভদ্রলোক। পত্রিকা শুদ্ধ হাতটা অলস হয়ে একপাশে ঝুলে রয়েছে। চোখ বন্ধ ক'রে যেন একটা তন্দ্রাসুখ উপভোগ করছেন ভদ্রলোক। আর, ভদ্রলোকের সেই অলস এলিয়ে-পড়া শরীরের উপর হুটোপুটি করছে দেড় বছর বয়সের একটা শিশুর শরীর। কখনো ভদ্রলোকের পেটের উপর দাঁড়িয়ে মত্ত হয়ে লাফাচ্ছে সেই বাচ্চাটা, কখনো বা ভদ্রলোকের চুল ধরে ঝুলে পড়ছে। কিন্তু ভদ্রলোক একেবারে নিঝুম। যেন শরীরের সঙ্গে মন-প্রাণও এলিয়ে দিয়ে বাচ্চাটার এই দৌরাত্ম্যের স্পর্শসুখ আত্মসাৎ করছেন। বাঃ, দেখতে বেশ ভালই তো লাগে। কিন্তু ঐ বাচ্চার মুখটা হুবহু বেবির মুখটার মত কেন?

এক পা'ও আর এগিয়ে যেতে পারে না কেতকী। কেতকীর চোখ দুটোও যেন ক্ষণিকের মোহের বশে লুব্ধ হয়ে এই সংসারের বাপের আদরের একটা দৃশ্য দেখছে।

হঠাৎ তন্দ্রা থেকে যেন চমকে জেগে উঠলেন ভদ্রলোক। একটা সিগারেট ধরালেন। তারপরেই বাচ্চাটাকে বুকের উপর দাঁড় করিয়ে চিৎকার করলেন—পাউডারের ডিবেটা একবার দিয়ে যাও তো পিসিমা।

শুনতে পেয়েছে কেতকী। থর থর ক'রে কেঁপে ওঠে কেতকীর চোখের দৃষ্টি, এবং সেই সঙ্গে একটা রহস্যও। বেবির মত নয়, বেবিই দাঁড়িয়ে আছে ভদ্রলোকের বুকের উপর। কেতকীর ছেলে কেমন ক'রে আর কোথা থেকে পাউডার মেখে শরীরটাকে আরও মিষ্টি ক'রে নিয়ে রোজই বাড়ি ফেরে, সেই রহস্যের ছবি একেবারে স্পষ্ট ক'রে চোখের উপরেই দেখতে পায় কেতকী। বেবিটাও কি ভয়ানক লোভী! নাচতে শুরু করেছে।

রোজই বিকালে ঠিক এইভাবে কেন ছটফট ক'রে বাড়ির বাইরে যাবার জন্য কেন নাচতে থাকে কেতকীর বেবি, সেই প্রশ্নের উত্তরও পেয়ে যাচ্ছে কেতকী। ঐ তো, ঐ ভদ্রলোকের বুকের উপর এসে লুটোপুটি করবার জন্য। দেড় বছর বয়সের একটা মানুষ, কিন্তু আশ্চর্য, এরই মধ্যে ওর জীবনের নিষ্ঠুর একটা ফাঁকিকে যেন বুঝে ফেলেছে। যে আদরের পাউডার ওর পাওয়ার কথা নয়, সেই আদরের পাউডার পৃথিবীর একটা মানুষের কাছ থেকে আদায় করতে পেরেছে কেতকীর বেবি।

কেতকীর পা দুটোও যেন কাণ্ডজ্ঞান ভুলে বেহায়ার মত রাস্তার ধূলোর উপর অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে চায়। আরও কিছুক্ষণ দেখতে ইচ্ছা করে। ঐ কোয়ার্টারের ছোট বারন্দার দৃশ্যটাকে দেখতে কত ভাল লাগছে, তাও বোধহয় মনের অবশ ভাবনার ঘোরে

ঠিক বুঝতে পারে না কেতকী। তা না হলে একটু লজ্জা পেয়ে এতক্ষণে এখান থেকে চলে যেতে পারতো।

নিজেই জানে না, বুঝতেও পারেনি কেতকী, কতক্ষণ সে এই-ভাবে এখানে দাঁড়িয়ে আছে।

—কে দাঁড়িয়ে ওখানে ? ভেতরে আসুন। ডাক শুনেই চমকে উঠে দেখতে পায় কেতকী, বারান্দার সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে কেতকীর দিকে তাকিয়ে হাঁক-ডাক করছেন এক মহিলা, ঐ ভদ্রলোকের পিসিমা, যিনি কিছুক্ষণ আগে ঘরের ভিতর থেকে পাউডারের ডিবে হাতে নিয়ে বের হয়ে এসেছিলেন।

মাথায় কাপড় দেবার অভ্যাস অনেকদিন আগেই ছেড়ে দিয়ে-ছিল কেতকী। পিসিমার ডাক শুনে মাথার কাপড় তুলে দিয়েই চমকে ওঠে কেতকী, এবং লজ্জা পেয়ে সেই মুহূর্তে মাথার কাপড় আবার নামিয়ে দিয়ে সেই বারান্দার দিকে আস্তে আস্তে এগিয়ে যায়। দেখতে পায় কেতকী, বেবিটা ঘুমিয়ে পড়েছে ভদ্রলোকের কোলের উপর, এবং ভদ্রলোক হাঁটু দুলিয়ে আস্তে আস্তে বেবির সেই ঘুমের নিঝুম আরামটাকে যেন দোলা দিয়ে আরও নিবিড় ক'রে দিচ্ছেন।

পিসিমা এবং সেই ভদ্রলোক, দু'জনেরই দিকে তাকিয়ে নমস্কার জানায় কেতকী; সঙ্গে সঙ্গে হেসে ফেলে—আমাকে আপনারা চেনেন না, কিন্তু···।

ভদ্রলোক বলেন—খুব চিনি। আপনাকে আমি অনেকবার দেখেছি। আপনিই তো রোজ সন্ধ্যাবেলা অ্যাকাউন্টেন্ট নীহার-বাবুর মেয়েকে গান শেখান।

কেতকী—হ্যাঁ।

পিসিমা হাসেন—কিন্তু এ বাড়িতে গান শেখাবার মত কোন মেয়ে নেই। হ্যাঁ, পারুলটা যদি আসতো, তবে বোধহয় তোমার খোঁজ নিতে হতো।

ভদ্রলোক – না এসে ভালই হয়েছে। ঘন ঘন বদলির চাকরি, কোথাও গিয়ে পুরো একটা বছরও থাকবার সুযোগ পাই না।

ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ান, এবং ঘরের ভিতরে ঢুকে একটা দোলনায় বেবিকে শুইয়ে দেন। তার পরেই একটা চেয়ার তুলে নিয়ে এসে বলেন—বসুন আপনি।

চেয়ারে বসে না কেতকী। কি-ভেবে পিসিমার মুখের দিকে একবার তাকায়। পিসিমা বলেন—বসো তুমি, আমার জন্য ভেব না। সন্ধ্যার পূজো না সেরে আমি চেয়ারে বসি না।

কেতকী হাসে—একটা কথা জিজ্ঞেসা করবার ছিল।

ভদ্রলোক—বলুন।

কেতকী—এখনি যে বেবিকে ঘরের ভেতরে রেখে এলেন ...।

ভদ্রলোক বাধা দিয়ে বলেন—না না, ও নিতান্তই একটা বাচ্চা, ওর গান শেখবার বয়সই হয়নি।

পিসিমা বলেন—তা ছাড়া, বাচ্চাটা আমাদের কেউ নয়।

ভদ্রলোক—একটা চাকর ওকে এখানে রেখে দিয়ে রোজই··· ঐ দেখুন, পার্কের ঐ কোণে, যেখানে কতগুলো লোকের জটলা দেখতে পাচ্ছেন, ওখানে বসে এখন গাঁজা খাচ্ছে চাকরটা।

কেতকী—চাকরটা রোজই এই কাণ্ড করে বুঝি ?

পিসিমা—হ্যাঁ ; তার কারণও আছে।

কেতকী—কি ?

পিসিমা—সে একটা দুঃখের কথা, লজ্জার কথাও বটে।

কেতকীর চোখ থরথর করে—সে আবার কি ?

পিসিমা—অন্য কোন বাড়িতে ঐ বাচ্চাকে এক মিনিটের জন্যও ঠাঁই দিতে চায় না। বলতে গেলে, একরকম দূর দূর ক'রে তাড়িয়ে দেয়। চাকরটাও কত দুঃখ করছিল।

কেতকী—কেন ? বাচ্চাটার কি জাত ভাল নয় ?

পিসিমা—না গো মেয়ে, জাতের কথা নয়, তার চেয়েও খারাপ কথা। লোকের দোষও দেওয়া যায় না।

কেতকী ফ্যাল ফ্যাল ক'রে ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকায়। ভদ্রলোক বলেন—বাচ্চাটি হলো এক আনহ্যাপি মহিলার অবৈধ সন্তান।

কেতকীর চোখ ঝিকঝিক ক'রে জ্বলে—কে সেই মহিলা ?

ভদ্রলোক—আমি জানি না, কোন খবরও রাখি না। রসিক-পুরের নতুন পাড়ার ভদ্রলোকেরা আর মহিলারা এদিকে প্রায়ই বেড়াতে আসেন। ওঁদের কাছ থেকেই শোনা।

কেতকী—বোধ হয় রসিকপুরের কমল বিশ্বাসের··।

ভদ্রলোক—হ্যাঁ হ্যাঁ, কমল বিশ্বাসের পুত্রবধূ ছিলেন সেই মহিলা। যাক্‌গে, এসব আলোচনা করা বোধহয় আমাদের উচিত হচ্ছে না।

কিন্তু কেতকীর বুকের ভিতরে যেন একটা কঠোর ও দুর্বার প্রশ্নের ঝড় গোঁ গোঁ করছে। অপরিচয়ের বাধা, অচেনা এক ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলবার নিয়ম, কৌতূহলের সীমা, ভাষার লজ্জা আর সংযম, সবই যেন ভুলে গিয়েছে কেতকী। কেতকী প্রশ্ন করে—তবে আপনি কেন ঐ ছেলেকে একেবারে বুকের উপর তুলে নিয়ে···।

ভদ্রলোক—ছিঃ ছিঃ, একি কথা বলছেন আপনি, এটা কি একটা প্রশ্ন হলো ? বাচ্চাটা হলো একটা বাচ্চা, ওর সঙ্গে ঐ সব গল্পের কি সম্পর্ক আছে ?

পিসিমা বলেন—আমার এই ভাইপোটির কাণ্ডজ্ঞানের বালাই একটু কম, একথা ওর মুখের উপরেই বলে দিচ্ছি ! দেখ না, ঐ বাচ্চার জন্যই দোলনা কিনে এনেছে। অফিস থেকে ফিরে এসেই ব্যস্ত হয়ে বাচ্চাটাকে খুঁজবে। বাচ্চাটাকে নিয়ে চাকরটা আসতে

দেরি করলে চাকরটাকে গালমন্দ করে। তার ওপর আর এক কাণ্ড…।

পিসিমা চুপ করেন। ভদ্রলোকও পিপিমাকে একেবারে চুপ করিয়ে দেবার জন্য বলেন—থাক পিসিমা, তুমি আবার যত অবান্তর ঘরোয়া কথা নিয়ে বাইরের এক ভদ্রমহিলার কাছে কেন…।

পিসিমা—তুই চুপ কর নির্মল; ইনি, ইনি যে একজন বাইরের লোক, ইনিই তোর মতিগতির খবর শুনে বলে দিয়ে যান; এরকমের বাড়াবাড়ি কি ভাল? শেষে ভয়ানক দুর্ণামের ভাগী হতে হবে না কি?

কেতকীর দিকে তাকিয়ে পিসিমা বলেন—বললে বিশ্বাস করবে না তুমি, কলকাতায় হেড অফিসে উঁচু পোষ্টে বদলির অর্ডার হয়েছে, তবু ছেলে বদলি নিতে রাজি নয়। বদলি নাকচ করবার জন্য দরখাস্ত করেছে।

কেতকী—কেন?

পিসিমা—ঐ বাচ্চাটার জন্য। বাচ্চাটাকে না দেখতে পেলে ওর নাকি মাথা খারাপ হয়ে যাবে।

—আঃ, পিসিমার ভাই-পো নির্মল যেন বিরক্ত হয়ে আপত্তি করে—এসব প্রসঙ্গ এখন থামাও পিসিমা।

তার পরেই কেতকীর দিকে তাকিয়ে অন্য প্রসঙ্গের সূত্রপাত করে নির্মল।—দুঃখের বিষয়, এবাড়িতে আপনার গানের ছাত্রী হবার মত কেউ নেই। তবে আমি খোঁজ নিতে অবশ্য ত্রুটি করবো না…দেখি দমদমের সেজদার মেয়েটা গান শিখতে চায় কিনা?

কেতকী উঠে দাঁড়ায়। নির্মলও উঠে দাঁড়িয়ে বিদায় দেয়—আসুন তাহ'লে।

কেতকী বলে—বেবিকে নিয়ে আসুন।

নির্মল চমকে ওঠে—কেন?

কেতকী—আমার কাছে দিন। নিয়ে যাই।

আতঙ্কিতভাবে তাকায় নির্মল—সে কি? অদ্ভুত কথা? আপনি নিয়ে যাবেন কেন? কে আপনি?

কেতকী—দিন না, আমি চাইছি।

চেঁচিয়ে হেসে ওঠে কেতকী, এবং সেই সঙ্গে যেন ছলাক ক'রে ছ'চোখের কোণে বড় বড় ছটো জলের ফোঁটা চমকে উঠেই গলে যায়।

—বুঝেছি, বুঝেছি, আপনিই তাহ'লে···। বলতে বলতে ঘরের ভিতরে চলে যায় নির্মল। এক মুহূর্তও দেরি করে না। ঘরের ভিতর থেকে ঘুমন্ত বেবিকে তুলে নিয়ে এসে কেতকীর কোলে তুলে দেয়।

কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকেন পিসিমা। এবং এক হাতে কপাল টিপে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে নির্মল, অদ্ভুত এক রহস্যের অন্ধকার থেকে যেন একটা চোরা মমতা এসে বাচ্চাটাকে কোলে তুলে নিয়ে চলে গেল।

একটু বিস্মিত হয়েছেন কমলবাবু। রসিকপুরের যে ভাঙ্গা-বাড়ির ছায়ার কাছে কোন ভদ্রলোক আসে না, সেই বাড়িরই ফাটল-ধরা বারান্দার উপর এসে বসে আছে এক অল্প বয়সের ভদ্রলোক। ছেলেটিকে সত্যিই ভদ্রলোক বলে মনে হয়। কেতকীর নামটা বলতে পারেনি, কিন্তু কথা শুনে বোঝা গেল, কেতকীর সঙ্গেই দেখা করতে চায়। 'বেবির মা' বললে কেতকী ছাড়া আর কা'কেই বা বোঝাবে?

দেখতেও ভালই ছেলেটি। নাম হলো নির্মল, রেলওয়ে হিসাব বিভাগে অডিটরের কাজ করে। কিন্তু বড় বিমর্ষ বলে মনে হয়, নইলে অমন ভয়ে-ভয়ে কথা বললো কেন, এবং কথা বলতে গিয়ে মাথাই বা হেঁট ক'রে রইল কেন?

—একটি ছেলে তোমার সঙ্গে দেখা করতে চায় কেতকী। অনেকক্ষণ হলো এসে বসে আছে।

সুধাময়ী এসে খবর দিতেই কেতকীর হাতের চিরুনি যেন হঠাৎ কেঁপে উঠে চুলের সঙ্গে ফেঁসে যায়। আয়নাতে নিজের মুখের ছবিটাকে দেখতে পেয়ে চোখ দুটোও হঠাৎ লজ্জায় চমকে ওঠে। কালো কুৎসিত মুখটা আবার এভাবে রাঙা হয়ে উঠতে চেষ্টা করে কেন? বুকটাও ভয়ে দুরুদুরু করে কেন? বুঝতে পারে কেতকী, নিজের বুকটাকেই আজ ভয় করতে হচ্ছে।

ভাবতে ভুল করেনি কেতকী। ঘরের বাইরে এসেই দেখতে পায়, সেই ভদ্রলোক, রেলওয়ের সেই নির্মল এসে বসে আছে। কিন্তু কি ভয়ানক গম্ভীর হয়ে গিয়েছে নির্মলের মুখ? বেবিকে কোলের উপর বসিয়ে শরীর এলিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল যে মানুষটা, তার মুখটা যে সেই ঘুমের মধ্যেও হাসছিল।

নির্মলের কাছে এগিয়ে এসে দাঁড়ায় কেতকী। যদি বুঝতে পারতো কেতকী, ওর বড়-বড় চোখের তারা দুটো হঠাৎ বড় বেশি স্নিগ্ধ হয়ে গিয়েছে, তবে বোধ হয় নির্মলের এত কাছে এসে দাঁড়াতে পারতো না। অনেক দিনের অন্তরঙ্গ আপন-জন না হলে কোন মেয়ের পক্ষে কোন পুরুষের এত কাছে এসে এত সহজে হাসিভরা মুখ তুলে তাকিয়ে থাকাও সম্ভব হতে পারে না।

কেতকী বলে—আপনি কেন এসেছেন বুঝতে পারছি।

নির্মল—জানি না, আপনি কি বুঝতে পেরেছেন। কিন্তু আমি মাপ চাইতে এসেছি।

কেতকীর চোখের হাসি যেন হঠাৎ ব্যথিত হয়ে গম্ভীর হয়ে যায়।—আপনি মাপ চাইছেন কেন?

নির্মল—লোকের মুখ থেকে শোনা একটা বাজে কথা আপনার কাছে বলা আমার খুবই অন্যায় হয়েছে।

কেতকী—বাজে কথা কেন বলছেন?

নির্মল—নিশ্চয় বাজে কথা। অবিশ্বাস্য, নিরেট মিথ্যে কথা।

কেতকী হাসে—এ ধারণা আপনার কেমন ক'রে হলো?

নির্মল—আমাকে খুব বেশি বোকা মনে করবেন না।

কেতকী—এরই মধ্যে এমন কি প্রমাণ পেয়ে গেলেন যে ওরকম ধারণা করে ফেললেন?

নির্মল—প্রমাণ আপনি।

কেতকীর বাচাল প্রশ্নটাই যেন হঠাৎ চমকে ওঠে। এবং আবার প্রশ্ন করতে গিয়ে কেতকীর মুখের ভাষাও এলোমেলো হয়ে যায়।—আমার মধ্যেই বা কি দেখে···।

নির্মলের এতক্ষণের মন-মরা ভাষার মৃদুতাও হঠাৎ দুঃসাহসী হয়ে একেবারে প্রচণ্ড স্পষ্ট ভাষায় প্রায় চেঁচিয়ে ওঠে।—আপনার মুখ দেখে।

ভ্রূকুটি ক'রে তাকায় কেতকী—আপনি খুব বেশি ভদ্রতা ক'রে খুব বেশি মিথ্যে কথা বলছেন।

নির্মলের চোখ দুটোও হঠাৎ শিউরে একটু কঠোর হয়ে যায়।—না, আপনি অকারণে সন্দেহ করছেন।

কেতকী—কি দেখলেন আমার মুখের মধ্যে?

নির্মল—অহংকার।

কেতকী—কি বললেন?

নির্মল—ভাল ক'রে কথা বলতে জানি না বলেই ওকথাটা বললাম। কিছু মনে করবেন না। যার চোখ আছে সে তো আপনার মুখ দেখেই বুঝে ফেলবে যে, এ মানুষ মরতে রাজি হবে তবু জীবনের সম্মান খোয়াবে না। যাই হোক···।

কেতকী যেন জোর ক'রে তার বুকের ভিতরে একটা কান্নার স্বর চেপে রাখবার চেষ্টা করছে, গলার স্বরটা তাই ভেঙ্গে যায়।—কি বলছিলেন বলুন?

নির্মল হাসে—তা হ'লে বলুন মাপ ক'রে দিয়েছেন। আর, আপনার বেবিকে একবার আমার সামনে নিয়ে আস্থন ?

কেতকী—কেন ?

নির্মল—আমি বদলি চেয়ে আবার উপরওয়ালাকে চিঠি দিয়েছি। এখানে বড় জোর আর দুটি দিন আছি। বেবিটাকে একটু দেখে যাই।

কেতকী হাসে—বদলি চেয়েছেন কেন বলুন তো? বেবিকে আর আপনার কাছে যেতে দেব না, এই ভয় করছেন ?

নির্মল—না…ঠিক ভয় নয়…তবে কি না…আমি সত্যিই একটু বাড়াবাড়ি ক'রে ফেলেছি।

কেতকী মাথা হেট করে।—একটুও বাড়াবাড়ি করেন নি। আপনি বদলি নেবেন না।

নির্মলের চোখের বিস্ময় যেন একটা সান্ত্বনার ছায়ায় নিবিড় হয়ে ওঠে।—কি বললেন ?

কেতকী—বেবি ঠিক সময় মত রোজই আপনার কাছে যাবে। আপনার সন্ধ্যাবেলার খেলা বন্ধ করতে হবে না। বেবিকে যত খুশি পাউডার মাখাবেন, কেউ আপনাকে বাধা দেবে না।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় নির্মল, আর খুব জোরে একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে যেন মনের গুমোট হালকা ক'রে নেয়। এবং হঠাৎ খুশির আবেগে আবার হাসতে হাসতে বলে—ধন্যবাদ।

কেতকী—চা খেয়ে যান।

নির্মল—কোথায় চা ?

কেতকী—এখনি আনছি।

এই সেই রসিকপুরের রাজবাড়ি, যে বাড়ির নামে ভুতুড়ে গল্পের চেয়েও অবিশ্বাস্য অথচ কুৎসিত এক একটা গল্প কত লোকের মুখেই না শুনেছে নির্মল। কেতকী চা আনতে ঘরের ভিতরে গিয়েছে। চারদিকে চোখ ঘুরিয়ে দেখতে থাকে নির্মল। সত্যিই, বাড়িটার

এই বিধ্বস্ত চেহারার মধ্যে কেমন একটা ভয়াল ভাব আছে! কিন্তু এই ভয়ালতা যেন একটি মানুষের মুখের দিকে তাকিয়ে স্নিগ্ধ হয়ে রয়েছে। এই মাত্র চা আনতে চলে গেল যে মানুষটা, তারই মুখ।

চা নিয়ে আসে কেতকী। নির্মল বলে—একেবারে আপন-জনের মত খাতির ক'রে চা খাওয়াচ্ছেন, কিন্তু আপনার নামটা তো এখনও আমি জানি না।

—কেতকী।

—তাই বলুন। অনর্থক একটা কথা বলে ফেলেই লজ্জিতভাবে তাকিয়ে থাকে নির্মল। কেতকী হেসে ফেলে—কি বললেন?

নির্মল—তার মানে, এই রকমই একটা নাম আশা করেছিলাম।

গম্ভীর হয় কেতকী। নির্মলও কোন কথা না বলে চা খাওয়া শেষ করে।

নাম শোনার আশা মিটে গিয়েছে। এখন আর একবার হেসে বিদায় নিয়ে চলে গেলেই তো পারে নির্মল। কিন্তু যাবার জন্যে উঠে দাঁড়ালেও কে জানে আরও কি জানবার আশা ক'রে কেতকীর মুখের দিকে তাকায়।

মুখে ভাষা নেই, শুধু দু' চোখে একটা অদ্ভুত আকুলতার বোবা প্রশ্ন, এমন মানুষের মুখের দিকে কেতকীই বা কতক্ষণ তাকিয়ে থাকতে পারে? অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে শাড়ির আঁচল তুলে কেতকীও তার গম্ভীর চোখের অদ্ভুত একটা উষ্ণতার মায়া মুছে ফেলতে চেষ্টা করে।

নির্মল বলে—আপনার সঙ্গে কি আর দেখা হতে পারে না?

কেতকী—পারে, কিন্তু কেন?

—দেখতে ইচ্ছে করে।

—আমাকে?

—হ্যাঁ।

—কেন?

—দেখতে ভাল লাগবে বলে।

—কেমন ক'রে জানলেন ?

—ভাবতে ভাল লেগেছে, তাই ?

—কবে ভাবলেন ?

—কাল, সারারাত।

—কি ভাল লাগলো ?

—সব।

চন্দননগরের সাধনবাবুর বাড়ির ফটকে লতাপাতা দিয়ে একটা তোরণ করা হয়েছিল, এবং তোরণের মাঝখানে বাঁশের ফ্রেম আর হরেক রকমের রঙীন ফুল দিয়ে তৈরী মস্ত বড় একটা প্রজাপতিকে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তাই পথের লোক শুধু সন্দেহ করেছিল আজ বোধ হয় একটা বিয়ের ব্যাপার আছে এই বাড়িতে। ভিড় ছিল না, শাঁখ-শানাই-এর মুখরতা ছিল না। লুচি ভাজার গন্ধেও বাতাস থমথম করেনি।

সন্ধ্যা হতেই বিয়ের ব্যাপারটা একরকম হাসাহাসির মধ্যেই শেষ হয়ে গেল। রেজিষ্ট্রার মশাই তাঁর রেজিষ্টার খাতাটা এগিয়ে দিতেই হেসে উঠে মুখে রুমাল চাপা দেয় কাজরী। সই করতে গিয়েও হাসে। অতীনেরও সেই দশা; এবং সাক্ষী হয়ে সই করলো যারা, সেই জীমূত রায় আর গাঙ্গুলীও হেসে ওঠে। সব চেয়ে আগে মস্ত বড় একটা ফুলের স্তবক কেতকীকে উপহার দিলো যে, সেই অসিত দত্তও হাসতে থাকে।

চন্দননগরের সেই শুভরাত্রির শেষ তারা নিভে গেল যখন, তখনও চোখে ঘুম আনতে পারেনি অতীন। কিন্তু অঘোর ঘুমে অসাড় হয়ে পড়েছিল কাজরী। আজ কত রকমের কথা মনে আসছে অতীনের, এবং কাজরীকেও কত কথাই না বলবার ছিল

কিন্তু বলবার সুযোগ পায়নি অতীন। সেই যে, অতীনের দু'হাতের বাঁধন থেকে শ্রান্ত দেহটাকে আলগা ক'রে নিয়ে সরে গেল কাজরী, তখন থেকেই বালিশ জড়িয়ে কাজরী যেন গভীর ঘুমের সুখের সঙ্গে আপন হয়ে পড়ে আছে।

অতীনের চোখ দুটোও ঘুমন্ত কাজরীকে দেখবার সুযোগ এই প্রথম পেয়েছে। দু'চোখ ভরে দেখেও অতীন। হ্যাঁ, দেখতে একটু নতুন লাগে বৈকি। কাজরীর মুখের হাসিটা ঘুমিয়ে পড়েছে, এবং হাসির ভঙ্গীটা মরেই গিয়েছে মনে হয়। শিথিল ঠোঁটের ফাঁকে দাঁতের সারিটা দেখা যায়, নেহাতই কতগুলি দাঁতের সারি। কাজরী কথা বললেই চিবুকের দু'পাশে দুটি সুন্দর খাঁজ পড়ে, তখন চিবুক-টাও হাসছে বলে মনে হয়। চোখে পড়ে অতীনের, কাজরীর চিবু-কের দু'পাশের হাড় দুটো কেমন উঁচু উঁচু। নিঃশ্বাসের টানে কাজরীর সেই ভরাট মুখটাই মাঝে মাঝে গালভাঙ্গা একটা রোগাটে মুখ হয়ে কাঁপছে।

এই নতুন জীবন কেমন লাগছে কাজরী? এই কথাটাই বলতে চেয়েছিল অতীন। কিন্তু বলবার সুযোগ পেল সকাল হয়ে যাবারও অনেকক্ষণ পরে, যখন প্রায় দুপুর, ক্যামাক ষ্ট্রীটের বড় বড় জারুল গাছের ছায়া যখন বৈশাখী বাতাসে ছটফট করতে শুরু করেছে।

চন্দননগর থেকে মোটর করে সোজা কলকাতার ক্যামাক ষ্ট্রীটের জারুলের ছায়ার কাছে নেমে পড়বার পর, ফ্ল্যাটের ভিতরে ঢুকে বারান্দাতে পা দিয়েই কাজরীর হাত ধরে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে অতীন। তার পরেই প্রশ্ন করে—এ জীবন তোমার বোধ হয় খুবই নতুন লাগছে কাজরী।

কাজরী হাসে—জীবনটা কি আর এমন নতুন হলো যে নতুন লাগবে?

অতীন—তার মানে?

কাজরী—তুমি কি এই প্রথম আমার হাত ধরলে যে নতুন লাগবে? আমরা যা ছিলাম তাই আছি অতীন।

অতীন গম্ভীর হয়—তাহ'লে বেশ পুরনো লাগবে বল?

কাজরী—তাই বা কেন লাগবে? আমরা সব সময়েই নতুন।

কথাটা বোধ হয় ঠিকই বলেছে কাজরী, ভাবতে গিয়ে অতীনের মুখের এই ক্ষণিক গম্ভীরতা হঠাৎ মুছে যায়, এবং অতীনও আবার জ্বলজ্বলে হাসির আভায় মুখ রাঙিয়ে নিয়ে, কাজরীর ফুল্ল চেহারার কোমরটাকে একটি হাতের আদুরে বন্ধনে বন্দী ক'রে সোফার দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। নতুন নয়; এই ভঙ্গী, এই বন্ধন, এই ছোঁয়া-ছুঁয়ির উৎসব দু'জনের জীবনে নতুন কিছু নয়। কিন্তু পুরনো বলেও তো মনে হয় না। এই তো চির-নতুন হয়ে থাকা জীবন। কাজরীর চোখে সেই প্রথম সন্ধ্যার প্রথম বিদ্যুৎ ঠিক সেইরকমই ঝিলিক দিয়ে হাসছে। একটুও পুরনো হয়ে যায়নি কাজরীর প্রাণ আর কাজরীর ভালবাসার আকুলতা।

ক্যামাক ষ্ট্রীটের এই নতুন বিলডিংএর এই ফ্ল্যাটও অতীন আর কাজরীর জীবনের সেই আনন্দের নীড় হয়ে ওঠে, যে আনন্দ চিরন্তন ক'রে রাখবার জন্য ওদের প্রাণ একটা ক্লান্তিহীন চেষ্টার সাধনা ক'রে এসেছে। ওদিকে কয়লাঘাটের জাহাজ অফিসের চাকরি, আর এদিকে পার্ক ষ্ট্রীটের অটোমোবিল শো-রুমের চাকরি; দিন-মানের দু'টি ব্যস্ততা শুধু ওদের দু'জনকে দু'দিকে সরিয়ে দিয়ে কয়েক ঘণ্টার মত বিচ্ছিন্ন ক'রে রাখে। কিন্তু সন্ধ্যার পর, এবং কখনও বা সন্ধ্যা হতেই কাজরী বিশ্বাস আর অতীন বিশ্বাস যেন প্রতিদিনের এই কয়েকঘণ্টার অদেখার উপর প্রতিশোধ তুলে তৃপ্ত হয়ে যায়। সব সময়েই নতুন লাগে, এহেন নতুন জীবনের তিনটে মাসও ফুরিয়ে যায়।

কাজরীর কাজের ছুটি হয় পাঁচটার একটু আগে, এবং অতীনের ছুটি পাঁচটার অনেক পরে। কোনদিন ছ'টা, কোনদিন সাতটা বা

আটটা। কাজের জীবনের ব্যস্ততা থেকে ছুটি পেয়ে প্রায় ছুটে ছুটে এই ফ্ল্যাটের নীড়ে ফিরে আসে অতীন। গলার টাই খুলতে খুলতে কাজরীর কাছে এসে অতীন দাঁড়াতেই হেসে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে কাজরীর মুখ। তার পরেই হাসিটা যেন হঠাৎ অভিমানের বেদনায় থমথম করতে থাকে! গনগন ক'রে জ্বলতে থাকে কাজরীর চোখের আভা। অতীনের বুকের কাছে মাথাটা এলিয়ে দেয় কাজরী, জীবনের যত ছটফটে নিঃশ্বাসের ভার অতীনের বুকের উপর লুটিয়ে দিতে চায়। কথা বলে কাজরী। সেই একই কথা, যে-কথা এই তিন মাসের দাম্পত্যের জীবনে রোজই শুনে এসেছে অতীন।

—এখনও এভাবে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকতে তোমার কি একটুও কষ্ট হচ্ছে না অতীন?

অতীনও ভুলে যায় যে, এখন হাত-মুখ ধুতে হবে এবং এক পেয়ালা চা খাওয়া উচিত। কিন্তু না, দরকার নেই। ওসবের চেয়ে কাজরীর চোখের ঐ আশা এবং কাজরীর ভাষার ঐ অভিমান অনেক অনেক দামী, অনেক মায়াময়, অনেক আনন্দের অঙ্গীকার।

ঘরের ভিতরে চলে যায় অতীন আর কাজরী। বড় সুন্দর একটি নিভৃত এই ঘর। দরজা বন্ধ করবার দরকার হয় না। দরজার পর্দাটাই যথেষ্ট।

এই ফ্ল্যাটের জীবনের আরও কতগুলি দরকারের কাজ অবশ্যই আছে, কিন্তু সে-সব কাজের দায় নিয়ে ব্যস্ত হবার মত একটা চাকরও আছে। রাতের রান্নাটা সন্ধ্যার আগেই সেরে রাখে চাকর ভাগবত, এবং কাজরী অফিস থেকে ফিরে এলেই ভাগবতের ছুটি হয়ে যায়। সকাল সাতটায় এসে আবার যখন দরজার কড়া নাড়ে ভাগবত, তখন কাজরী বিছানার উপর বসে একমনে খবরের কাগজ পড়লেও, অতীনকে একটু ব্যস্ত হয়ে থাকতে হয়। ভাগবতের অপেক্ষায় না থেকে নিজের হাতেই ষ্টোভ ধরিয়ে চা তৈরী করে অতীন।

খবরের কাগজের উপরেই চোখ রেখে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে কাজরী যখন আনমনার মত বলে ওঠে, চা-এ চিনি নেই দেখছি ; তখন অতীনই চামচ ভরে চিনি নিয়ে কাজরীর পেয়ালায় ঢেলে দেয়।

সারা সকালটা, যতক্ষণ না অফিসে যায় কাজরী, ততক্ষণ এই-ভাবেই যেন সম্পূর্ণ ভিন্ন একটা প্রাণ ও একেবারে অন্য একটা মন হয়ে, যেন আর একটা স্বপ্নের মধ্যে পড়ে থাকে কিংবা কাজ করে কাজরী। চিঠি লেখে। বড় বড় ছবির অ্যালবাম কোলের উপর রেখে দু'চোখের গভীর আগ্রহ যেন উপুড় ক'রে দিয়ে হাসতে থাকে কাজরী। সাদা সিল্কের তোয়ালের উপর রঙীন সুতো দিয়ে পৃথিবীর নানা রূপের নানা বিচিত্রতার ডিজাইন আঁকে ; মানস সরোবর আর মরাল, কিংবা শালবনের ঝড়, অথবা কদমের ছায়ায় ঝুমুর নাচের আসর।

এখানে, কাজরী বিশ্বাসের এই সব স্বপ্নের সঙ্গে অতীন বিশ্বাসের কোন সম্পর্ক নেই। এই সময়টা অতীন বিশ্বাসও বারান্দায় চেয়ারে বসে নীরব মুখ আর অচঞ্চল চেহারাটা নিয়ে শুধু সিগারেট খেয়েই পার ক'রে দেয়। অতীনের কাছে আসবার, কিংবা কোন কথা বলবারও দরকার হয় না কাজরীর। এবং এক এক সময় সত্যিই অতীনের দিকে কাজরীর চোখ পড়লেও বোঝা যায় না, সে চোখে কোন প্রশ্ন আছে কি না। অচেনা মানুষের মুখের দিকেও এতটা অনুৎসুক দৃষ্টি নিয়ে কেউ তাকায় না।

—কি, চিনতে পারছো তো ? ঠাট্টার সুরে হেসে হেসে প্রশ্ন করে অতীন।

—অ্যাঁ, কি বললে ? কাজরীর প্রশ্ন শুনেই বুঝতে পারে অতীন, তার ঠাট্টাকেও ভাল ক'রে শুনতে পায়নি কাজরী।

ক্যামাক ষ্ট্রীটের জারুল গাছের পাতার ভার ভিজিয়ে দিয়ে খুব জোর বৃষ্টিটা যেদিন সন্ধ্যার আগেই থেমে গেল, সেই দিনটা

ছিল রবিবার। কাজরীও কাজ সেরে নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে বারান্দায় দাঁড়িয়ে বাইরের বৃষ্টির ঐ প্রবল উৎপাতের দিকে যেন ভ্রূকুটি ক'রে তাকিয়ে রইল। তারপর বৃষ্টি থামতেই উৎফুল্ল হয়ে চেঁচিয়ে ওঠে কাজরী—আঃ, বাঁচা গেল?

অতীন—তুমি কি বাইরে বের হতে চাও?

কাজরী—মোটেই না। ওরাই আসছে। আজ আমার অদৃষ্টে অজস্র ধমক আছে।

অতীন—কি ব্যাপার?

কাজরী—আবার একটা ছবির এগজিবিশনের ভার নিয়েছি। তাই আলোচনা আছে। অসিত আসবে; তা ছাড়া জীমূত আর গাঙ্গুলীরও আসবার কথা আছে।

অতীনের চোখ দুটো কেমন ক'রে তাকিয়ে কতখানি আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছে তা'ও বোধ হয় দেখতে পায় না কাজরী। নিজেরই মনের একটা উৎফুল্ল আবেগের টানে হেসে হেসে মুখর হয়ে ওঠে কাজরী।—তোমাকে অবিশ্যি এর জন্য কোন দুশ্চিন্তা করতে হবে না অতীন; তোমাকে কোন ঝঞ্ঝাট ভুগতে হবে না। ওসব আলোচনার মধ্যে মাথা না গলিয়ে তুমি বরং একটু বেড়িয়ে আসতে পার।

হ্যাঁ, নতুন লাগছে কাজরীকে, একেবারে অন্যরকমের নতুন। কাজরীর যে এরকম একটা ছবিময় এগজিবিশনের জীবন আছে, সেটা ভুলেই গিয়েছিল অতীন। কিন্তু···মনে পড়ে অতীনের, কাজরীও যে একদিন নিজের মুখেই বলেছিল, তোমাকে পেয়ে ওসব সাধ ভুলেই গিয়েছি, ছেড়েই দিয়েছি অতীন।

কাজরী বলে—অসিতের কথা তো তুমি আগেই শুনেছ।

—হ্যাঁ।

—ওরকম মহৎ মনের মানুষ হয় না অতীন। টাকা অনেকেরই

থাকে, কিন্তু ক'জন মানুষ বিনা স্বার্থে পরের উপকারের জন্য অবাধে টাকা ছড়িয়ে দিতে পারে বল?

—হ্যাঁ, শুনেছি, তিনি তোমাদের অনেক উপকার করেছেন।

—আজও করছেন। আর একটা কথা···সেটা বোধ হয় তোমাকে বলা হয়নি।

একটু চুপ ক'রে থেকে কাজরী আবার উৎসাহিত ভাবে বলে—পাশের ফ্ল্যাটটাও ভাড়া নিয়েছি।

—সে কি? কি দরকার? প্রশ্ন করতে গিয়েই অতীনের চোখের ভঙ্গী বিরক্ত হয়ে ওঠে।

চেঁচিয়ে হেসে ওঠে কাজরী—অসিতের সাধ। কার সাধ্যি ওকে বাধা দেবে বল? অন্তত আমার তো সে সাধ্যি নেই। ঐ ফ্ল্যাটের এক বছরের ভাড়া আগাম দিয়ে দিয়েছে অসিত। প্রতিজ্ঞা করেছে, নিজে এসে ঐ ফ্ল্যাটে নিজের মনের মত ক'রে বেস্ট ফার্নিচারে সাজিয়ে দেবে। আমাদের এভাবে ক্ষুদ্র হয়ে থাকতে দিতে রাজি নয় অসিত।

কাজরীর মুখ থেকে যেন নতুন প্রলাপের ধারা ঝড়ে পড়ছে। স্তব্ধ হয়ে বসে শুনতে থাকে অতীন। যেন অনেক দিনের অঘোর ঘুমের পর ভয়ানক ভাবে জেগে উঠেছে কাজরী। অতীন ছাড়া এই পৃথিবীতে অন্য মানুষও আছে, এবং কাজরীর কাছে শ্রদ্ধা পায় এমন মানুষেরও অভাব নেই। কাজরীর এই অনর্গল প্রলাপ যেন ওরই জীবনের এক অনর্গল কৃতজ্ঞতার ইতিহাস। মনের আবেগে মুখ খুলে কাজরী আজ কত নতুন কথাই না শুনিয়ে দিচ্ছে। জীমূত যার নাম, সে-ও সাধারণ মানুষ নয়। গ্রেট আর্ট সোসাইটির সেক্রেটারী হয়ে কাজরী যে এত বড় একটা প্রেসটিজ পেয়েছে, সে তো জীমূতেরই চেষ্টার ফল। সোসাইটির প্রায় সব মেম্বারদের ভোট কাজরীর জন্য আদায় করা যে-সে মানুষের সাধ্য নয়। আর্টের বিষয় নিয়ে কী সুন্দর আলোচনা করতে পারে জীমূত! আর, গাঙ্গুলীই

বা কি কম ? কাজরীর এত বড় একটা লাইফ স্কেচ, কাজরীর সুন্দর ছবির সঙ্গে অত বড় পত্রিকাতে ছাপিয়ে দিয়ে কাজরীকে লোকের চোখে অসাধারণী ক'রে তুলেছে যে, সে তো ঐ গাঙ্গুলী ; মস্ত বড় জার্নালিস্ট, চারটে মার্কিন পত্রিকার স্পেশ্যাল করেসপণ্ডেন্ট। কলকাতার এলিটদের কোন ককটেল পার্টির উৎসব ফুর্তিময় হয়ে ওঠে না, যদি গাঙ্গুলী সেখানে না থাকে। চমৎকার গল্প করতে পারে গাঙ্গুলী।

ছটফট ক'রে চেঁচিয়ে হেসে ওঠে কাজরী—গাঙ্গুলীর কাছে বসে পাঁচ মিনিট ওর গল্প শুনলে তোমারও হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে যাবে।

হঠাৎ উঠে দাঁড়ায় অতীন। কাজরীর মুখের দিকে তাকায়। কাজরী বলে—হঠাৎ আবার কি ভাবতে আরম্ভ করলে ?

অতীন—ভাবছি, এখনি একবার বাইরে যেতে হবে।

কাজরী—তাই ভাল।

অতীন হাসে—হ্যাঁ, তোমার শ্রদ্ধার মানুষ, কৃতজ্ঞতার মানুষ, হাসিয়ে পেটে খিল ধরিয়ে দেবার মানুষ যেখানে এসে ভিড় করবে, সেখানে আমি থেকে কি আর করবো বল ? আমি তো···।

কাজরী—কি ?

অতীনের মুখের হাসিটা যেন দপ ক'রে জ্বলে ওঠে—আমি হলাম শুধু তোমার ভালবাসার মানুষ।

কাজরী—নিশ্চয়, সে কি আর বলতে হয় ?

দরজাটার কাছে একবার শুধু কিছুক্ষণ থমকে দাঁড়িয়ে থাকে অতীন। তারপরেই দরজা খুলে এবং দরজাটা খোলা রেখেই আস্তে আস্তে সিঁড়ি ধরে নেমে যায়।

চমকে উঠে আতঙ্কিত স্বরে অতীন বলে—না না না, কোন দরকার নেই, যেও না কাজরী।

কাজরী আশ্চর্য হয়ে বলে—কি বলছো তুমি?

অনেক আপত্তি করে অতীন, কাজরীর হাত ধরে অনুরোধও করে, বলতে বলতে গলার স্বরটা প্রায় ফুঁপিয়েও ওঠে, কিন্তু কাজরী ছোট্ট একটি মিষ্টি ভ্রূকুটি হেনে অতীনের এই কাণ্ডটাকেই একেবারে স্তব্ধ করে দেয়।

সমস্যা হলো কাজরীর শরীরের একটা সমস্যা। কাজরী আবার বলে—এত আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছ কেন অতীন?

কোন কথা বলে না অতীন। কাজরীই বলে—ভাগ্যিস বিজয়াটা ডাক্তার হয়েছিল, নইলে লজ্জার মাথা খেয়ে পুরুষ ডাক্তারের সাহায্য নিতে হতো।

কাজরীর বান্ধবী যে বিজয়া, সেই বিজয়াই ডাক্তার হয়েছে। সেই বিজয়ারই কাছে যাবার জন্য তৈরী হয়েছে কাজরী।

এণ্টালি থেকে ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্টের যে নতুন চওড়া রাস্তাটা সোজা পূবে চলে গিয়েছে, সেই রাস্তারই একটি সরু শাখা রাস্তার ধারে লতাবাহারে ঢাকা ছোট একটা একতলা বাড়িতে থাকে বিজয়া। বিজয়ার বাবা আছেন, মা নেই। একমাত্র মেয়ে এবং ছেলে নেই, বিজয়ার বাবা নবগোপাল বাবুর জীবনে কোন উদ্বেগও নেই। বাড়িটা নিজের; তার উপর ভাল পেনশন পান। তার উপর মেয়ে বিজয়াও রোজগেরে মেয়ে। বুড়ো বয়সের দিনগুলি বেশ আনন্দেই পার ক'রে দিচ্ছেন নবগোপাল বাবু। শুধু একটি আক্ষেপ তাঁর এই নিশ্চিন্ত আনন্দের জীবনকে মাঝে মাঝে ব্যথা দেয়। বিয়ে করবে না মেয়েটা। এ-বেলা একটা মেয়ে আশ্রমের এবং ও-বেলা একটা অনাথ শিশু হোমের ভিজিটিং ডাক্তার বিজয়া যেন ওর ঐ দু'শো টাকা মাইনের জীবন নিয়ে একেবারে নিশ্চিন্ত হয়ে পড়ে আছে। এর বেশি আর এক পা'ও এগিয়ে যেতে চায় না বিজয়ার জীবন।

বিজয়ার ছাত্রী-জীবনের প্রিয়তমা বান্ধবী কাজরীও জানে,

বিয়ে করবে না বিজয়া। বিয়ে করবার কোন ইচ্ছাই নেই। বিয়ে করতে ইচ্ছেই হয় না। অদ্ভুত রকমের একটা শুকনো ও ঠাণ্ডা ক্যারেক্টার। জীবনে কোন দিন কোন পুরুষ মানুষের হাত ছুঁতে হবে, ভাবতেও শিউরে ওঠে বিজয়া। বিজয়া নিজেই কাজরীর কাছে হেসে হেসে একেবারে স্পষ্ট ক'রে কতবার বলেই দিয়েছে—তোর হাতটা ধরতে তবু লোভ হয়; কিন্তু···সত্যিই বিশ্বাস কর কাজি, কোন ভদ্রলোকের হাত ধরতে···ইস্, ভাবলেও গা ঘিন ঘিন করে।

অতীনের মুখের দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে আক্ষেপ করে কাজরী।—বিজয়াটা একটা অদ্ভুত ইয়ে।

—কি বললে? প্রশ্ন করে অতীন।

—বিজয়াটা যেন বুঝতেই পারে না যে, ও একটা মেয়েমানুষ।

—তার মানে?

—পুরুষের ওপর ভয়ানক ঘেন্না। নিজেই বলে; হোমের বাচ্চা মেয়েগুলিকে কোলে নিতেও ওর খারাপ লাগে না; কিন্তু বাচ্ছা ছেলেগুলোকে একটু ছুঁতেও ইচ্ছে করে না।

—একেবারে আইডিয়্যাল মেয়েমানুষ! কথাটা তিক্তস্বরে বলে ফেলেই অন্য দিকে মুখ ফেরায় অতীন।

কাজরীও ব্যস্ত হয়ে বলে—আচ্ছা, আমি চলি এবার।

আবার চমকে ওঠে অতীন—কোথায় যাবে?

কাজরী—কি আশ্চর্য! কতবার বলবো? বিজয়ার কাছে যাচ্ছি। আমি দু'দিন ছুটি নিয়েছি।

অতীন—ছুটি নিয়েছ ভালই করেছ, কিন্তু বিজয়ার কাছে গিয়ে বিশ্রী কাণ্ডটা না করলেই ভাল ছিল কাজরী।

কাজরী—ছিঃ, কি যে বল!

হঠাৎ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে অতীনের বিমূঢ় ও অলস চোখের শ্রান্ত দৃষ্টিটা—এর মধ্যে ছিঃ করবার কিছু নেই।

কাজরী—অবশ্যই আছে। তোমার মাথা খারাপ হয়েছে, তাই নিজের জীবনের আনন্দটাকেও আনসেফ ক'রে দিতে তোমার ইচ্ছে হয়েছে। কিন্তু তোমার পাগলামির জন্য আমি তো একটা আবর্জনা পুষে রাখতে পারি না।

—আবর্জনা? অতীনের বুকের ভিতর থেকে প্রশ্নটা যেন কর্কশ বিস্ময় নিয়ে আছাড় খেয়ে পড়ে। কাজরীর মুখের ঐ নির্মম কথাটা অতীনের রক্তের সব উষ্ণতা আর উচ্ছলতাকে অপমানে পঙ্কিল ক'রে দিয়েছে। কিন্তু বুঝতে পারে না কি কাজরী, নির্মম কথাটা যে ওর নিজেরও ঐ এত সুন্দর ক'রে সাজানো-গোছানো যৌবনের অপমান?

কাজরী বলে—কথাটা একটু বেশি স্পষ্ট ক'রে বলেছি, কিন্তু মিথ্যে বলিনি অতীন। আমার জীবনে ও-জিনিস একটা বিশ্রী বিড়ম্বনা ছাড়া আর কি হতে পারে?

অতীন—কিছুই বুঝলাম না কাজরী।

কাজরী—তুমি কি চাও যে আমি এই বয়সেই বুড়ি হয়ে যাই? তুমি কি চাও যে, তোমার কাজরীর চেহারাটার সব ছাঁদ আর সব গড়ন ছন্নছাড়া হয়ে যাক্? তুমি কি চাও যে, আমাদের জীবনটা একটা নার্সারি হয়ে উঠুক।

শুনতে গিয়ে বোধহয় অতীনের কানে জ্বালা ধরে যাচ্ছে। রুমাল দিয়ে আস্তে আস্তে কপাল আর কান দু'টোকে মুছতে থাকে অতীন। কিন্তু কাজরী তার মনের অবাধ অভিযোগের আবেগে বলতেই থাকে।—আমি কি চাকরি খোয়াবো? সোসাইটির এত বড় একটা কাজের দায় ছেড়ে দিয়ে আঁতুড় ঘরে গিয়ে ঢুকবো? গবর্নমেণ্টের কালচারাল ডেলিগেশনের মেম্বার হয়ে একবার বিদেশে ঘুরে আসবার অনুরোধ পেয়েছি, সেটাও কি তুচ্ছ করবো?

একটু চুপ ক'রে থেকে তার পরেই জোরে নিঃশ্বাস ছাড়ে কাজরী, নিঃশ্বাসের শব্দটাও রুষ্ট আক্ষেপের মত।—এই জন্যে

তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়নি অতীন, আর, এরকম একটা দশা জীবনে আনবার জন্যও তোমাকে আমি ভালবাসিনি।

অস্বীকার করতে পারে না অতীন, তাই উত্তরও দিতে পারে না। কেন ভালবেসেছিল কাজরী এবং আজও ভালবাসে, এই প্রশ্নের উত্তর অতীন আজ তার এই সুন্দর চেহারার একটা তৃপ্তিহীন ক্লান্তির মধ্যেই পেয়ে গিয়েছে। আজও, এই তো কিছুক্ষণ আগে, বিজয়ার কাছে যাবার জন্য তৈরী হবার আগে, মেঘে ঢাকা দুপুরের রোদটা হঠাৎ মেঘ ছিঁড়ে ঠিকরে বের হয়ে ছড়িয়ে পড়লো যখন, তখন চেয়ার ছেড়ে উঠে এসে আর হেসে হেসে অতীনের গলা জড়িয়ে ধরেছিল কাজরী ; এবং অতীনের গলা ছাড়েওনি কাজরী, যতক্ষণ না কাজরীর চোখের সেই বিহ্বল ইচ্ছার বেদনা শান্ত হয়েছিল। কাজরীর জীবনের শুধু এই একটি প্রয়োজনের আহ্বানে সাড়া দেবার জন্য এবং ইঙ্গিত মাত্র উৎসর্গ হয়ে যাবার জন্য অতীনের এই সুন্দর চেহারাটা কাজরীর কাছে পড়ে থাকবে, এই তো ছিল কাজরীর ভালবাসার দাবি।

কিন্তু কি ভয়ানক দাবি! অতীনের স্নায়ু মজ্জা আর পেশীগুলি যেন কাজরীর কটাক্ষে ক্রীতদাসের খাটুনি খাটছে। কাজরীর স্বামী হলো একটা যান্ত্রিক পৌরুষ। কাজরীর মুখের ঐ গনগনে আভার রক্তিমতা শান্ত করা যার জীবনের একমাত্র কর্তব্য তার বেশি কিছু নয়। এক বিন্দু শ্রদ্ধারও আস্পদ নয়। ভাবতে গিয়ে রুমাল দিয়ে নিজের কপালটাকে যেন খিঁমচে ধরে অতীন। মনে প্রাণে আজ নিজের এই শরীরটাকে ঘেন্না করে আর একেবারে ছাই ক'রে দিতে ইচ্ছা করে।

—চললাম। বলতে বলতে অতীনের কাছে এগিয়ে এসে, আর গম্ভীর মুখটাকে সুস্মিত ক'রে আদুরে ঠাট্টার ভঙ্গীতে অতীনের গলা জড়িয়ে ধরে কাজরী।...কিচ্ছু ভেব না, সন্ধ্যা হবার আগেই ফিরে আসবো।

বিদায় নেবার আগে অতীনের চোখের কাছে হেসে হেসে হুলে উঠছে কাজরী। শাণিত ইস্পাতের একটা হাস্যোজ্জ্বল পুতুল। স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে শুধু বুঝতে চেষ্টা করে অতীন, কাজরীর এই শরীরেব ভিতরটা কি শুধু শক্ত শক্ত হাড়ে ভরাট হয়ে আছে? রক্ত নেই, নাড়ি নেই, একবিন্দু তপ্ততা, তরলতা আর কোমলতা নেই?

একমনে গভীর আগ্রহ নিয়ে এই ঘরের ভিতরে বেতের মোড়ার উপর বসে একটা ফাইল হাতে নিয়ে চিঠি পড়ছে কাজরী। অজস্র চিঠি এসে জমেছে এই ফাইলের ভিতর। এগজিবিশনের আয়োজন নিয়ে বড় ব্যস্ত হয়ে আছে কাজরীর চিন্তা।

কিন্তু আর বোধ হয় বেশিক্ষণ নয়, সন্ধ্যাটা ঘনিয়ে উঠতে আর বেশি দেরি নেই। অন্তত দু-তিনটি গাড়ি আর কিছুক্ষণ পরেই দুরন্ত উচ্ছ্বাসে ছুটে এসে এই পথের উপর থামবে। হর্ণের মত্ত চিৎকার শুনেই উতলা হয়ে উঠবে কাজরী। হয় এক এক ক'রে নয় একসঙ্গেই কলরবের তুফান তুলে, ক্যামাক ষ্ট্রীটের এই শান্ত সন্ধ্যাটার বুক একেবারে চঞ্চলিত করে এই ফ্ল্যাটের দিকে এগিয়ে আসবে কাজরীর জীবনের শ্রদ্ধা কৃতজ্ঞতা আর পেটে খিল ধরিয়ে দেওয়া হাসির এক একজন আস্পদ।

না, ঠিক এই ফ্ল্যাটের ভিতরে ওরা আসবে না। পাশের ফ্ল্যাটে, যে ফ্ল্যাটকে পাঁচ হাজার টাকার ফার্নিচারে সাজিয়ে দিয়েছে অসিত দত্ত, সেই ফ্ল্যাটের ভিতরে গিয়ে ওরা একটা প্রীতিময় মেলামেশা এবং অজস্র সুন্দর-সুন্দর চিন্তা ও কথার উৎসব হয়ে ফুটে উঠবে। কাজরীও আর এক মুহূর্ত এখানে সময় নষ্ট না ক'রে সেই উৎসবের মধ্যে গিয়ে দাঁড়াবে। হয়তো দু'একবার ফিরে এসে এই ঘরের ভিতরে ছুটোছুটি করবে। কয়েকটা ফাইল, দু'টো জরুরী চিঠি, তিনটে রসিদ বই, টেবিলের উপর থেকে তুলে নিয়ে চলে যাবে।

কিংবা নতুন রকমের পোস্টারের একটা ডিজাইন, বিজ্ঞাপনের প্রুফ আর বিলেতের বিখ্যাত আর্ট ক্রিটিকের প্রশংসাপত্র।

এই ক'মাস ধরে যে নিয়মে চলছে কাজরীর জীবন, আজও সে নিয়মের ব্যতিক্রম হবে না। কিন্তু সেজন্য অতীনের মন আর আক্ষেপ করতে চায় না। পাশের ফ্ল্যাটের প্রতি সন্ধ্যার ঐ প্রীতিময় উৎসবটাকে হিংসে করতেও আর ইচ্ছা করে না। ঠিকই করেছে কাজরী। অতীনের মত স্বামীর কাছে স্ত্রী হবার জন্য যেটুকু সময় লাগে, শুধু সেইটুকু সময় অতীনের কাছে থাকতে চায় কাজরী, তার চেয়ে এক মুহূর্তও বেশি নয়। এবং যখন মানুষ হতে চায়, তখনই মানুষের খোঁজে পাশের ঐ ফ্ল্যাটের মত মানুষী আসরের দিকে ছুটে চলে যায়। কাজরী যে শুধু একটা শরীর নয়, একটা প্রাণও বটে, সে সত্য স্বীকার করতে অতীনের মনে আজ আর কোন ভীরুতা, কোন কুণ্ঠা আর হিংসার বাধা নেই।

কাজরী যেন নিজেকে টুকরো টুকরো ক'রে ভাগ ক'রে দিয়েছে। একটা টুকরো শুধু অতীনের স্বামিত্বের কাছে ছেড়ে দিয়েছে কাজরী; বাকিগুলি সবই ঐ ওদের কাছে, যেখানে শ্রদ্ধা আছে, কৃতজ্ঞতা আছে আর প্রাণভরা খুশির তুফানী হাসি আছে। তবু তো বেঁচে আছে কাজরী। কিন্তু···।

চোখ বন্ধ করে, যেন মনে মনে ছুরি চালিয়ে একটা হেঁয়ালির বুক চিরে দেখতে থাকে অতীন, এ কেমন স্বামিত্ব? কাজরীর মুখের একটা উত্তপ্ত হাসির আভার কাছে অতীনের জীবন শুধু একটা পুরুষ হয়ে পড়ে আছে! কাজরীকে দোষ দিয়ে লাভ কি? কাজরীই তো কতবার অতীনকে অনুরোধ করেছে, বাকি সময়টা ঘরের মধ্যে পড়ে থাক কেন? যাওনা, বাইরে একবার বেড়িয়ে এস। তুমি তো টেনিস খেলতে ভালবাস, তবে সাউথ ক্লাবের মেম্বার হতে দেরি করছো কেন?

কাজরীর মুখটা চোখে পড়বে, বোধ হয় এই ভয়ও ছিল, নইলে

এতক্ষণ চোখ বন্ধ করে বসে থাকবে কেন, এবং চোখ না খুলেই সিগারেট ধরাবে কেন অতীন ?

রুমাল দিয়ে কপাল মুছে, জোরে গলা কেশে, চোখ মেলে তাকায় অতীন, এবং কাজরীর সুন্দর মুখটা চোখে পড়তেই হেসে ফেলে।

কাজরী আশ্চর্য হয়—কি হলো ?

অতীন—কি ?

কাজরী—হঠাৎ হেসে উঠলে কেন ?

অতীন—কাল বিকেলবেলা আমাদের মারোয়াড়ী মালিক মশাই-এর বাচ্চা নাতিটাকে একটা লিচু কিনে দিয়েছিলাম। এক আনা দাম, দেখতে দিব্যি পাকা টুসটুসে একটা মাটির লিচু। লিচুটাকে হাতে নিয়ে একটা কামড় দিয়েই কেঁদে ফেলেছিল বাচ্চাটা।

কাজরী আরও আশ্চর্য হয়—কেন ?

অতীন হাসে—বুঝতে পারলে না ? শাঁস নেই, টেস্ট নেই, মাটির তৈরী একটা লিচু। বাচ্চাটার দাঁতে ভয়ানক ব্যথা লেগেছিল।

হেসে ওঠে কাজরী। হাতের ঘড়ির দিকে তাকায় অতীন। না, আর এই ঘরের ভিতর বসে থাকা উচিত নয়, আটটা প্রায় বাজে ; পাশের ফ্ল্যাটের উৎসবের চিৎকার বেজে ওঠবার আগেই বাইরে চলে যাওয়া ভাল।

জ্বলন্ত সিগারেটের শেষ টুকরোটা ঘরের ভিতরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে যায় অতীন। চেঁচিয়ে ওঠে কাজরী—কি সর্বনাশ, সিগারেটের আগুনটা বিছানার উপর পড়েছে অতীন। চাদরটাও পুড়তে শুরু করেছে।

—ইচ্ছে থাকে তো নিভিয়ে দাও। মুখ ফিরিয়ে তাকিয়ে শুধু দেখতে থাকে অতীন।

—তোমার মাথা খারাপ হলো নাকি? পোড়া বিছানার ধোঁয়ার দিকে তাকিয়ে আতঙ্কিত স্বরে চেঁচিয়ে ওঠে কাজরী। অতীনও হাসতে হাসতে ফিরে এসে জুতোসুদ্ধ পা-এর তিনটে লাথি দিয়ে বিছানার আগুনটাকে থেঁতলে নিভিয়ে দেয়।

ব্যস্তভাবে আবার ঘর ছেড়ে চলে যাবার জন্য দরজার দিকে এগিয়ে যেতে গিয়েই থমকে দাঁড়ায় অতীন। দরজার কাছে এক অপরিচিতা আগন্তুকার মূর্তি।

আগন্তুকার মুখের দিকে তাকিয়ে খুশি হয়ে চেঁচিয়ে ওঠে কাজরী—কী সৌভাগ্য, কী সৌভাগ্য। এ যে দিনে চাঁদ উঠলো দেখছি।

যেমন আগন্তুক তরুণীর মুখটা, তেমনি সাজটা, দুই-ই যেন দুটি চাঁদ-চাঁদ সুন্দর ও ঠাণ্ডা ছবি। তরুণীর মুখটি দেখতে বেশ, কিন্তু যেন নিরম্বু উপবাসে অভ্যস্ত আর জপ-তপ করা একটা শুকনো বৈরাগ্যে মাখা। দেখলে সন্দেহ হয়, মহিলা বোধ হয় বেশ অল্প বয়সে বিধবা হয়েছেন। সাজটাও একেবারে সাদা। ফিনফিনে সাদা ভয়েলের শাড়ি, সাদা লেসের পাড়। জামাটা সাদা। জুতোও তাই। কোথাও কোন রং-এর ছিটেফোঁটাও নেই। শুধু চোখ দুটি কুচকুচে কালো।

তরুণীর কুচকুচে কালো চোখের দৃষ্টিটাই যেন হঠাৎ আহত হয়ে থমকে গিয়েছে। ঘরের ভিতরে অতীনকে দেখে অপ্রস্তুত হয়েছে তরুণী। অতীনের মুখের দিকে চোখ পড়তেই চোখ ফিরিয়ে নেয়।

কাজরী বলে—তোমার কি কোন অসুখ করেছিল? চেহারাটার এরকম দুর্দশা করেছো কেন?

আগন্তুকার চেহারার মধ্যে দুর্দশার কোন চিহ্ন দেখতে পায় না অতীন। হ্যাঁ, চেহারাটা একটু উতলা হয়েছে বলে মনে হয়। শাড়ি পরবার রকমটাই কেমন এলোমেলো। খোঁপাটাকে যেন

অর্ধেক বেঁধে ছেড়ে দিয়েছে। বোঝা যায় না, দরজার কাছে দাঁড়িয়ে সত্যিই কিছু দেখছে এবং শুনছে কিনা এই মহিলা।

কাজরী ডাকে—ওখানে দাঁড়িয়ে কেন? ভেতরে এস।

আস্তে আস্তে হেঁটে ঘরের ভিতরে ঢোকে তরুণী, এবং একটা খালি চেয়ারের কাঁধ ছুঁয়ে চুপ করে আনমানর মত দাঁড়িয়ে থাকে।

কাজরা বলে—প্রতিমাদির কাছে শুনলাম, তুমি নাকি ডাক্তারী ছেড়ে দিয়েছ বিজয়া?

বিজয়া! নামটা যেন একটা সাপিনীর রক্তমাখা মুখের হিস-হিস উল্লাসের শব্দের মত বেজে উঠছে। সেই মুহূর্তে ঘর ছেড়ে চলে যায় অতীন।

কাজরী হাসে—ভদ্রলোককে কিন্তু অভদ্র মনে করো না ভাই। খুব কাজের তাড়া আছে; দুশ্চিন্তাও আছে। তাই এত ব্যস্ত হয়ে চলে গেল।

বিজয়া আনমনার মত বিড়বিড় করে—তা তো যাবেনই।

কাজরী—সত্যিই ডাক্তারী ছেড়ে দিয়েছ?

বিজয়া—হ্যাঁ।

কাজরী হাসে—তা তোমার আর ভাবনা কিসের? বাপের একমাত্র কন্যারত্ন, আর বাবা বেচারার সম্পত্তিও যথেষ্ট।

বিজয়ার গম্ভীর ও বোকা-বোকা মুখটার দিকে তাকিয়ে কাজরী ভ্রূকুটি ক'রে হাসে—তা ছাড়া, তোমার ডাক্তারীর যা ছিরি দেখলাম, ওরকম ভীতুর ডাক্তারী ছেড়ে দেওয়াই ভাল।

বিজয়া—কি? কিসের ছিরি?

কাজরী—সামান্য একটু ট্রিটমেণ্ট করতে হাত কাঁপিয়ে, ঢোঁক গিলে, ঘামে নেয়ে আর কঁকিয়ে কাঁপিয়ে···ছি ছি···কি কাণ্ডই না করেছিলে! আমাকে সেদিন তুমি বড্ড ভুগিয়েছিলে বিজয়া।

বিজয়া—অ্যাঁ? কি বললে? কি হয়েছিল?

কাজরী আশ্চর্য হয়ে হাসে—আমি কি চীনে ভাষায় কথা বলছি যে বুঝতে পারছো না ?

বিজয়া যেন ভয়ে ভয়ে হাসে।—চীনে ভাষা কি খুব শক্ত ?

কাজরী—যাকগে; সত্যি, সেদিন তোমার ওপর খুব রাগ হয়েছিল।

বিজয়া—রাগ কেন ?

কাজরী—মনে ক'রে দেখ তো, কি ভয়ানক সাধতে হয়েছিল তোমাকে ?

বিজয়া—মনে আছে; কিন্তু…।

কাজরী—কি ?

বিজয়া—ভদ্রলোকও কি খুব রাগ করেছেন ?

কাজরী—হ্যাঁ। কিন্তু ওর রাগ হলো উলটো রাগ।

বিজয়া ফ্যালফ্যাল ক'রে তাকায়—তার মানে ?

কাজরী—তার মানে, অতীনের একটুও ইচ্ছা ছিল না যে, আমি তোমার কাছে যাই।

বিজয়ার চোখ থরথর করে কাঁপে—অতীন বাবুর আপত্তি ছিল ?

কাজরী হাসে—আপত্তি বলে আপত্তি! তোমারই মত কেঁপে কঁকিয়ে আমার হাত ধরে বার বার…।

উঠে দাঁড়ায় বিজয়া—আমি যাই।

কাজরী রাগ করে।—চা খেয়ে যাবে না ?

বিজয়া—না।

কাজরী অভিমানের সুরে বলে—তবে এসেছিলে কেন ?

বিজয়া হাসে—সত্যি, কেন যে হঠাৎ চলে এলাম, বুঝতেই পারছি না।

দরজার দিকে এগিয়ে যায় বিজয়া। কাজরীও সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে এসে প্রশ্ন করে—আবার কবে হঠাৎ চলে আসবে বল ?

বিজয়া—দেখি।

কাজরী—দেখি নয়, কবে আসবে বল ?

বিজয়া—আসবো, নিশ্চয় আসবো।

কাজরী—একটা ছুটির দিন দেখে সকালের দিকে এস।

কোন দিন মুখ লুকিয়ে কথা বলবার অভ্যাস ছিল না যে মেয়ের, সেই মেয়েই আজকাল কেমন যেন ভয়ে ভয়ে এবং গোপন অপরাধের মানুষের মত মুখ লুকিয়ে কথা বলে। নিজের চোখেই দেখেছেন সুধাময়ী, স্কুলের খাতা সামনে খোলা রেখে আনমনার মত কি যেন ভাবছে আর ভেবেই চলেছে কেতকী।

কমলবাবুও কয়েকবার প্রশ্ন করেছেন—আজকাল স্কুলের খাটুনি কি খুব বেড়েছে কেতকী ? তোমার কি খুব কষ্ট হচ্ছে ?

কেতকী—না।

কমলবাবু—তবে ?

মুখ লুকোয় কেতকী—আপনি মিছে ভাবছেন কেন ?

কমলবাবুকে মুখ লুকিয়ে একটা কথা বলে সান্ত্বনা দিলেও মনে মনে স্বীকার না করে পারে না কেতকী, এই বাড়ির বুকের ভিতরটাকে ভাবিয়ে দেবার মত কাণ্ড ক'রে তুলেছে নির্মল।

নিজের কাণ্ডটাই বা কি কম ? কাণ্ডটা যে গানের ছাত্রী চিত্রার চোখের সামনে, চিত্রার মা আর জেঠিমা'রও চোখের সামনে ঘটে গিয়েছে। একটা ভজনের শেষের লাইনটা, তার মধ্যে এমন কোন দুঃসহ বেদনার কথাও ছিল না, ছিল শুধু প্রীতমের আওয়ন কি আওয়াজ। কিন্তু গানটাকে লয়ে নিয়ে যাবার আগেই হঠাৎ যেন গলা ধরে গেল কেতকীর, এবং দু'চোখ জলে ভাসিয়ে বোবার মত চুপ ক'রে বসে রইল।

—কি হলো কেতকীদি ? আতঙ্কিতের মত চেঁচিয়ে ওঠে

চিত্রা। চিত্রার আতঙ্কের শব্দ শুনে মা ও জেঠিমা ছুটে আসেন। পাখা হাতে নিয়ে কেতকীর মাথায় বাতাস করে চিত্রা।

—কি হলো? শরীর খুব খারাপ লাগছে? প্রশ্ন করেন চিত্রার জেঠিমা।

কেতকী—হ্যাঁ। মাথার যন্ত্রণা।

—ডাক্তার ডাকবো?

কেতকী—না।

—তবে?

কেতকী—বাড়ি যাব।

চিত্রা আপত্তি করে—না না, একা একা এভাবে বাড়ি যেতে পারবেন না কেতকীদি। কেউ সঙ্গে যাক।

কেতকী বলে—তাহ'লে নির্মলবাবুকে একটা খবর দাও চিত্রা।

এসেছিল নির্মল, এবং চিত্রাদের বাড়ির এতগুলি বিস্মিত চোখের সামনেই কেতকীকে হাত ধরে তুলে নিয়ে গিয়েছিল।

সেদিন বাড়ি ফিরতে বেশ রাতও হয়ে গিয়েছিল, কারণ নির্মলের সেই শক্ত হাতের মুঠো থেকে হাত ছাড়াতে পারেনি কেতকী। নির্মলের ইচ্ছাটার মধ্যেও একরকমের ডাকাতিপনা আছে। পৃথিবীর চোখের সামনেই কেতকীর হাত ধরে টানাটানি করতে এক ফোঁটা লজ্জার বাধাও নির্মল অনুভব করে কিনা সন্দেহ, নইলে কেতকীকে একেবারে নিজের বাড়িতে ওভাবে নিয়ে গিয়ে চেয়ারের উপর বসিয়ে দিতে পারতো না।

দৃশ্যটা নির্মলের পিসিমাও স্বচক্ষে দেখলেন। শিশি থেকে আরকের মত কি-একটা ওষুধ ঢেলে তুলো ভিজিয়ে, পিসিমার চোখের সামনেই অনায়াসে ব্যস্ত হয়ে, কেতকীর কপালের উপর পটি বেঁধে দিল নির্মল।

পিসিমা যখন ঘরের ভিতরে নেই তখনও চোখ তুলে নির্মলের মুখের দিকে তাকাতে পারে না কেতকী। একটা

অস্বস্তি ; সে অস্বস্তির মধ্যে একটা লজ্জাও যেন মুখ লুকিয়ে ছটফট করে। যেন নির্মলের হাতে ইচ্ছে করে এইভাবে ধরা পড়বার জন্য মাথার যন্ত্রণার দোহাই দিয়ে চতুর একটা চোখ-ছলছল বেদনার অভিনয় করেছে কেতকী। নিজেকে সন্দেহ করবার এত বড় প্রমাণ আর কখনো পায়নি কেতকী। কে জানে কেন নির্মল নামে এই সে-দিনের চেনা মানুষটাকে এত ভাল লেগে গেল। কত তাড়াতাড়ি! ভোরের মৌমাছি যেমন প্রথম দেখা ফুলের উপর একেবারে ঝাঁপ দিয়ে লুটিয়ে পড়ে, কেতকীর প্রাণটাও প্রায় সেই রকমেরই একটা কাণ্ড ক'রে বসে আছে। সত্যিই তো, এই ক'মাস ধরে মনের ভিতরটা যেন একটা সৌরভের লোভে গুনগুন করেছে। এই তো সেই সৌরভ, কেতকী আজ আর অস্বীকার করে না, আরকে চোবানো যে তুলোর পটি কেতকীর কপালের জ্বালা স্নিগ্ধ ক'রে দিচ্ছে, সেটা যে নির্মল নামে এই মানুষটির হাতের স্পর্শে সুরভিত হয়ে রয়েছে। ভাল লাগে, নির্মলকে ভাল লাগে, একটুও মিথ্যে নয়, নির্মলের মুখের দিকে চোখ তুলে না তাকালেও এই সত্য মিথ্যা হয়ে যাবে না।

বেশ একটু উদ্বিগ্ন স্বরে প্রশ্ন করে নির্মল—হঠাৎ মাথার ভেতর এরকম একটা যন্ত্রণা কেন হলো কেতকী ?

কেতকী চোখ তুলে তাকায়—নিজেরই ওপর রাগ ক'রে ?

—কেন ?

কেতকী হাসে -ভয় পেয়েছিলাম বলে।

নির্মল আশ্চর্য হয়—ভয় ? কাকে ভয় ?

কেতকী—আপনাকে ?

আরও আশ্চর্য হয় নির্মল—আমাকে ? কেন ?

কেতকী—মাত্র একদিনের দেখার পর কোন মেয়েকে যে মানুষ ওসব কথা বলতে পারে, তাকে ভয় না পেয়ে উপায় কি বলুন ?

নির্মল—তাই বল। সেই জন্যেই বোধ হয় আর এ-বাড়িতে

একটা দিনও আসবার সময় পেলে না। শুধু সন্দেহ ক'রে দূরে সরে রইলে।

এটাও একটা কঠোর সত্য কথা। রোজ সন্ধ্যায় শুধু এই রাস্তাটাকেই ভয় ক'রে অনেক ঘুরে অন্য রাস্তা ধরে কেতকী তার গানের ছাত্রী চিত্রাদের বাড়িতে গিয়েছে।

কেতকীর কাছে এগিয়ে এসে অতি শান্ত কিন্তু যেন বড় শক্ত স্বরে আস্তে আস্তে বলে নির্মল—যা বলেছি তোমাকে, তার মধ্যে একটুও মিথ্যে নেই কেতকী। আজও বলছি তোমাকে, তোমার সব কিছুই ভাবতে ভাল লাগে। কিন্তু…।

কেতকী—কি ?

নির্মল—কিন্তু তোমার যদি ভাল না লাগে, তোমার যদি অনিচ্ছা থাকে, তবে…।

কেতকীর চোখের দৃষ্টিতে যেন জীবনের একটা দুঃসহ ক্ষতের জ্বালা ফুলকি ছড়িয়ে হঠাৎ চমকে ওঠে। চেঁচিয়ে ওঠে কেতকী —তবে কি ? জোর করবেন ?

অপ্রস্তুত হয়ে বিমূঢ়ের মত তাকিয়ে বিড়বিড় করে নির্মল—তার মানে ?

কেতকীর চোখের জ্বালা আরও প্রখর হয়ে যেন ঝিলিক দিয়ে ওঠে।—কমল বিশ্বাসের ছেলের মত জোর ক'রে…শুধু একটা মেয়েমানুষের অহংকার ভাঙ্গবার গর্ব নিয়ে হাসতে হাসতে চলে যাবেন, এই তো ?

কেতকী বোধহয় জানতে পারেনি, কতক্ষণ ধরে চোখে রুমাল চেপে ধরে সে এই চেয়ারে বসে ফুঁপিয়েছে, এবং রুমালটাও ভিজে চুপসে গিয়েছে কখন ?

চোখ তুলতেই চোখে পড়ে কেতকীর, মাথা হেঁট ক'রে দাঁড়িয়ে আছে নির্মল, মুখটা যেন পুড়ে পুড়ে কালো হয়ে গিয়েছে। কমল বিশ্বাসের পুত্রবধূর অবমানিত জীবনের জটিল বেদনার রহস্যটা

এইবার একেবারে স্পষ্ট হয়ে যেন নির্মলের চোখেও একটা নতুন বিস্ময়ের জ্বালা ধরিয়ে দিয়েছে।

কেতকী উঠে দাঁড়ায়—আমি যাই।

নির্মল বলে—আমার একটা কথা শুনে চলে যাও।

কেতকী—বলুন।

নির্মল—তোমার যদি ভাল না লাগে, যদি বিন্দুমাত্র অনিচ্ছা থাকে, তবে তোমাকে ছোঁয়া দূরে থাক, আমি তোমার মুখের দিকে তাকিয়েও তোমাকে অপমান করবো না।

চোখ ফেরায় না কেতকী, যেন বিপুল এক সম্মানের মন্ত্রে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছে কেতকীর সারা শরীরটাই। নির্মলের মুখের দিকে অপলক চোখের সব বিস্ময় উৎসর্গ ক'রে দিয়ে কেতকী বলে—যদি বলি ভাল লাগে?

আরও কাছে এগিয়ে এসে নির্মল বলে—যদি নয়, একেবারে স্পষ্ট ক'রে মুখ খুলে আমারই মত বেহায়া লোভ নিয়ে বলতে হবে।

কেতকী—হ্যাঁ, ভাল লাগে।

মুখ ঘোরায় না, সরেও যায় না কেতকী। দরকার কি? দুটি ঠোঁটের উপর একটা আকুল আদরের ছোঁয়া বরণ ক'রে নেওয়া, এই তো। কেতকীর হৃৎপিণ্ডের ভিতরে যেন অঢেল শ্রদ্ধা ঢেলে দিয়েছে নির্মল, ঐ একটি ছোঁয়া দিয়ে বুকের উপর জড়িয়ে ধরে।

ভিতরের ঘরের দিকে ঠুং-ঠুং ক'রে চা-এর বাসন শব্দ ক'রে। পিসিমা বোধ হয় চা তৈরী ক'রে ফেলেছেন।

নির্মল বলে—চা খেয়ে একটু জিরিয়ে নাও কেতকী। তারপর যেও। আমিই তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসবো।

ঠাকুর দালানের থামগুলি আর একটা কালবৈশাখীর ধাক্কা এবং আর একটা বর্ষার গলানি সহ্য করতে পারবে কি? মাকড়সার ঝুলের ভিড়ে ঢাকা পড়ে গেলেও ছাদের ফাটলটা বোঝা

যায়। তিনটে থাম বেশ আলগা হয়ে একদিকে কাত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

আবার এই ভাঙ্গা-বাড়ির কমল বিশ্বাস আর সুধাময়ী, দুটি চক্রান্তের বুড়ো-বুড়ির মত গম্ভীর হয়ে ঠাকুরদালানের বারান্দার উপর মুখোমুখি বসে থাকেন। দুটি শীর্ণ ও ভীরু মনুষ্যত্ব, যেন ফিসফাস করবারও আর শক্তি নেই। আবার নতুন একটা ভয়ের ছায়া দেখতে পেয়ে ভয়ানক সাবধান হয়ে গিয়েছে ঐ দুটি চক্রান্তের কারিগর। দু'জনে চোখে-চোখে কথা বলেন।

দু'জনের দু'জোড়া চোখ একটা নতুন দৃশ্য দেখতে পেয়েছে। সেই অল্পবয়স্ক ভদ্রলোক, নির্মল যার নাম, সেই ছেলেটি রোজই সন্ধ্যার পর কেতকীকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে যায়।

ক্ষেপী বউ-এর বাগানটা জঙ্গল হয়ে গেলেও তার ঐ বাঁশ তেঁতুল আর ময়না-কাঁটার ঝোপঝাড়ের আড়ালে আজও আশ্বিনে ফুল ফোটে, সে ফুলের নাম সধবা শিউলি। এই শিউলির প্রায় সবটাই লাল, সাদা শুধু পাপড়ির প্রান্তটুকু। ঐ ফুলের খবর আর ঐ ফুলের এই নামের খবর আজ আর কেউ রাখে না, পাঁচুর দিদি-বুড়ির মত দু'একজন পাতা-কুড়নো মানুষ ছাড়া।

শুকনো পাতা আর ঝুরি কাঠের প্রকাণ্ড একটা বোঝা মাথায় নিয়ে পাঁচুর দিদি-বুড়ি মাঝে মাঝে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে উঠানের উপর দাঁড়ায়, চেঁচিয়ে হাঁক দেয়—জ্বালানি নিবে কি গো দিদি?

সুধাময়ী সাড়া দেবার আগেই কেতকী ঘরের ভিতর থেকে বের হয়ে আসে। চারটে পয়সা পাঁচুর দিদি-বুড়ির হাতে ধরিয়ে দেয়। জ্বালানির বোঝা রেখে দিয়ে চলে যায় পাঁচুর দিদি-বুড়ি।

পাঁচুর ঐ দিদি-বুড়িও আজ একটা কাণ্ড ক'রে চলে গেল। কোচড়ের ভিতর থেকে পদ্ম-পাতায় মোড়া এক-গাদা ফুল বের ক'রে কেতকীর হাতের কাছে এগিয়ে দেয়—নাও দিদি, পাতা

কুড়োতে গিয়ে পেয়ে গেলুম, তাই তোমার জন্যে চারটিখানি সধবা শিউলি নিয়ে এলুম।

অদ্ভুত চেহারার আর অদ্ভুত নামের একগাদা ফুল কেতকীর হাতে ধরিয়ে দিয়ে পাঁচুর দিদি-বুড়ি যেন ঠিক সময় বুঝে কেতকীর মনের কল্পনাকে একটা রঙীন শাসানি দিয়ে চলে গেল। আজ বোধ হয় নির্মলের মনের আশা আর মুখচোরা হয়ে থাকবে না। একেবারে স্পষ্ট ভাষায় দাবি ক'রে বসবে নির্মল, এবং স্পষ্ট ভাষায় উত্তর না দিয়ে রেহাই পাবে না কেতকী। নির্মলের পিসিমা আজ সকালে কেতকীকে চা খেতে নিমন্ত্রণ করেছেন। কোন সন্দেহ নেই, এই নিমন্ত্রণই হলো একটা দাবি শোনাবার আয়োজন। পিসিমা ও তাঁর ভাই-পো, দু'জনেই আজ বোধ হয় একেবারে প্রতিজ্ঞা ক'রে তৈরী হয়েছেন। জানতে চায় দু'জনেই, কেতকীর মনে কোন আপত্তি আছে কি, যদি কেতকীর জীবনটাকে তাঁরা এই রকম সধবা শিউলির মত রঙীন ক'রে দিতে চান।

আপত্তি? সত্যিই যে একটুও আপত্তি করতে ইচ্ছে হয় না। কিন্তু কেন? বুকের ভিতরে এরকম একটা ইচ্ছার উৎসব জেগে উঠলো কেন? ভুল করছে না তো জীবনটা?

পিসিমার চা-এর নিমন্ত্রণে যাবার জন্য অনেকক্ষণ আগেই তৈরী হয়েছিল কেতকী। আর সময় নেই, এইবার যেতে হবে।

নিজের সাজটারও দিকে চোখ পড়ে। এটাও একটা কাণ্ড! কেতকীর হাত দুটো যেন স্বপ্নের ঘোরে কেতকীকে এরকম রঙীন সাজে সাজিয়ে দিয়েছে। লজ্জা পেয়েই বা আর লাভ কি?

তবু লজ্জা পেতে হয়। ঠাকুর দালানের দিকে চোখ পড়তেই লজ্জা পেয়ে চমকে ওঠে কেতকী, মুখ ফিরিয়ে নেয়। কমল বিশ্বাস আর সুধাময়ী চুপ ক'রে মুখোমুখি বসে কেতকীরই দিকে তাকিয়ে আছে। বেবিটা শুয়ে আছে দু'জনের মাঝখানে। বেবির মাথাটা সুধাময়ীর কোলে, আর পা দুটো কমল বিশ্বাসের কোলে। দুরন্ত

বেবিটা শুয়ে-শুয়েই পা ছুঁড়ে ছুঁড়ে বুকব্যথার রোগী ঐ বুড়ো মানুষটার বুক আর পাঁজরের উপর লাথালাথি করছে।

পথের উপর এসে দাঁড়াতেই আর একবার লজ্জা পেয়ে মাথা হেঁট করে কেতকী; কেতকীর হাতে বেবির একটা ফটো। আজই বেবির এই ফটোটা নির্মলকে উপহার দিতে হবে, একথাই বা কেতকীর কানে-কানে কে বলে দিয়ে গিয়েছে?

পথ চলতে লজ্জা করে না, কিন্তু নির্মলের বাড়ির বারান্দায় উঠেই আর একবার চমকে ওঠে ও লজ্জা পায় কেতকী। পদ্মপাতায় মোড়া সধবা শিউলিকেও যে কেতকী হাতে নিয়ে চলে এসেছে। সব-ই কি ভুলো মনের ভুল? না ইচ্ছে করে তৈরী করা যত ভুল?

পিসিমা হাসছেন। নির্মল মুখ ফিরিয়ে হাসছে। কেতকীর হাতের দুই উপহার যে কেতকীর জীবনের একেবারে পূর্ণ উৎসর্গের অঙ্গীকার হয়ে এরই মধ্যে ধরা পড়ে গিয়েছে। ওরাও বোধ হয় আর কোন প্রশ্ন করবে না, এবং কেতকীরও আর কোন কথা মুখ খুলে স্পষ্ট ক'রে না বললেও চলবে। ঢিপ ঢিপ করে কেতকীর বুক। রুমাল দিয়ে বার বার চোখ-মুখ মোছে কেতকী; কিন্তু বুকটা যেন এই হঠাৎ অস্থিরতা শান্ত করতেই চায় না।

পিসিমা বলেন—যাক, নিশ্চিন্ত হলুম কেতকী। আশীর্বাদ করি।

পিসিমা ঘরের ভিতরে চলে যেতেই রুমাল দিয়ে চোখ চেপে ফুঁপিয়ে ওঠে কেতকী। নির্মল ব্যথিতভাবে বলে—কি হলো কেতকী? তোমার কি কোন আপত্তি আছে?

কেতকী—একটুও না।

নির্মল—বিয়ের পর আমার সঙ্গে চলে যেতে আপত্তি আছে?

কেতকী—না।

নির্মল—তবে? দুঃখ করছো কেন?

কেতকী—একটুও দুঃখ করছি না।

চোখের উপর থেকে রুমাল সরিয়ে নির্মলের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে কেতকী। ঠাট্টার সুরে হাসতে থাকে নির্মল—আবার কোন সন্দেহ করছো না তো?

কেতকী—সন্দেহ মিটে গিয়েছে, তাই দু'চোখ ভরে দেখছি।

নির্মল—কি দেখছো?

কেতকী—নতুন জিনিস।

নির্মল—জিনিসটা কি?

কেতকী—স্বামীর মুখ।

নির্মল হাসে—এখনই ওকথাটা বললে যে, একটু বে-আইনি কথা হয়ে যাবে কেতকী?

কেতকী—একটুও না।

নির্মল—কেন?

কেতকী—বিয়ে না হলেও তুমি আমার স্বামী।

নির্মল—তাই বা কেন?

কেতকী—তোমাকে স্বামী বলে মনে ক'রে ফেলেছি।

নির্মল—মনে ক'রে ফেললেই বা কেন?

কেতকী—বিশ্বাস করতে পেরেছি বলে।

নির্মল—আমি তোমাকে সত্যিই ভালবাসি, এই বিশ্বাস?

কেতকী—না, সে বিশ্বাসের জন্য নয়; তুমি আমাকে ভাল না বাসলেও তোমাকে স্বামী মনে করতাম।

নির্মল—তা'হলে বল, তুমি আমাকে ভালবাস, এই বিশ্বাস তোমার আছে বলেই আমাকে···।

কেতকী—না, তা'ও নয়। তোমাকে যদি একটুও ভাল না লাগতো, তবু তোমাকে স্বামী বলে মনে মনে মেনে নিতাম।

নির্মলের চোখের এতক্ষণের প্রশ্নব্যাকুল হাসিটা হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে যায়। কেতকীর ঐ চোখ আর মুখের মধ্যে তো বিন্দুমাত্র কৌতুক নেই। যেন ব্যাকুল হয়ে ওর বুকের ভিতর থেকে জীবনের সব

সুখ-দুঃখ ভয় আর আনন্দের অনুভবে মাখা হয়ে এই অদ্ভুত কথাগুলি ওর এক অদ্ভুত বিশ্বাসের কলরবের মত বেজে উঠেছে।

মুখ ফিরিয়ে, এবং যেন ভয়ে ভয়ে কুণ্ঠাহত স্বরে প্রশ্ন করে নির্মল—তা'হলে স্বামী কাকে বলে কেতকী ?

কেতকী চেয়ার ছেড়ে নির্মলের কাছে এগিয়ে আসে। যেন দু'চোখের একটা দুর্বার ক্ষুধাতুর দাবী নিয়ে আস্তে আস্তে বলে—আগে আমার একঠা কথার উত্তর দেবে বল ?

নির্মল—বল।

কেতকী—যদি বিয়ে না হয় ; যদি আমি এই মুহূর্তে মরে যাই, যদি কাউকে না বলে কোথাও চলে যাই, তবে বেবি কি তোমার কাছে থাকতে পারে না ?

নির্মল—নিশ্চয় পারে।

নির্মলের বুকের উপরে মাথা লুটিয়ে দিয়ে ছটফট করে কেতকী—আমার ছেলেকে ভালবেসে বাঁচিয়ে রাখবে যে, সে-ই তো আমার স্বামী। ভয়ানক স্বার্থপরের মত কথা বললাম নির্মল ; জানি না, ভুল বলছি কি ঠিক বলছি ; জানি না, একথা শুনতে পেলে পৃথিবীতে কেউ আমাকে আশীর্বাদ করবে কি না।

পুরুষের বুকের উপর লুটিয়ে পড়ে একটা মেয়েমানুষের আত্মা যেন ভালবাসার সব চেয়ে বড় ভয় ভেঙ্গে নিচ্ছে। দৃশ্যটা নির্মলের মত পাকা অডিটারের মনের যত অঙ্ক আর হিসাবেও ধাঁধা ধরিয়ে দিয়েছে। কিছুক্ষণ মাত্র, আধ মিনিটও হবে না, চোখ বন্ধ ক'রে কি-যেন ভাবতে থাকে নির্মল। চোখ খুলতেই হেসে ওঠে নির্মলের চোখ। কি আর এমন অদ্ভুত কথা বলেছে কেতকী ? সত্যিই তো, ও বিশ্বাস না পেলে মেয়েমানুষের জীবন মেয়েলি হবে কি করে ?

কেতকীর মাথায় হাত রেখে নির্মল বলে—তুমি ঠিকই বলেছ কেতকী।

পিসিমার হাতের নাড়া-চাড়া খেয়ে চা-এর বাসন খুব জোরে শব্দ ক'রে উঠেছে। সরে গিয়ে চেয়ারের উপর বসে কেতকী।

পিসিমা ঘরের ভিতর থেকেই চেঁচিয়ে বলেন—তা'হলে কথাটা নিয়ে, সেইসঙ্গে বিয়ের দিনটাও ঠিক করবার জন্য কমলবাবুর কাছে যাবে কে নির্মল? তুই না আমি?

নির্মল উত্তর দেয়—আমি যাব।

কেতকী মুখ ঘুরিয়ে হাসি লুকোয়। নির্মলও গলার শব্দ লুকিয়ে হাসতে থাকে—যাব তো নিশ্চয়, কিন্তু বুড়োমানুষ শেষকালে চুরির চার্জ না ক'রে বসেন।

কেতকী—ভয় নেই, আমিই বাঁচিয়ে দেব।

নির্মল—কেমন ক'রে?

কেতকী হাসে—আমি বলবো, আমিই চুরি করেছি।

বিছানাটার বেশ খানিকটা জায়গা, অর্থাৎ তোষকটার একটা কোণ, আর চাদরের একটা কিনারা পুড়ে গিয়েছে। চাকর ভাগবতও বুঝতে পারে না, যেখানে দুই ফ্ল্যাটেরই ঘর-জোড়া এত ভাল ভাল আসবাব পর্দা আর গদির সৌখিন ঘটা, সেখানে শুধু বাবু আর মা'র এই বিছানাটারই বিরুদ্ধে এত অবজ্ঞা কেন? না বাবু, না মা, দু'জনের কেউ কোন দিন বলেন না যে চাদরটা বদলে দাও ভাগবত। আলমারি থেকে একটা ভাল চাদর বের করতেও কেউ বলেন না। ভাগবত নিজের বুদ্ধি মতো এই পোড়া-ছেঁড়া চাদরটাকেই ধুয়ে কেচে পোড়া-ছেঁড়া তোষকের উপর পেতে রাখে, তাই বিছানাটা বেঁচে আছে বলে মনে হয়।

সন্ধ্যার অন্ধকার একটু ঘনিয়ে উঠলে আর ঘরের ভিতর নয়; ঘর থেকে বের হয়ে যায় অতীন। এবং ফিরতে প্রায় মাঝ রাত হয়ে যায়। বাড়ির কাছে এসেই একবার পথের উপর থমকে

দাঁড়ায়। ঐ যে, বাড়ির দোতলার ফ্ল্যাটে একটি ঘরের খোলা জানালা দিয়ে এখনও আলো ছড়িয়ে পড়ছে বাইরে, এবং নীল রঙের পর্দাটা কাঁপছে, সেই বাড়ির কাছে পথের উপর কোন গাড়ি এখনও দাঁড়িয়ে আছে কি? না, নেই। নিশ্চিন্ত হয়, তবে বাড়ির গেটের দিকে এগিয়ে যায় অতীন।

কে জানে কখন ওরা চলে গিয়েছে, কাজরীর ঐ কালচারের আর আর্টের জীবনের এক একজন সুহৃদ্? কাজরীর কাছ থেকে এই তিনটি মানুষের আরও পরিচয় জানতে পেরে আরও আশ্চর্য হয়েছে অতীন। তিনজনই বড় ব্যবসায়ী, তিনজনই মস্ত বড় টাকার মানুষ। এবং তিনজনই টাকার জীবনে তৃপ্তি পান না। অসিত দত্ত টাকা ছড়িয়ে মানুষের উপকার করেন, ওটা বলতে গেলে তাঁর জীবনেরই একটি আর্ট। জীমূতবাবু ছবির একজিবিশনের জন্য অনায়াসে এক কথায় পাঁচ হাজার টাকা খরচ করে ফেলেন, আর্টের প্রতি ওঁর এতই ভালবাসা। আর, গাঙ্গুলীর ঐ জর্ণালিজম, সেটাও তাঁর জীবনের একটা সাধের আর্ট। বিদেশের কাগজে দেশের কোন প্রতিভার পাবলিসিটি করিয়ে দিতে তাঁর মতন দক্ষতা ক'জনের আছে? প্রায় প্রতি মাসে কলকাতার কোন না কোন গণ্যমান্য বিদেশীকে পার্টি দিয়ে বছরে কয়েক হাজার টাকার হোটেল বিল শোধ করেন। কাজরী কতবার মুগ্ধ হয়ে বলেছে— একে তো টাকা, তাতে সৌখিন রুচি, তাতে ট্যালেণ্ট, তার ওপর আর্ট ও কালচারের ওপর এত শ্রদ্ধা, ওরা ইচ্ছে করলে কি-না করতে পারে অতীন!

ক্যামাক ষ্ট্রীটের মাঝরাতের অন্ধকারে আর জ্যোৎস্নায় পুরো দুটি মাস ধরে জারুল গাছের পাতার আড়ালে কোকিল ডেকেছিল। আজকাল মাঝে মাঝে মেঘ ডাকে, এবং তাড়াতাড়ি পথ চলতে গিয়ে বুঝতে পারে অতীন, অতীনেরই ছায়া দেখতে পেয়ে মিস্টার সিন্‌হার বাড়ির গ্রেট ডেন ভয়ানক রাগ ক'রে চিৎকার করছে।

মাঝরাতের নীরবতার মধ্যে চুপি-চুপি হেঁটে ঘরের ভিতরে ঢুকে রোজ দেখতে পেয়েছে অতীন, অঘোরে ঘুমিয়ে আছে কাজরী। শুধু তোষকের পোড়া জায়গাটা যেন জেগে হাঁ ক'রে তাকিয়ে আছে।

ঘুমোক কাজরী। বিছানার দিকে এগিয়ে যাবার কথাও মনে পড়ে না অতীনের। বারান্দার চেয়ারের দিকে এগিয়ে যায়। ঘাড় কাত ক'রে বসে বসে ঘুমনো অতীনের প্রায় একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছে, বিশেষ কিছু কষ্ট হয় না।

হ্যাঁ, কষ্ট হয়, আতঙ্কিত হয়, অস্বস্তি বোধ করে অতীন, যখন হঠাৎ ঘুম-ভাঙ্গা চোখে বিছানার উপর উঠে বসে ডাক দেয় কাজরী —অতীন।

এই ডাক যেন দুর্মর একটা আক্রোশের ডাক! কাজরীর সেই অবিকার অক্ষয় একরোখা ভালবাসার ডাক। সেই ডাকের কোন সাড়া না দিয়ে বরং স্নান করতে ইচ্ছে করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সাড়া না দিয়ে পারে না অতীন। এবং তার পর, কাজরী যখন আবার ঘুমিয়ে পড়বার জন্য অলস শরীরটাকে এলিয়ে দেয়, তখন উঠে গিয়ে স্নান করে অতীন।

সেদিন বাড়িতে ঢুকেও কেমন যেন মনে হয় অতীনের, পাশের ফ্ল্যাটের ঘরে মেলামেশার উৎসব কি আজকাল আর মেতে ওঠে না? ওরা কি আসা বন্ধ করেছে? ছাইদানিতে সিগারেটের ছাই জমে না কেন?

ঘরের ভিতরে ঢুকে কাজরীকে দেখতে পেয়ে চমকে ওঠে অতীন। কোন দিন তো এত রাত পর্যন্ত জেগে বসে থাকে না কাজরী।

তবে আজ জেগে বসে আছে কেন? হাতে আর্ট আর কালচারের সরকারী চিঠির ফাইল নেই। সিল্কের তোয়ালেতে রঙীন সুতোর তাজমহলও আঁকে না কাজরী। শুধু চুপ ক'রে

বসে ভাবছে। সারা মুখ জুড়ে যেন একটা দুশ্চিন্তার ছায়া স্তব্ধ হয়ে রয়েছে।

অতীনকে দেখতে পেয়ে কাজরীর সব দুশ্চিন্তার রুদ্ধ জ্বালা যেন চমক দিয়ে ফুটে ওঠে। —তুমি তো বেশ আছ, কারণ তোমার কিছুই অভাব হচ্ছে না।

অতীন—একথার মানে ?

কাজরী—মনের মত স্ত্রীটিকে নিয়ে ইচ্ছে মত স্বামীটি হয়ে দিব্যি দিন কাটিয়ে দিচ্ছ। কিন্তু···।

অতীন—কিন্তু কি ?

কাজরী—কিন্তু আমার কি উপায় হবে, যদি ওরা এভাবে সবাই একসঙ্গে আমার ওপর রাগ ক'রে দূরে সরে থাকে ?

অতীন—রাগ করবার কারণ ?

কাজরী—তা'ও যে কিছু বুঝতে পারছি না। অসিত আজ-কাল গাড়িও পাঠায় না, অফিস থেকে ট্রামে বাড়ি ফিরতে হয়। গাঙ্গুলীর কাছে চিঠি লিখেছিলাম, আমার বিদেশে যাবার নিমন্ত্রণ পাইয়ে দেবার চেষ্টাটার কতদূর কি হলো ? কিন্তু কোন উত্তর নেই। জীমূতবাবুকে ফোন ক'রে ক'রে হয়রান হচ্ছি, নাগালই পাই না। ছবির এগজিবিশনটা হবে কি না, তাইতো এখন সন্দেহ হচ্ছে।

হয় অতীনের চোখ দুটো, কিংবা মনটা কে জানে কোন মমতার ভুলে মেদুর হয়ে ওঠে। যে নারীর সুন্দর মুখটাকে শতবার অধর-স্পর্শে উল্লসিত করেছে অতীন, সেই মুখের বিষাদ দেখতে কষ্ট হয় বোধহয়। সান্ত্বনার স্বরে বলে অতীন—তোমারই ভুল, ওদের কাছ থেকে তুমি এত বেশি উপকার আশা কর কেন কাজরী ?

এই নারীর জীবনের আশা প্রচণ্ড মাতাল হয়ে পা পিছলে খানায় পড়ে রক্তাক্ত হয়ে যাবে, এই তো অতীনের ভয় ; তাই অতীনের মনে এক টুকরো হঠাৎ মমতার আবেশ। তাই হাত বাড়িয়ে দিতে চেয়েছে অতীন, যেন সে হাত ধরে ফেলতে পারে

কাজরী; যেন কাজরীর জীবনটা টাল সামলে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে ও পিছিয়ে আসতে পারে, এবং সত্যিই খানার ভিতরে পড়ে গিয়ে রক্তাক্ত না হয়।

কাজরী আশ্চর্য হয়—তুমি তো ভয়ানক অদ্ভুত কথা বলতে পার! উপকার করবার মত ক্ষমতা ওদের আছে। ওরা অতীন বিশ্বাস নয়, ওদের কালচার আছে, পার্সোন্যালিটি আছে।

—টাকাও আছে; অনেক টাকা। রুক্ষস্বরে চেঁচিয়ে ওঠে অতীন। চোখের চাহনিতে যেন ডানায় আগুন-লাগা একটা যন্ত্রণাক্ত পাখির ছানা ছটফট ক'রে ওঠে।

—এ তোমার হিংসে, বড় বিশ্রী হিংসে কিন্তু ওরা টাকার জন্য বড় নয় অতীন। আর; আমিও ওদের টাকার জন্য ওদের শ্রদ্ধা করি না। সুন্দর সুন্দর কাজে টাকা ঢেলে দেবার মত রুচি ওদের আছে। ঘরের ভিতরে ঘুরে-ফিরে এবং ছটফট করে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলতে থাকে কাজরী।

অতীন—শেষ পর্যন্ত ঐ একটি কথায় এসে পৌঁছতে হচ্ছে; টাকা, টাকার জোর।

কাজরী হাসে—ভুল। তোমার নিতান্তই ভুল ধারণা।

কাজরীর ধারণাটাই ভুল। চুপ ক'রে একেবারে স্তব্ধ হয়ে ভাবতে থাকে অতীন, এবং সেই সঙ্গে চোখের তারা দুটোও স্তব্ধ হয়ে একটা স্বপ্ন দেখতে থাকে। টাকা, অঢেল টাকা; অতীনের দু'হাতের মুঠোর কাছে লক্ষ লক্ষ টাকার শব্দ ঝন্‌ঝন্‌ ক'রে বাজছে। দেখেশুনে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছে কাজরী। এ কি? চমকে মুখ ফিরিয়ে হেসে উঠেছে কাজরী; তারপর ছুটে এসে অতীনকে জড়িয়ে ধরেছে··এতদিন কেন বলনি অতীন? কেন আমাকে জানতে দাওনি যে, এত টাকা তোমার আছে? কে বলে তোমার পার্সোন্যালিটি নেই, কালচার নেই।

দেখতে পায় অতীন, কাজরী একেবারে অতীনের চোখের

সামনে এসে দাঁড়িয়ে যেন ওর জীবনের একটা প্রতিজ্ঞার গান গাইছে, এবং কাজরীর গলার স্বর মাতালেরই গলার স্বরের মত।
—কাল আর অফিস যাওয়া হবে না। সকাল হলেই বের হয়ে পড়বো। ওদের ধরতেই হবে। দেখি, কেমন ক'রে কোথায় লুকিয়ে থাকতে পারে ওরা।...কেন লুকিয়ে থাকবে? কি এমন অপরাধ করেছি যে, ওরা এত রাগ ক'রে সরে থাকবে?

অতীনের বুকের ভিতরেও যেন একটা পাল্টা প্রতিজ্ঞা সাপের মত কিলবিল করে আর মাঝে মাঝে একেবারে ফণা তুলে দুলতে থাকে। মনে পড়ে রসিকপুরের এক কমল বিশ্বাসের কথা, চমৎকার চক্রান্তের সেই কমল বিশ্বাস। মনে পড়েছে অতীনের, শুধু একটা সোনার গল্পের জোরে কি-না কাণ্ড করা যায়।

টাকা নেই, কিন্তু একটা গল্পের জোরে যদি মিথ্যে টাকার ভয়ানক শব্দ এখনি কাজরীর কানের কাছে ঝনঝনিয়ে বাজিয়ে দেওয়া যায়, তবে? তবে কি কাজরীর ঐ প্রতিজ্ঞার গান হঠাৎ লজ্জা পেয়ে বন্ধ হয়ে যাবে না? কাজরীর আশার এই দিশাহারা অভিযান যদি একটা ছলনার জোরে থামিয়ে রাখা যায়, তবে দোষ কি, ক্ষতিই বা কোথায়? অতীনের জীবনের আশা একেবারে মরে যাবার আগে যেন শেষবারের মত মরিয়া হয়ে ওঠে। থামাতে হবে, ধরে রাখতে হবে, কাজরীকে ওদের কাছে যেতে দেওয়া চলবে না। কোনমতেই না। কমল বিশ্বাসের ছেলের চোখের স্বপ্ন যেন সুন্দর এক ধূর্ততার প্রদীপের মত দপদপ ক'রে জ্বলতে থাকে।

বেশ জোরে চেঁচিয়ে হেসে ওঠে অতীন। কাজরী বলে—কি হলো?

অতীন—আমাকে চিনতে তুমি কত ভুল করেছ, সেটা যদি বুঝতে চাও, তবে একটা গল্প বলতে পারি।

কাজরী—গল্প?

অতীন—শুনতে গল্পের মতই মনে হবে, কিন্তু সেটা গল্প নয়,

আমাদের সাতপুরুষ আগের সৌভাগ্যের একেবারে একটা বাস্তব সত্য, যেটা আজও বাবার চার্জে আছে।

কাজরী ভ্রুকুটি ক'রে হাসে—তোমাদের সৌভাগ্য ?

অতীন—হ্যাঁ, রসিকপুরের রাজবাড়ির সাতপুরুষ আগের সৌভাগ্যের সব পুঁজি, সব সোনা ঠাকুরদালানের থামের ভিতরে লুকনো আছে। কমল বিশ্বাস যখের মত আজও সেই সোনা পাহারা দিচ্ছে। কিন্তু···কিন্তু আর কতদিন পাহারা দেবে? তারও যে যাবার সময় হয়ে এল ?

কাজরী বিড়বিড় করে—কি বললে ?

অতীন হাসে—ঠাকুর পদ্মনাভ নাকি স্বপ্ন দেখিয়ে সাবধান ক'রে দিয়েছেন, ঐ সোনা যেন সাতপুরুষের মধ্যে কেউ ভোগ করতে চেষ্টা না করে।

কাজরী হাসে—তুমি কোন্ পুরুষ ?

অতীন উৎফুল্ল হয়ে বলে—আমি আট পুরুষ। কাজেই বুঝতে পারছো কাজরী, ঐ সোনা আমারই ভাগে আছে।

খিল-খিল ক'রে হেসে ওঠে কাজরী।—গল্পটা সত্যিই চমৎকার, ওদেরও একদিন শোনাতে হবে।

অতীন বিশ্বাসের সুন্দর ধূর্ততার প্রদীপ এক ফুৎকারে নিভিয়ে দিয়ে খিল-খিল করে হাসছে কাজরী। শুনতে শুনতে বোধহয় বধির হয়ে গিয়েছে অতীন ; কতক্ষণ হেসেছে কাজরী, তা'ও বুঝতে পারেনি। অনেকক্ষণ পরে, যেন সংজ্ঞা ফিরে পেয়ে চমকে ওঠে অতীনের চোখ। কাজরীর মুখটা একেবারে অতীনের চোখের কাছে এসে হাসছে। অতীনের গলা জড়িয়ে ধরেছে কাজরী।

কাজরী বলে—এত গম্ভীর কেন অতীন ? আমার কাছে তুমিই তো সোনা। গল্পের সোনা না পেলেও কিছু আসে যায় না।

কাজরীর মুখের হাসিটাকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে দেখতে থাকে অতীন। হাড়ি-কাঠের মধ্যে গলা আটক হয়ে গেলে কোন

পশুও এত ভীত অসহায় ও করুণভাবে তাকায় না। অতীনের জীবনের কোন ক্লান্তি শ্রান্তি অবসাদ ও অনিচ্ছাকে ক্ষমা করবে না কাজরীর এই অগ্নিময় নিঃশ্বাসের ভালবাসা। কিন্তু অতীনের এই ঠাণ্ডা শরীরটার গলা জড়িয়ে এখনও কেন বুঝতে পারে না কাজরী ; অতীন বিশ্বাসের বুকের ভিতরের সব রক্ত যে বরফ হয়ে গিয়েছে।

কিন্তু উপায় নেই ; নীরব হলেও নিথর হয়ে থাকতে পারে না অতীন। এই অনিচ্ছার শরীরটাকেই খাটিয়ে কাজরীর দাবিকে ঘুষ দিয়ে খুশি করতে হবে।

জারুল গাছের পাতার আড়ালে কোকিল ডাকেনি, মাঝরাতের অন্ধকারের মাথার উপরে মেঘও ডাকেনি। যখন ডেকে উঠলো সিন্‌হা সাহেবের রাগী গ্রেট ডেন, তখন এই বোবা ঘরেরও অনেক্ষণের নীরবতা আবার ভেঙ্গে যায়।

কাজরী গম্ভীর হয়ে বলে—তোমার শরীরটা যে মাটি হয়ে গিয়েছে।

অতীন ভ্রুকুটি ক'রে—হয়তো হয়েছে।

চেঁচিয়ে ওঠে কাজরী—কেন হবে ?

অতীন—তুমিও যে তোমার শরীরটাকে মাটি ক'রে দিয়েছ।

কাজরী—তার মানে ?

অতীন—তার মানে তুমি জান।

কাজরী—স্পষ্ট ক'রে বল, কি বলতে চাইছ ?

অতীন—স্পষ্ট ক'রে বলছি। শুধু একটা মেয়েলি শরীর থাকলেই মেয়েমানুষ হয় না, প্রাণটা মেয়েলি হওয়া চাই।

কাজরী—তার মানে, আজ আমাকে একটুও ভাল লাগলো না?

অতীন—একটুও না।

কাজরী—আমার কথাটাও তা'হলে শোন।

অতীন—বল।

কাজরী—তোমাকেও আজ আমার একটুও ভাল লাগেনি।

অতীন—শুনে সুখী হলাম।

কাজরী—এখনও গা ঘিনঘিন করছে।

অতীন—তা'হলে যাও স্নান ক'রে এস, আমি যেমন রোজই স্নান ক'রে ঘেন্না দূর করি।

কাজরীর দাঁতেদাঁতে শব্দ বাজে—এই কথা?

অতীন—হ্যাঁ।

কাজরী—এটা স্বামীর মত কথা হলো?

অতীন—স্বামী কা'কে বলে জানি না।

কাজরী—স্ত্রী কা'কে বলে, সেটা জান কি?

অতীন—জানি।

কাজরী—কা'কে বলে?

অতীন—আমার ছেলেকে ভালবেসে বাঁচিয়ে রাখবে যে মেয়ে।

কাজরী—তার মানে কেতকী?

অতীন—ইচ্ছে করলে এ সন্দেহ করতে পার। আমার আপত্তি নেই।

কাজরী—তা'হলে বল তুমি কেতকীরই স্বামী?

অতীন—একেবারে মিথ্যে কথা। এরকম সন্দেহও করো না। আমি তোমার স্বামী।

কাজরী—কি-রকমের স্বামী?

অতীন—তুমি যে-রকমের স্ত্রী।

সিন্‌হা সাহেবের গ্রেট ডেন আরও রেগে চিৎকার করতে থাকে। অতীন বিশ্বাস আর কাজরী বিশ্বাস একেবারে নীরব হয়ে যায়।

আজ আসবে নির্মল। এই বাড়ির ছায়ার কাছাকাছি এসে যে মানুষ অনেকবার এসেছে আর চলে গিয়েছে, সেই নির্মল। কমল

বিশ্বাস আর সুধাময়ীর কাছে এসে আজ যে-কথা বলবে নির্মল, তারপর···।

আনমনার মত যে হাসি মুখে ছাড়িয়ে দিয়ে ঘরের ভিতরে চুপ ক'রে বসে এই কথা ভাবছিল কেতকী, সেই হাসিটাই হঠাৎ একটা প্রশ্নের আঘাতে ব্যথিত হয়ে ওঠে, এবং তার পরেই ভয় পেয়ে কাঁপতে থাকে। তারপর, নির্মলের সেই ইচ্ছার কথা শুনতে পেয়ে হেসে উঠতে পারবে কি ঐ দুটি বুড়ো মানুষের প্রাণ, যারা এখন ঠাকুরদালানের বারান্দায় বসে বেবিকে কোলে নিয়ে, বেবির সব দুরন্তপনার লাথি বুকের উপর বরণ ক'রে, বসে বসে গল্প করছে?

এই কয়েকটা মাস কেতকীর চোখ দুটো যে একটা নতুন স্বপ্নের দিকে অপলক হয়ে তাকিয়েছিল, তাই এই দিকের বেদনার ছবিটা চোখে পড়েনি। কান দুটোও বধির হয়ে গিয়েছিল, তাই ঐ দুই বুড়ো মানুষের যত উদ্বিগ্ন প্রশ্নের ভিতরে লুকানো একটা আর্তনাদকে শুনতে পায়নি। কেউ এসে পরের মেয়েকে এবাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে চলে যাবে, সেটা এবাড়ির বুড়ো-বুড়ির জীবনে খুব বড় দুঃখের ব্যাপার নয়। নিজের মেয়েকেও এভাবে ছেড়ে দিতে হয়; কিন্তু নিজের নাতিকে ছেড়ে দিতে কি বুড়ো-বুড়ির মায়ার পাঁজর পটপট ক'রে ভেঙ্গে আর্তনাদ ক'রে উঠবে না? মুখে না বলুক, মনে মনে বলবে বুড়ো আর বুড়ি; শেষে এবাড়ির সোনা চুরি করে নিয়ে পালিয়ে গেল রামকানাইবাবুর ভাগ্নী।

কেন যে এই দুটি বুড়ো মানুষের জন্য অদ্ভুত একটা মায়ার আবেশ এসে মন ভরে দিয়েছিল, কে জানে? আজও বুঝতে পারে না কেতকী।

মনে পড়ে কেতকীর, সেই কবে, অনেকদিন আগে, এই ঘরের ভিতরে মামার ধমক শুনেও সেদিন চলে যেতে পারেনি কেতকী। সেদিন কিসের মায়া কেতকীর প্রাণে আকুল হয়ে উঠেছিল?

জীবনের একটা জেদের মায়া? হ্যাঁ, তা'তো ছিলই। দুর্ভাগ্যের আর অপমানের সঙ্গে হাসিমুখে লড়াই করবার জেদ। কিন্তু, সেই সঙ্গে আর একটা কল্পনার মায়া। মনে হয়েছিল, কেতকীর নিজেরই বাপ আর মা যেন কোন অভিশাপের কোপে এই ভাঙ্গা রাজবাড়ির যত ভয়ালতার মধ্যে ভয়ে ভয়ে লুকিয়ে রয়েছে। নিরুপায় ও অসহায় দুটি প্রাণ। কেউ শ্রদ্ধা করে না, কেউ ভালবাসে না, ওদের জীবনের স্নেহগুলিও ওদের নিষ্ঠুরভাবে ঠকাতে একটুও কুণ্ঠা বোধ করে না। একটা কাঙাল বাপ আর একটা কাঙাল মা।

কিন্তু আজ একি হতে চলেছে? কেতকী যে ঐ বুড়ো কমল বিশ্বাসকে একটা কাঙাল দাদু ক'রে দিয়ে চলে যাবার জন্য তৈরী হয়েছে। বিয়ে হয়ে গেলেই যে কলকাতার অফিসে বদলি নেবে নির্মল।

এর চেয়েও কঠোর প্রশ্ন আছে। কেতকীর ভীত মনের পাঁজর ঠেলে এই কঠোর প্রশ্নটাও কেতকীর ভাবনায় যেন কান্না ধরিয়ে দিচ্ছে। শুধু বুড়ো-বুড়ির কোল থেকে ঐ বেবিকে উপড়ে নিয়ে নয়, এই সংসারের খাওয়া-পরার শান্তি ও ছিন্নভিন্ন ক'রে দিয়ে চলে যেতে হবে। আজও যে কেতকী টাকা দেয় বলেই এই সংসারের চাল ডাল আর কাপড় আসে।

কে এসেছে? নির্মল? ঘরের ভিতরে আতঙ্কিতের মত চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে ঘরের বাইরের কলরবের ভাষা বুঝতে চেষ্টা করে কেতকী।

না নির্মল নয়। বাসনা এসেছে। কিন্তু কি আশ্চর্য, এ কি কথা বলছে বাসনা? এ বাড়িতে জল গ্রহণ করতেও শ্বশুরবাড়ির নিষেধ আছে যে মেয়ের; সেই মেয়েই যে চেঁচিয়ে বলছে—আগে একগেলাস জল দাও মা।

সুধাময়ী বলেন—একটু জিরিয়ে নে বাসু।

বাসনা—না, আর বেশি জিরোবার সময় নেই।

সুধাময়ী—কেন ?

বাসনা—এখনি মধুপুর রওনা হতে হবে, এখান থেকে সোজা মোটর গাড়িতেই গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোড ধরে……।

সুধাময়ী—মধুপুর কেন ?

বাসনা—এখন তো আমাকে মধুপুরেই থাকতে হচ্ছে।

কপালে হাত ছুঁইয়ে বাসনা যেন বিব্রতভাবে আক্ষেপ ক'রে ওঠে।—ওঃ; তাই তো। তোমরা বুঝবেই বা কি ক'রে ? এর মধ্যে কত ওলট-পালট যে হয়ে গেল সে খবর তোমরা কিছুই জান না বোধ হয়।

সুধাময়ী—জানবো কেমন করে ? একটা চিঠিও তো দিস না !

বাসনা—শ্বশুর মারা গিয়েছেন। কিন্তু লজ্জার কথা, তোমার জামাই তার বাপের সম্পত্তির একটি পয়সাও পায়নি।

সুধাময়ী—কেন ?

বাসনা—শ্বশুরই উইল ক'রে বড় ছেলেকে বঞ্চিত ক'রে গিয়েছেন। কেনই বা করবেন না ? মামলাতে বাপের বিরুদ্ধে সাক্ষী দেবে যে ছেলে, সে ছেলের ওপর বাপের স্নেহ থাকবে কেন বল ?

সুধাময়ী—অজিত এরকম একটা কাণ্ড করলে কেন ?

বাসনা—তোমার জামাই-এর স্বদেশী তেজ। মিথ্যে কথা বলবে না, এই প্রতিজ্ঞা। তাই সত্য কথা বলে সাক্ষী দিয়ে একটা সম্পত্তির মামলায় বাপকে হারিয়ে দিয়ে ধন্যি হয়ে গিয়েছেন।

সুধাময়ী—মধুপুরে কি করছে অজিত ?

বাসনা হেসে ফেলে—সে নয়, সে নয়। মধুপুরে আমার দেওর রমেশ থাকে। রমেশকেই সব সম্পত্তি আর টাকা উইল ক'রে দিয়ে গিয়েছেন শ্বশুর। মধুপুরেও মস্ত বড় অভ্রের ব্যবসা খুলেছে রমেশ ঠাকুরপো।

সুধাময়ী—অজিত কোথায় ?

বাসনা—সে তো সেই এলাহাবাদেই আছে।

সুধাময়ী—কেমন আছে?

বাসনা—শুনেছি একটা অসুখে পড়েছে।

সুধাময়ী ভ্রূকুটি করেন—শুনেছি কি রে? তুই তাহলে থাকিস কোথায়?

বাসনা—আমি তো মধুপুরেই থাকি।

কমল বিশ্বাসের কোটরগত চোখ মরা মানুষের চোখের মত নিষ্প্রভ হয়ে যায়, এবং সুধাময়ী তিক্তস্বরে চেঁচিয়ে ওঠেন।—তোর মাথা খারাপ হয়েছে, ছি ছি। ভগবান এত নির্দয় হন!

বাসনাও বিরক্ত হয়ে ঝংকার দেয়—ওর জন্য চিন্তা করবার কিছু নেই। এলাহাবাদে ওর কত ছাত্র-ছাত্রী আছে, ওকে দেখবার লোকের অভাব কোথায়? কিন্তু রমেশ ঠাকুরপো'কে দেখবার যে কেউ নেই। আমি না থাকলে, আর শুধু ঠাকুর চাকরের হাতে রমেশ ঠাকুরপো'কে ছেড়ে দিলে মানুষটা যত্নের অভাবে মরেই যাবে।

উঠে দাঁড়ায় বাসনা। বাগানের পথের উপর থমকে থাকা গাড়িটার দিকে তাকিয়ে বলে—রমেশ ঠাকুরপো'র সঙ্গেই এসেছি। গাড়িতে বসে আছে। সাহেব মানুষকে এখানে আর নিয়ে এলাম না।

বোবা হয়ে গিয়েছেন, এবং বোধ হয় অন্ধ হয়ে গিয়েছেন সুধাময়ী আর কমল বিশ্বাস। কথা বলেন না, বাসনার মুখের দিকে তাকানও না।

বাসনাই চেঁচিয়ে ওঠে—কই, জল দিলে না মা?

সুধাময়ী—না। ইচ্ছে হয়, নিজে নিয়ে খা।

বাসনা আক্ষেপ করে—তোমরা যেন কেমন হয়ে গিয়েছ। নিজের মেয়ের সঙ্গে একটু মায়া ক'রে কথা বলতেও...যাক্ গে, কিন্তু আমাকে তো মায়া করতেই হবে।

হাতের ব্যাগ থেকে চার-পাঁচটা এক'শো টাকার নোট বের করে বাসনা।—এই নাও মা।

কমল বিশ্বাস চেঁচিয়ে ওঠেন—বাসু!

বাসনা—কি বলছো?

কমল বিশ্বাস—তোর টাকা তোর ব্যাগের ভেতরে রেখে চুপ ক'রে জল খেয়ে চলে যা।

বাসনা আশ্চর্য হয়—টাকা নেবে না?

কমলবাবু—না।

বাসনা—কেন?

কমলবাবু—এগুলো যে তোর টাকা।

বাসনা—নিজের মেয়ের টাকা নিতে কেন যে তোমাদের এত লজ্জা, বুঝতে পারছি না। অথচ রামকানাইবাবুর ভাগ্নীর রোজগারে টাকা নিতে তো বেশ···

কমলবাবু—হ্যাঁ, নিতে বেশ আনন্দ লাগে, একটুও লজ্জা পাই না।

—বেশ! ঘরের কোণের দিকে এগিয়ে গিয়ে কলসী থেকে নিজের হাতেই গেলাসে জল ঢেলে ঢকঢক ক'রে খেয়ে হাঁফ ছাড়ে বাসনা। তারপরেই দুঃখিত স্বরে আক্ষেপ করে।—কিন্তু রামকানাইবাবুর ভাগ্নী যদি কোনদিন তোমাদের পথে বসিয়ে দিয়ে সরে পড়ে, তবে···।

কথা শেষ করবার সুযোগ পায় না বাসনা। বাগানের পথের দিক থেকে গাড়ির হর্ন পরিত্রাহি ডাকছে।

—তা'হলে আসি। মধুপুর পৌঁছেই চিঠি দেব। হন্তদন্ত হয়ে চলে যায় বাসনা।

সেই মুহূর্তে ঘরের ভিতর থেকে বের হয়ে প্রায় ছুটে এসে সুধাময়ী আর কমলবাবুর চোখের সামনে শক্ত হয়ে দাঁড়ায় কেতকী। হাঁপাচ্ছে কেতকী, দু'চোখ ছাপিয়ে তখনও ঝরে পড়ছে অফুরান

জলের ধারা, যেন সারা মন-প্রাণের জোর দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে প্রচণ্ড একটা যন্ত্রণার বিরুদ্ধে লড়াই করেছে কেতকী।

সুধাময়ী চমকে ওঠেন।—এ কি কেতকী?

কেতকী—আমি আপনাদের পথে বসিয়ে দিয়ে সরে যাব না, যেতে পারি না। বিশ্বাস করুন।

কমলবাবু—সে কথা কি আর বলতে হয় কেতকী মা।

কেতকী—তাই বলছিলাম, যদি কেউ এসে আপনার কাছে কোন কথা বলে, তবে বলে দেবেন, না, কেতকী যাবে না।

সুধাময়ী বলেন—অমন উতলা না হয়ে, একটু স্পষ্ট ক'রে বল কেতকী?

কেতকী—নির্মলবাবুর আসবার কথা আছে।

আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ান কমল বিশ্বাস। জীর্ণ চেহারা আর কোটরগত চোখ, সেই চিরকেলে কমল বিশ্বাস। কেতকীর কাছে এগিয়ে এসে কেতকীর একটা হাত শক্ত ক'রে ধরে, তেমনই শক্ত স্বরে প্রশ্ন করেন—একবার স্পষ্ট করে বল তো মা? নির্মল তোমাকে বিয়ে করতে চায়?

কেতকী মাথা হেঁট করে—হ্যাঁ।

কমলবাবু—তুমিও চাও?

কেতকী—হ্যাঁ, কিন্তু …।

কেতকীর মাথাটাকেই বুকে জড়িয়ে ধরে কেতকীকে এক মুহূর্তের মধ্যে বোবা ক'রে দেন কমল বিশ্বাস। তারপরেই কেঁদে চেঁচিয়ে ওঠেন—কোন কিন্তু টিন্তু শুনতে চাই না কেতকী। এই তো, শুধু তোমার মুখ থেকে এই কথাটি শোনবার আশায় বেঁচে আছি কেতকী। আমার জীবনের শেষ চক্রান্ত তুমি ধরতে পারনি কেতকী।

কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়েন কমল বিশ্বাস। এবং বসে পড়েই যেন পরম বিশ্রান্তির আনন্দে হাঁপ ছেড়ে বলেন—আঃ।

কেতকী বলে—আপনি আমার মাথায় একটু হাত রাখুন মা। বড় কষ্ট হচ্ছে।

কেতকীর মাথায় হাত রেখে সুধাময়ী বলেন—ছিঃ, তুমি মিছে ভেবে কষ্ট পাচ্ছ কেতকী। ঠাকুরের কাছে এই মানতই করেছিলাম যে…।

কেতকী—কি?

সুধাময়ী—তুমি যেন তোমার মনের মত স্বামী পাও।

দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে ওঠে কেতকী—কিন্তু…।

কমলবাবু—আবার কিন্তু কেন কেতকী? এমন আনন্দের মধ্যে আবার চোখের জল কেন?

কেতকী—আপনাদের কি উপায় হবে বুঝতে পারছি না।

কমলবাবু—তোমার কথাও আমি ঠিক বুঝতে পারছি না কেতকী।

কেতকী—আপনাদের দিন চলবে কি ক'রে? এতদিন না হয় আমি ছিলাম, আর আমার চাকরিটা ছিল বলে…।

—তাই বল। হো হো ক'রে হেসে আর চেঁচিয়ে ওঠেন কমল বিশ্বাস। তাঁর চক্রান্তময় জীবনের সব চেয়ে বড় ধূর্ততার আনন্দটা যেন গর্ব ক'রে চেঁচিয়ে উঠেছে।—কমল বিশ্বাস দুর্বল নয় কেতকী। সে জানে কেমন ক'রে দিন চালাতে হয়। তোমার রোজগারের টাকায় ভাত খাবার লোভে নয়; শুধু তোমাকে কাছে রাখবার লোভে দুর্বল সেজেছিলাম। আমার ভণ্ডামি ধরবার সাধ্যি তোমার হয়নি কেতকী।

কেতকীর চোখের বিস্ময় ছলছল করলেও তার মধ্যে একটা সন্দেহের ছায়াও যেন আছে। কমল বিশ্বাসের কথাগুলিকে একটা অভিমানের, একটা দুর্বল অহংকারের মুখরতা বলে মনে হয়। এই বাড়ির এই দুটি রোগা-রোগা ক্লান্ত মানুষের প্রাণে কেতকীকে কাছে রাখবার জন্য মায়ার টান নিশ্চয় ছিল; কিন্তু কেতকীকে

কাছে রাখবার দরকারও ছিল। সে সত্য আজ অস্বীকার ক'রে, কেতকীর বিষন্ন জীবনের একমাত্র তৃপ্তিকে তুচ্ছ ক'রে কি লাভ হচ্ছে কমল বিশ্বাসের? বাধ্য হয়ে অভাবে পড়ে অসহায় হয়ে যেতে হয়েছে বলে কেতকীর রোজগারের টাকা হাত পেতে নিতে হয়েছে; কিন্তু সেটা ভণ্ডামি হবে কেন?

কেতকীর মনের প্রশ্ন আর চিন্তাগুলিও যেন কতগুলি অভিমান। সে অভিমান ঢাকতে গিয়ে মনের ভিতরে একটা ব্যথাও বাজে। বুড়ো বুড়ির কষ্টের জীবনে অন্তত খাওয়া-পরার অভাবটাকে দূরে সরিয়ে দিতে পেরেছিল কেতকী; কেতকীর জীবনের এই কৃতার্থতা যে এই বাড়ির কৃতজ্ঞতা আশা করে; এবং সে আশা একটুও অন্যায় আশা নয়। কেতকীর কাছে কোন ঋণ নেই, কেতকী এই ভাঙ্গা-বাড়ির কোন উপকারে লাগেনি, এই কথাই কি বলতে চাইছেন কমল বিশ্বাস? এমন কথা বললে যে নিষ্ঠুর কপটতা করা হয়।

কেতকী বলে—আমি আপনাদের কেউ নই, পর হয়েও কাছে ছিলাম, এই মাত্র। কিন্তু তবু আমার সাধ্যিমত আমি যা পেরেছি ...।

কমল বিশ্বাস হাসেন—তুমি তা করেছ কেতকী মা। তুমি আমাদের বাঁচিয়েছ।

কেতকী—তা হলে বলুন...।

কমল বিশ্বাস—তোমার কাছে আমরা যে কি ঋণে ঋণী; তা শুধু ঠাকুরই জানেন।

কেতকীর প্রাণটাই যেন এইবার লজ্জা পেয়ে চমকে ওঠে। কুণ্ঠিতভাবে বলে—সেই জন্যেই বলছিলাম...।

কেতকীর কথা শেষ হবার আগে ছোট একটা কাঠের বাক্স খুলে দলিল-পত্রের মত চেহারা একটা কাগজ বের ক'রে কেতকীর হাতের কাছে এগিয়ে দিয়ে প্রাণখোলা প্রবল খুশির উচ্ছ্বাসে হেসে ওঠেন কমল বিশ্বাস—এই বাড়ির বাগান জমি ও পুকুর, সবই

তোমার নামে লিখে দিয়েছি কেতকী। নাও, তোমার যাবার আগে তোমাকে এটা দেব, এই চক্রান্ত করেছিলাম।

কেতকী স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকে। সুধাময়ী বলেন—বুড়ো মানুষের জীবনের শেষ সাধ, নাও কেতকী।

আবার দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে ওঠে কেতকী। কি ভয়ানক চক্রান্ত। এবং মানুষকে কি ভয়ানক জব্দ করতে পারে এবাড়ির চক্রান্তের এই বুড়ো-বুড়ি। জীবনে কোন দিন পূজোটুজো করবার বাতিক ছিল না কেতকীর; দেবতা-টেবতা আছে কি না আছে, এ প্রশ্ন নিয়েও কোনদিন মাথা ঘামাবার দরকার বোধ করেনি। কিন্তু আজ যেন বুকের ভিতরটা ভয়ে বিস্ময়ে ও শ্রদ্ধায় ব্যাকুল হয়ে প্রশ্ন করতে থাকে, দুই দুটি চক্রান্তের মানুষ দুটি দেবতার ছদ্মমূর্তি নয় তো?

চোখ মুছে নিয়ে কেতকী বলে—ঠিক কথাই বলেছেন, আপনাদের বোঝাবার সাধ্যি আমার হয়নি! আমার সাধ্যির কথা ছেড়ে দিন, কারও সাধ্যি হয়নি। যাই হোক···আমাকে মেরে ফেললেও ও দলিল আমি নেব না।

কমল বিশ্বাসের চোখ করুণ হয়ে ওঠে।—কেন কেতকী, তুমি কি সত্যিই আমাদের পর মনে করলে?

কেতকীর চিরকেলে শান্ত চোখ দুটো কঠোর হয়ে কটকট ছটফট করতে থাকে—আমাকে কোন প্রশ্ন করবেন না। মোটকথা, আপনাদের বাড়ি বাগান জমি আর পুকুর কেড়ে না নিয়ে গেলেও আমার চলবে। শুধু আপনাদের একটি যে জিনিষ কেড়ে নিয়ে যাচ্ছি, তাই নিয়ে চলে দিতে দিন।

—কি? শঙ্কিতভাবে প্রশ্ন করেন সুধাময়ী।

—কি জিনিস কেতকী? আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করেন কমল বিশ্বাস।

কেতকী কেঁদে ফেলে—বেবিকে ছেড়ে দিতে যে আপনাদের বুক ভেঙ্গে যাবে বাবা। আমাকে ক্ষমা করুন।

হো হো ক'রে হাসতে গিয়ে হাউমাউ ক'রে কেঁদে ওঠেন কমল বিশ্বাস।—সত্যি কথা, খুব সত্যি কথা কেতকী। তুমি এই ভাঙ্গা বাড়ির সোনা নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছ। খালি হয়ে গেলাম, একেবারে শূন্য হয়ে গেলাম। ভালই হলো···কি বল সুধা? তুমি কথা বলছো না কেন?

সুধাময়ী বলেন—ভালই হলো। এবার চল, সবাইকে আশীর্বাদ ক'রে সরে পড়ি।

কমল বিশ্বাস বলেন—তা'হলে শর্মাজীকে একটা চিঠি দিতে হয়।

আতঙ্কিতের মত তাকিয়ে প্রশ্ন করে কেতকী—কিসের চিঠি? শর্মাজী কে?

কমলবাবু আবার চেঁচিয়ে হেসে ওঠেন, এবং সুধাময়ীর মুখেও একটা শান্ত হাসি মিট মিট করে। কমল বাবু বলেন—আমাদের আর একটা চক্রান্ত; তোমার শুনে কাজ নেই কেতকী।

আশ্চর্য হয়েছে, একটু উদ্বিগ্ন হয়েছে, এবং বেশ একটু অসুবিধায় পড়েছে চাকর ভাগবত। দু'জায়গায় খাবার বয়ে নিয়ে যেতে হয়। একবার এই ফ্ল্যাটেরই ঐ ঘরে, যেখানে বাবু চুপটি ক'রে চেয়ারের উপর বসে থাকেন আর সবসময় কি যেন ভাবেন। আর একবার পাশের ঐ সাজানো ফ্ল্যাটের ঘরে, যেখানে সোফার উপর চুপটি ক'রে মা বসে থাকেন, আর কি-যেন ভাবেন।

সন্ধ্যার সময় বাইরে থেকে ফিরে এসে বাবু যখন এই ঘরের ভিতরে ঢুকে আবার ঐ চেয়ারের উপর চুপটি ক'রে বসে থাকেন, তখন ভাগবতেরও ছুটি হয়। বাবুর হাতের কাছে এক পেয়ালা

চা এগিয়ে দিয়ে, আর দুই ফ্ল্যাটের দুই ভিন্ন ঘরের টেবিলে খাবার ঢাকা দিয়ে বাড়ি চলে যায় ভাগবত। তারপর, অর্থাৎ সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত বাবু আর মা'র এই নীরব বিচ্ছেদের জীবন কিভাবে চলে, সেটা অনুমান করতে পারে না। কিন্তু সকাল হলে, ক্যামাক ষ্ট্রীটের এই বাড়ির কাজের দায় হাতে তুলে নেবার আগে রোজই একবার আশ্চর্য হয় ভাগবত। এসেই সবার আগে এই ঘরের মেজের উপর থেকে একটা সতরঞ্চিকে গুটিয়ে তুলে রাখতে হয়। একটা বালিশকেও। বুঝতে অসুবিধা নেই ভাগবতের ; বাবু আজকাল মেজের উপর এইভাবে শুধু একটা সতরঞ্চির উপর একা একা শুয়ে থাকেন, আর ঘুমিয়ে বা না ঘুমিয়ে রাত ভোর ক'রে দেন।

ঐ ফ্ল্যাটের সাজানো ঘরের সোফার উপর থেকেও একটা বালিশ তুলে নিয়ে সরিয়ে রাখতে হয়। বুঝতে অসুবিধা নেই ভাগবতের, ভয়ানক রাগ করেছেন কিংবা দুঃখিত হয়েছেন মা। তা না হলে এই সোফার উপর শুয়ে রাত ভোর করবেন কেন ?

মনে হয় ভাগবতের, সন্ধ্যাবেলা ঘরে ফিরে এসেও ঘরের মধ্যে বোধ হয় বেশিক্ষণ থাকেন না বাবু। বার বার ঘড়ির দিকে তাকান। এবং এক একদিন ভাগবত নিজেই দেখতে পায়, হঠাৎ ছটফট ক'রে উঠলেন আর বাইরে চলে গেলেন বাবু।

এইরকম অবস্থা যে-দিন হয়, সেদিন সব চেয়ে বেশি অসুবিধায় পড়ে ভাগবত। ঘর তালাবন্ধ ক'রে চলে যাওয়া যায় না, এবং দরজা খোলা রেখেও চলে যাওয়া যায় না ; কারণ মা এখনও ফেরেননি।

সেদিনও অন্য দিনের মত সন্ধ্যাটা যখন বেশ ঘনিয়েছে, আর ক্যামাক ষ্ট্রীটের পথের সব আলো জ্বলে উঠেছে, তখন ফ্ল্যাটের দরজার কাছে সিঁড়ির উপর দাঁড়িয়ে সেই কথা ভাবে ভাগবত, যে-কথা এই ক'দিন ধরে রোজই ভাবে। এই চাকরি বোধ হয় আর বেশি দিন করা চলবে না।

একটা গাড়ি এসে দাঁড়ালো। গাড়ি থেকে নামলেন মা, এবং সেই তিন সাহেব। পাশের সাজানো ফ্ল্যাটের ঘরের দরজার পর্দা সরিয়ে সকলে ভিতরে ঢুকে পড়তেই খুশি হয় ভাগবত। এবং এতক্ষণে বাড়ি যাবার সুযোগ পায়।

সাজানো ফ্ল্যাটের ঘরটাই হেসে ওঠে। সত্যিই হাসিয়ে পেটে খিল ধরিয়ে দেবার মত গল্প বলতে শুরু ক'রে দিয়েছে গাঙ্গুলী।

ইণ্ডিয়া না ইজিপ্ট? কোন্ দেশের সভ্যতা আর কালচার বেশি পুরনো? এই দুই প্রাচীন সভ্যদেশের মধ্যে কোন্ দেশের সভ্যতা কার তুলনায় কত বেশি উন্নত ছিল? বলতে পারেন কাজরী বিশ্বাস?

কাজরী হাসে—অসম্ভব।

অসিত দত্ত বলেন—ইজিপ্টের সভ্যতা।

গাঙ্গুলী—আপনি কি বলেন জীমূত বাবু?

জীমূত বাবু—ইণ্ডিয়া।

গাঙ্গুলী—রাইট্।

অসিত ও কাজরী—কেন? কেন? ইণ্ডিয়ার সভ্যতা বেশি পুরনো, তার প্রমাণটা কি?

গাঙ্গুলী—একবার অক্সফোর্ডে এক ইজিপশিয়ান ছাত্র আর এক ইণ্ডিয়ান ছাত্রের মধ্যে ভয়ানক তর্ক বেধেছিল। ইজিপশিয়ান ছাত্রটি বললে—কাইরোর কাছে একটা বাগানে কুয়ো খুঁড়তে খুঁড়তে প্রায় সাতশো ফুট গভীরে পাথরের স্তরের মধ্যে কি পাওয়া গিয়েছিল জান?

ইণ্ডিয়ান ছাত্র—কি?

ইজিপশিয়ান ছাত্র—তামা আর ইস্পাতের এক গাদা তার।

ইণ্ডিয়ান ছাত্র ভ্রুকুটি করে—তাতে কি প্রমাণিত হলো?

ইজিপশিয়ান ছাত্র—ইজিপ্টের পুরনো সভ্যতা কত উন্নত ছিল; তাই প্রমাণিত হচ্ছে না কি?

ইণ্ডিয়ান ছাত্র—তার মানে ?

ইজিপশিয়ান ছাত্র—আমাদের সেই অতি প্রাচীন ইজিপ্টে টেলিগ্রাফ ছিল।

ইণ্ডিয়ান ছাত্র—আমাদের দেশেও বেনারসের কাছে একবার একটা কুয়ো খোঁড়া হয়েছিল। হাজার ফুটেরও বেশি গভীরে গিয়ে পাথর ফাটিয়ে কিছুই পাওয়া গেল না।

ইজিপশিয়ান ছাত্র ভ্রূকুটি করে—তাতে কি প্রমাণিত হলো ?

ইণ্ডিয়ান ছাত্র—ইণ্ডিয়ায় পুরনো সভ্যতা ইজিপ্টের সভ্যতার চেয়ে কত বেশি উন্নত ছিল, তাই প্রমাণিত হলো।

ইজিপশিয়ান ছাত্র—তার মানে ?

ইণ্ডিয়ান ছাত্র—তার মানে, আমাদের সেই অতি প্রাচীন ইণ্ডিয়াতে বেতার ছিল।

সাজানো ফ্ল্যাটের ঘরে হাসির হররা আবার উদ্দাম হয়ে ওঠে। কিন্তু হঠাৎ হাসি থামিয়ে যেন একটু আনমনা হয়ে যায় কাজরী।

কাজরীর হাসির ধরন আজকাল যে একটু অন্যরকমের হয়ে যায়, সেটা আর কারও কানে ধরা পড়ুক বা না পড়ুক, কাজরীর নিজেরই কানে অনেকবার ধরা পড়ে গিয়েছে। মুখের এই হাসির ছন্দটাকে যেন থেকে থেকে একটা খোঁচা দিয়ে ছিঁড়ে দিচ্ছে বুকেরই ভিতরের একটা আহত অহংকারের জ্বালা। কাজরীর এই সুন্দর শরীরটাকে গালি দিয়ে অপমান করবার সাহস পেল অতীনের মত মানুষ ? ভাল লাগে না কাজরীকে ? কথাটা কত সহজে বলে দিল একটা অকৃতজ্ঞতা, একটা ভুয়ো অহংকার, নিজেরই শরীরটাকে মাটি ক'রে দিয়ে অসার হয়ে গিয়েছে যে পুরুষ।

কি মনে করেছ অতীন, পৃথিবীর চোখ কি ওর চোখের মতই অন্ধ হয়ে গিয়েছে ? কাজরীর মুখের দিকে তাকাবার মত, কাজরীর হাতের একটি স্পর্শ পেয়ে ধন্য হয়ে যাবার মত মানুষ কি

এই পৃথিবীতে নেই? কাজরীর চোখের দৃষ্টির কোন তৃষ্ণাকে অভিনন্দিত করবার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠবার মত মানুষ নেই?

এই ক'দিনের ঘুমের মধ্যে ঐ একই স্বপ্ন দেখে ছটফট করেছে কাজরী। স্বপ্নের মধ্যে ঐ একই প্রশ্ন কাজরীর ঘুমটাকেও ভাবিয়েছে। এই মুহূর্তে যদি একবার আভাসে একটা ইচ্ছা জানিয়ে হাত এগিয়ে দেয় কাজরী, তবে কাজরীর সেই হাত ব্যগ্রভাবে তুলে নেবার জন্য হাত বাড়িয়ে না দিয়ে থাকতে পারবে কি অসিত? কিংবা জীমূত, নয়তো গাঙ্গুলী? অতীনের চেয়ে গুণে মানে রুচিতে ও টাকায় অনেক মহৎ এই তিনটি উদার মানুষকে শুধু মুখের হাসি ছাড়া আর কোন উপহারে প্রীত করেনি কাজরী, কিন্তু ওরা যে তাতেই ধন্য। এর বেশি উপহারের প্রতিশ্রুতিকে যদি ওদের কারও কানের কাছে একবার একটু ফিসফিসও ক'রে শুনিয়ে দিতে পারে কাজরী, তবে কাজরীর মত নারীকে বিয়ে ক'রে জীবনের সঙ্গিনী ক'রে নিতে তার বুকের ভিতরে কি পৌরুষের গর্ব অস্থির হয়ে উঠবে না?

জানতে চায়, বুঝতে চায়, আশ্বাস পেতে চায় এবং আরও ভাল ক'রে বিশ্বাস করতে চায় কাজরী, কাজরীর জীবনকে ভালবেসে আর শ্রদ্ধা দিয়ে আপন ক'রে নেবার মত মানুষ কাজরীর চোখের সামনেই আছে। তাহলেই আবার প্রাণ খুলে হাসতে পারবে কাজরী, আর সে হাসি একটুও ক্ষুণ্ণ হবে না। অতীনের মুখের সেই ধিক্কারকে একটা ছোটলোকের গালির ভাষা বলে মনে ক'রে অনায়াসে তুচ্ছ করতে আর ভুলে যেতে পারবে কাজরী। এবং যদি মন চায়, তবে বিয়ে করতেও একটুও দ্বিধা করবে না কাজরী। ওদের মধ্যে কার সঙ্গে কাজরীর বিয়ে হওয়া উচিত, সে চিন্তা আজকের চিন্তা নয়। আজ শুধু কাজরীর বিষন্ন প্রাণটা জেনে নিতে চায়; ওদের চোখগুলি অতীনের চোখের মত অন্ধ হয়ে যায় নি।

কাজরী হাসে—আজও কি আপনারা আর্ট এগজিবিশনের কথাটা একটুও চিন্তা করবেন না? শুধু হাসবেন?

জীমূত হাসে—রাখুন আপনার আর্ট এগজিবিশন? আপনিই তো মূর্তিমতী আর্ট।

কাজরী—বাঃ, বেশ বললেন! রোজই এ'রকম ফাঁকির কথা দিয়ে ··।

অসিত বাধা দেয়—আপনি কি সত্যিই আজও বিশ্বাস করতে পারলেন না যে, আপনিই হলেন আমাদের···।

কাজরী মুখে রুমাল ছুঁইয়ে আর ভুরু কুঁচকে তাকায়—কি?

অসিত—আপনিই হলেন আমাদের আসল ইনস্পিরেশন।

গাঙ্গুলী হাত তুলে অভিনেতার মত আবেগময় একটা ভঙ্গী ক'রে বলে—আপনি কি দেখতে পান না কাজরী বিশ্বাস আমাদের এই হাসির ভিতরে অশ্রু ঝরঝর করছে?

খিলখিল ক'রে হেসে ওঠে কাজরী—কিসের অশ্রু?

গাঙ্গুলী—হিংসের অশ্রু?

কাজরী—হিংসে? কার ওপর হিংসে?

গাঙ্গুলী—অতীন বাবুর সৌভাগ্যের ওপর?

হাসতে চেষ্টা ক'রেও গম্ভীর হয়ে যায় কাজরী, এবং চোখের তারা দুটো ঝিক ক'রে জ্বলে ওঠে—মিথ্যে ঠাট্টা ক'রে লাভ কি?

অসিত হঠাৎ বলে ওঠে—একটুও মিথ্যে নয়।

জীমূতও গম্ভীর হয়ে বলে—ঠাট্টাও নয়।

এমন কি গাঙ্গুলীও গম্ভীর হয়ে গিয়ে সুন্দর এক প্রশস্তির সুরে গলার স্বর ভরে দিয়ে আস্তে আস্তে বলে—আমি ঠাট্টার ভঙ্গীতে কথাটা বলেছি বটে; কিন্তু খুব সত্যি কথা বলেছি।

দেখতে পায় কাজরী, এবং কাজরীর মনের সব চেয়ে বড় কৌতূহলের সব বেদনা সেই মুহূর্তে মুছে যায়। তিনটি মানুষের মত মানুষ, তিনটি শ্রদ্ধার দৃষ্টি গম্ভীর হয়ে কাজরীর জীবনকে

অভ্যর্থনা করবার স্বপ্নে যেন বিভোর হয়ে রয়েছে; আশ্চর্য হয়ে, একেবারে পরিপূর্ণ বিশ্বাসে নিশ্চিন্ত হয়ে যায় কাজরীর মন।

হেসে ওঠে কাজরী—আর একটা গল্প বলুন মিস্টার গাঙ্গুলী।

গাঙ্গুলী বলে—তার আগে একটা কথা জেনে নিতে চাই?

কাজরী—বলুন।

গাঙ্গুলী—আপনার জন্মদিনটার আর দেরি কত?

অসিত আর জীমূতও একসঙ্গে গলা মিলিয়ে অভিযোগ করে। —হ্যাঁ, গত বছরের মত এবারও আপনি যদি আমাদের তুচ্ছ ক'রে নিমন্ত্রণ করতে ভুলে যান, তবে কিন্তু···।

মাথা হেঁট করে কাজরী। মিথ্যে নয় অভিযোগ। এবং মনে পড়তেই কাজরীর বুকটা দুঃসহ এক ভুলের লজ্জায় ব্যথিত হয়ে ভাঙ্গা-ভাঙ্গা নিঃশ্বাস ছাড়ে। কাজরীর জীবনকে যারা বিনা স্বার্থে এতদিন ধরে নীরবে শ্রদ্ধা ক'রে আর ভালবেসে এসেছে, জন্মদিনের আনন্দে তাদেরই নিমন্ত্রণ করতে ভুলে গিয়েছিল কাজরী।

কাজরী বলে—বেশ তো, এবার নিশ্চয়ই জানতে পারবেন।

অসিত—এবার আমরাই আপনার জন্মদিনের উৎসবের ভার নিলাম। আপনার কোন আপত্তি গ্রাহ্য করবো না।

জীমূত—উৎসবের ভেন্যু হোক···।

গাঙ্গুলী বলে—কাফে মেটকাফ আমার হাতেই রয়েছে। একবার ফোন ক'রে বলে দিলেই সব ব্যবস্থা এক ঘণ্টার মধ্যে হয়ে যাবে।

অসিত—খুব ভাল কথা।

কাজরী হাসে—আমার আর কিছু বলবার নেই।

বুঝতে পেরেছে, এবং দেখতেও পেয়েছে অতীন, যারা রাগ করেছিল, তারা আবার খুশি হয়েছে। মাঝখানে অনর্থক একটি মাস কাজরীকে শুধু উদ্বিগ্ন হয়ে ছুটোছুটি ক'রে আর চিঠি লিখে লিখে হয়রান হতে হয়েছে। ক্যামাক ষ্ট্রীটে নতুন বিলডিং-এর

একটি ফ্ল্যাটের ঘর একেবারে নীরব হয়ে গেলেও পাশের ফ্ল্যাটের নীড়ে আবার উল্লাসের জীবন জেগে উঠেছে। কাজরীর জীবনের উদ্বেগ ক্ষান্ত হয়ে গিয়েছে।

অতীনের সঙ্গে কাজরীর কোন কথা বিনিময়ের প্রয়োজন হয় না। ওরা শুধু আছে, এই মাত্র। পোড়া বিছানার চাদরটা আজও বদলে দেবার সুযোগ পায়নি ভাগবত, তাই বিছানাটাকে শেষ পর্যন্ত একেবারে গুটিয়ে রেখেছে।

পার্ক ষ্ট্রীটের অটোমোবিল শো-রুমে এমন কোন নতুন কাজে দায় বিপুল হয়ে দেখা দেয়নি, যার জন্য অতীনের পক্ষে এত তাড়াতাড়ি ভাগবতের হাত থেকে শুধু চা-এর পেয়ালাটা ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে এক চুমুকেই চা শেষ করে এই সকালে বের হয়ে যাবার কোন দরকার হতে পারে। তবু তাই করে অতীন। এই ঘরের ছোঁয়া থেকে পালিয়ে যাবার জন্য যেন মরিয়া হয়ে চেষ্টা করছে অতীন, কিন্তু চেষ্টাটা যেন রাত হলেই ক্লান্ত হয়ে যায়। আবার এই ঘরেই ফিরে আসে অতীন। তবে কি শেষ দেখতে চায় অতীন? কিন্তু যা হয়ে গিয়েছে, তার পরেও কি আবার কোন শেষ আছে?

বের হবার জন্য তৈরী হয়ে আর খবরের কাগজটা হাতে নিয়ে অন্য দিনের মত সেদিনও একবার দরজার কাছে থমকে দাঁড়ায় অতীন। অন্য দিনের মতই গম্ভীর হয়ে ভাবে, কাজরীকে সেই কথাটা বলে দিয়ে চলে গেলেই তো ভাল ছিল। কিন্তু বলতে পারে না অতীন। কেমন যেন সন্দেহ হয় অতীনের, এখনও বোধ হয় সময় আসেনি। নিজের মনটাকেও অনেকবার সন্দেহ ক'রে বুঝতে চেষ্টা করেছে অতীন, এখনও কি কাজরী নামে এই নারীর জন্য অতীনের মনের গভীরে কোন মায়া মুখ লুকিয়ে গুনগুন ক'রে কাঁদে?

যাবার জন্য পা বাড়িয়েও হঠাৎ বাধা পেয়ে আবার থমকে দাঁড়ায় অতীন। পাশের ফ্ল্যাটের ভিতর থেকে হঠাৎ বের হয়ে

আর কাছে এগিয়ে এসে কি-একটা কথা বলেছে কাজরী; ঠিক শুনতে পায়নি অতীন, কারণ হঠাৎ এভাবে কাজরীর মুখের কোন সরব ভাষা শোনবার জন্য মনটা প্রস্তুতও ছিল না।

অতীন—কিছু বললে?

কাজরী—হ্যাঁ।

অতীন—কি ?

কাজরী—আজ আমার জন্মদিন।

অতীনের মনের কপাটে যেন হঠাৎ একটা ধাক্কা লাগে। তাই তো! এই সেই কাজরী, যার জন্মদিনের বাতাস সুরভিত করবার জন্য সারা মার্কেট তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজে সব চেয়ে সুন্দর গাজিপুরী গোপালের স্তবক কিনেছিল অতীন। সেদিনের মত আজও একেবারে মরিয়া হয়ে মনের সব আগ্রহ আর চেষ্টা ঢেলে দিয়ে নিজেকে সুন্দর ক'রে সাজিয়েছে কাজরী।

গলার মধ্যেও একটা দুর্বলতা বোধ করে অতীন। আস্তে আস্তে বলে, এবং বলতে গিয়ে সারামুখ জুড়ে একটা করুণ হাসি ফুটে ওঠে।—তা···সত্যিই···ভুল ক'রে···আমার মনেই পড়েনি কাজরী, আজ তোমার জন্মদিন।

কাজরী—তাতে কোন ক্ষতি নেই। আমি বলতে এসেছি, আজ আমার ফিরতে একটু দেরি হতে পারে।

অতীন অন্যদিকে মুখ ফেরায়—কেন ?

কাজরী—যাচ্ছি আমার জন্মদিনের উৎসবে।

অতীন—চন্দননগরে ?

কাজরী—না। অন্য জায়গায়।

অতীন—কোথায় তোমার জন্মদিনের উৎসব, বলতে বাধা আছে ?

কাজরী—একটুও না। এখন যাচ্ছি কাফে মেটকাফ, তারপর ডায়মণ্ড হারবার পর্যন্ত ষ্টিমার ট্রিপ আছে।

অতীন—বোধ হয় তোমার কালচারের বন্ধুরা এই উৎসব অর্গানাইজ করেছে ?

কাজরী—সেটা আর জিজ্ঞেস করছো কেন ?

অতীন মুখ ফিরিয়ে কাজরীর লাল ঠোঁট, কালো চোখ, পাউডারে চোবানো গলা, আর সিল্কের ফুরফুরে পাতলা শাড়ির রঙীন আঁচলের দিকে তাকায়। চোখ দুটো হিংস্র হয়ে জ্বলে উঠলেও গলাটাকে প্রাণপণে যেন শেষ মায়ার জোর দিয়ে ভিজিয়ে একটু কোমল ক'রে রাখতে চায় অতীন। আস্তে আস্তে, গভীর অনুরোধের সুরে বলে—যেও না কাজরী।

কাজরী—সে উপদেশ তুমি দিও না।

চেঁচিয়ে ওঠে অতীন—তবে কেন আমার কাছে এত বড় আনন্দের সংবাদ জানাতে এসেছ ?

কাজরী—ফিরতে অনেক দেরি হতে পারে।

অতীন—এ কথাই বা আমাকে জানাবার দরকার কি ?

কাজরী—তুমি যেন ফিরতে দেরি করো না।

অতীন—এই আদেশের অর্থও বুঝলাম না।

কাজরী—ঘরে অনেক দামী আর দরকারী জিনিস আছে।

অতীন হাসে—তাই বল। তোমার যত দামী আর দরকারী জিনিস পাহারা দেবার জন্য আমাকে তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে, কেমন ?

কাজরী—তোমার মনে কিছুমাত্র কৃতজ্ঞার বোধ থাকলে এভাবে হাসতে পারতে না, আর এরকম প্রশ্নও করতে পারতে না ?

অতীন তবুও হাসে, হঠাৎ বাতাস লেগে আগুনের ধিকিধিকি আলো যেমন দপ ক'রে হেসে ওঠে।—কৃতজ্ঞতা ?

কাজরী—হ্যাঁ। তোমারই জন্যে আমাকে অনেক নীচে নামতে হয়েছে ; অনেক অ্যামবিশন অনেক প্রসপেক্ট ছেড়ে দিতে হয়েছে।

লোকের চোখে আমাকে ছোট হয়ে যেতে হয়েছে অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে।

অতীনের চোখের তারা দুটো যেন পুড়তে শুরু করেছে। কাজরীর মুখের দিকে একটা দাউ-দাউ দৃষ্টির হল্‌কা ছুঁড়ে দিয়ে অতীন বলে—সত্যি কথা বলতে গিয়ে একটা ভয়ানক মিথ্যে কথা বলে ফেললে।

কাজরী—কি বললে ?

অতীন—সত্যি কথা হলো, তুমি অনেক বড় বড় প্রসপেক্ট ছেড়ে দিয়ে, অনেক নীচে নেমে আর ছোট হয়ে গিয়ে আমাকে বিয়ে করেছ।

কাজরী—সেটা মনে মনে স্বীকার করতে পারছো কি ?

অতীন—খুব পারছি ; কিন্তু তোমার ভয়ানক মিথ্যে কথাটা এই যে, আমার জন্যে তুমি নীচে নেমেছ। আমার জন্যে নয় ; নিজের জন্য। তুমি তোমার একটি মাত্র ইচ্ছার তৃপ্তির জন্য নীচে নেমেছে।

কাজরী—কি ?

চেঁচিয়ে ওঠে অতীন—তুমি স্বামী চাওনি, শুধু একটা পুরুষ চেয়েছিলে। তুমি শুধু তোমার শরীরটাকে মেয়েমানুষ বলে মনে কর, নিজেকে মেয়েমানুষ বলে মনে করতে পারনি।

কাজরী—এরকম অভদ্র কথা আমিও তোমাকে বলতে পারি।

অতীন—বলে ফেললেই পার।

কাজরী—তুমি আর নিজেকে পুরুষ বলে মনে করছো কোন্ অহংকারে ?

অতীন—কি বললে ?

কাজরী—সোজা কথা সোজা ভাষায় বলে দিয়েছি। তোমার সে অহংকারও যে মাটি হয়ে গিয়েছে, ভুলে যাচ্ছ কেন ?

আর কোন কথা বলে না কাজরী। আর এক মুহূর্তও অতীনের

সেই স্তব্ধ ও নীরক্ত ফ্যাকাশে মুখের দিকে ভ্রূক্ষেপ না ক'রে, সিল্কের ফুরফুরে পাতলা শাড়ির রঙীন আঁচলটাকে একটা ধিক্কারের রঙীন উল্লাসের মত দুলিয়ে দিয়ে ঘর ছেড়ে চলে যায়।

ঘরের ভিতর নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে অতীন। ভাগবত এসে বার বার উঁকি দিয়ে দেখে যাচ্ছে, তাও বোধহয় বুঝতে পারে না অতীন। শুধু বুঝতে পারে, কপালটা ঠাণ্ডা ঘামে একেবারে ভিজে গিয়েছে। আরও বুঝতে পারে, খুব সত্যি কথাই বলে দিয়ে চলে গিয়েছে কাজরী। অতীনের শরীরের রক্তকণাগুলি কাজরীব সেই সত্য কথা শুনতে পেয়ে লজ্জায় জল হয়ে গিয়েছে। এই শরীর কোন নারীর স্বামীর শরীর নয়; একটা পুরুষেরও শরীর আর নয়। খুনে আসামী দায়রা আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে ফাঁসির হুকুম যখন শোনে, তখন তারও মুখটা এইরকম স্তব্ধ নীরক্ত ও ফ্যাকাশে হয়ে যায়। অতীন বিশ্বাসের জীবনের চরম উদ্‌ভ্রান্তির অহংকার এইবার চূড়ান্ত রায় শুনতে পেয়ে রক্তহীন হয়ে গিয়েছে।

পাগলের মত হেসে কেঁদে আর হো হো ক'রে চেঁচিয়ে নিজেকেই বোধহয় একটা ধিক্কার দিত অতীন, কিন্তু ভাগবত হঠাৎ এসে প্রশ্ন করে—আপনি কি এখন বাইরে যাবেন বাবু?

চমকে ওঠে অতীন।—হ্যাঁ।

ভাগবত—সন্ধ্যার আগে ফিরবেন তো বাবু?

—কেন?

—সন্ধ্যাতে ছুটি না পেলে আমার বাড়ি ফিরতে বড় কষ্ট হয় বাবু। অনেক দূরে থাকি, বেহালা ছাড়িয়ে সেই ঘোলসাহাপুর।

কি-যেন ভাবে অতীন। কাজরীকে কি-যেন বলবার ছিল, কিন্তু বলা হয়নি। বলবার সময় বোধহয় এখনও আসেনি।

অতীন বলে—বেশ, সন্ধ্যার আগেই ফিরবো।

ঘর থেকে বের হয়ে, একটা শ্রান্ত ক্লান্ত অলস ও আহত প্রাণীর

মত আস্তে আস্তে হেঁটে সিঁড়ির তিনটে ধাপ নামতেই অতীনের আনমনা চোখ দুটো একটা সাদা শাড়ীর ফুরফুরে আঁচলের দোলানো ছায়ার ছোঁয়া লেগে হঠাৎ চমকে ওঠে।

ডাক্তার বিজয়া। এই ঘরেরই দিকে এগিয়ে আসতে আসতে সিঁড়ির কাছে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে বিজয়া।

বিজয়ার মুখের দিকে চোখ পড়তেই জ্বলে ওঠে অতীনের চোখ। বিজয়ার ছায়াটাকেও একটা অস্পৃশ্য ও অশুচি ছায়ার মত ঘৃণ্য বলে মনে হয়। পাশ কাটিয়ে চলে যায় অতীন।

বিজয়া ডাকে—অতীন বাবু।

অতীন মুখ না ফিরিয়েই উত্তর দেয়—কাজরী বাড়িতে নেই।

বিজয়া—কাজরীর কাছে নয়, আপনারই কাছে···।

থমকে দাঁড়ায় অতীন। মুখ ফিরিয়ে তাকায়। কিন্তু কাছে এগিয়ে আসে না। প্রায় সাত হাত দূরত্বের এক কিনারায় শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে বিজয়ার প্রশ্নটাকে মনে মনে তুচ্ছ ক'রে ও ঘৃণা ক'রে উত্তর দেয়—আমার কাছে আবার আপনার বলবার মত কথা কি থাকতে পারে ?

বিজয়ার চোখ দুটো বিকার রোগীর চোখের মত দেখায়। ছটফট করে না, ফ্যালফ্যালও করে না। বিজয়া হাসে, এবং হাসির রকমটাও অদ্ভুত, যেন ঘুমের মধ্যে হাসছে। বিজয়া বলে—তাই তো···হ্যাঁ···ঠিকই বলেছেন আপনি। কি যেন বলবো বলে ভেবে-ছিলাম···সত্যি, কাজরী বাড়িতে নেই তো।

বিজয়ার কথার উত্তর না দিয়ে, আর এক মুহূর্তও অপেক্ষা না ক'রে চলে যায় অতীন।

কাফে মেটকাফের একটি কেবিন। কাজরীর জন্মদিনের উৎসবে মন-প্রাণ ঢেলে দিয়ে হাসিতে আর খুশিতে ভরে দিয়েছে

অসিত জীমূত আর গাঙ্গুলী। কাজরী যাদের পার্সোনালিটিকে মনে-প্রাণে শ্রদ্ধা করে, তারা কাজরীর পার্সোনালিটিকেও মনেপ্রাণে অভিনন্দিত করেছে। কেবিনের কটকটে আলো, টেবিলের উপর স্তূপীকৃত খাবারের সৌরভ, আর গেলাসের হুইস্কির ছলছল মাদকতা সব মিলে উৎসবের আনন্দকে উচ্ছল ক'রে দিতে দেরি করেনি। মাথার উপর ফুরফুর করে রঙীন কাগজের ফালির গুচ্ছে গুচ্ছে ঝালর। আর কাজরীও তার ভেজা ঠোঁট রুমাল দিয়ে আস্তে আস্তে মুছে হুইস্কির গেলাস একপাশে সরিয়ে রেখে হেসে ওঠে।—প্লীজ, আমাকে এসব জিনিস আর দ্বিতীয়বার সাধবেন না।

—এই তো অন্যায় করলেন আপনি। চেঁচিয়ে আপত্তি করে গাঙ্গুলী।

কাজরী হাসে—কোথায় আমাকে একটু প্রশংসা করবেন, না, তার বদলে নিন্দেই করে ফেললেন মিষ্টার গাঙ্গুলী?

গাঙ্গুলী—অ্যাঁ?

কাজরী—আপনাদের অনুরোধের জন্য, আপনাদেরই সম্মানের জন্য আমি জীবনে এই প্রথম এ-জিনিস ছুঁলাম।

অসিত জীমূত আর গাঙ্গুলী একসঙ্গে টেবিলের উপর হাতের চাপড় বাজিয়ে হেসে ওঠে।—লজ্জা দিলেন, আমাদের ভয়ানক লজ্জা দিলেন আপনি।

গাঙ্গুলী বলে—এর পরের প্রোগ্রামটা কি?

জীমূত—ষ্টিমার ট্রিপ টু ডায়মণ্ড হারবার।

অসিত বলে—এ ট্রিপ টু দি মুন হলেই ভাল ছিল।

জীমূত—খুব সত্যি কথা। এরকম একটা লাইফের জন্মদিনের উৎসব কি এসব হোটেল-ফোটেলে মানায়? দরকার ছিল একটা ···যাকে বলে, কুসুমাকীর্ণ কুঞ্জ।

অসিত—নয় তো কোন সমুদ্রের তালতমালবনরাজিনীলা বেলাভূমি।

জীমূত—কিংবা···সেই মোহনার ধারে। রাত্রি এসে যেথায় মিশে দিনের পারাবারে।

সেতারের ঝংকারের মত মিষ্টি শব্দের উল্লাস ঝরিয়ে দিয়ে হেসে ওঠে কাজরী।

তার পরেই গম্ভীর হয়ে যায় কাজরী।—আমি যদি বলি, ডায়মণ্ড হারবার যেতে পারবো না, তাহলে কি···।

অসিত—তাহলে আমি ভয়ানক দুঃখিত হব।

কাজরী—কিন্তু সত্যিই যেতে পারবো না।

—কেন? কেন? জীমূত আর গাঙ্গুলী একসঙ্গে করুণভাবে তাকিয়ে প্রশ্ন করে।

কাজরী—আপনারা কেউ কল্পনাও করতে পারবেন না, আজকের এই উৎসবের হাসিখুশির মধ্যেও আমার মন···।

—কি?

—বলুন।

—ওকি?

ছিঃ, এ কি করছেন আপনি?

দু'চোখের দু'কোনের দুটো জলের ছোট ছোট ফোঁটা রুমাল দিয়ে মুছে ফেলে কাজরী বলে—আমার জীবন একেবারে একলা হয়ে গিয়েছে। ঠকেছি, অপমানিত হয়েছি, আশা ব্যর্থ হয়েছে।

অসিত—অতীন বাবু কি আপনাকে কোন অপমান বা বঞ্চনা বা ইতরামি···।

কাজরী—হ্যাঁ; তার সঙ্গে সত্যি ক'রে কোন সম্পর্কও এখন আর নেই। আর, আমার পক্ষে কোন সম্পর্ক রাখাও সম্ভব নয়।

জীমূত ব্যথিতভাবে বলে—অগত্যা···তাহলে···।

অসিত গম্ভীর হয়ে বলে—এইরকমই একটা ট্র্যাজেডি আমি আশা করেছিলাম।

গাঙ্গুলী রাগ ক'রে চেঁচিয়ে ওঠে।—বৃথা এমন হা-হুতাশ না

ক'রে ওঁকে একটা পরামর্শ দিন। আর বেশি সাইকো-অ্যানালিসিসের দরকার নেই।

অসিত—পরামর্শ বলতে এখন তো শুধু একটি কথা…অর্থাৎ ওঁর জীবনের হ্যাপিনেস ও সম্মানের জন্য আর সত্যের খাতিরে এখন বাধ্য হয়ে ওঁর পক্ষে ..।

জীমূত—হ্যাঁ, ছাড়াছাড়ি হয়ে যাওয়াই ভাল।

গাঙ্গুলী—আমিও তাই বলি। একটা মিথ্যা সেন্টিমেণ্টকে চিরস্থায়ী ক'রে রাখবার কোন অর্থ হয় না।

আরও গম্ভীর হয় অসিত—তা ছাড়া, ওঁর জীবনটাও তো ফুরিয়ে যায় নি। ওঁকে বেঁচে থাকতে হবে; এবং আই উইশ, উনি ওঁর রূপগুণের প্রাপ্য যে প্রেষ্টিজ, সেই প্রেষ্টিজ নিয়ে বেঁচে থাকুন।

জীমূত—অতএব লেট আস্ ক্যানসেল আমাদের ষ্টিমার ভ্রমণ।

অসিত—ডাইভোর্সের জন্য একটা দরখাস্ত আজই যদি ড্রাফ্ট করিয়ে…।

গাঙ্গুলী—আমার ভাগ্নে অ্যাডভোকেট সত্যকিংকরের উপর এ-কাজের ভার ছেড়ে দিতেন পারেন। দাম্পত্য বাদবিবাদের মামলায় ওর বেশ সুনাম আছে।

—তা হলে এখন…। কাজরীর মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে অসিত।

কাজরী—কি? এখনই কি কিছু করতে চান?

অসিত—হ্যাঁ। আর দেরি ক'রে লাভ কি?

গাঙ্গুলী—এখনি সত্যকিংকরের কাছে গিয়ে একটা ব্যবস্থা ক'রে ফেলতে পারা যায়।

জীমূত—হ্যাঁ, এখনই ভাল। এরকম অভিশাপকে ধিকিধিকি ক'রে জ্বলতে না দিয়ে, এক মুহূর্তে নিভিয়ে দেওয়াই উচিত।

কাজরী হাসে—তারপর?

কাজরীর প্রশ্নের অর্থটা ভাল ক'রে বোঝবার জন্য কাজরীর মুখের দিকে তাকায় অসিত; জীমূত আর গাঙ্গুলীও তাকায়। কাজরীর দু'চোখের আশা সেই মুহূর্তে পরম আশ্বাসে টলমল ক'রে ওঠে। কাজরীকে অফুরান প্রেষ্টিজ দিয়ে বরণ ক'রে নিয়ে জীবনের সঙ্গিনী করবার আশায় ব্যাকুল হয়ে তাকিয়ে আছে অসিত; তাকিয়ে আছে জীমূত আর গাঙ্গুলী!

কাজরী বলে—সত্যকিংকর বাবুর কাছে গিয়ে আমার কি করতে হবে বলুন।

গাঙ্গুলী—যা বলবার সব আমিই বলবো। আপনি শুধু দরখাস্তে একটা সই দিয়ে দেবেন। বাস্।

অসিত—কিন্তু ডাইভোর্স চাইবার একটা কারণ দেখাতে হবে মনে রাখবেন। কি বলবেন ভেবে রাখুন।

কাজরী—ভেবে রেখেছি।

জীমূত—কারণটা সাফিসিয়েণ্ট হওয়া চাই।

কাজরীর চোখ কটমট ক'রে জ্বলতে থাকে।—যা সত্যি, তাই বলবো।

গাঙ্গুলী—তার মানে?

কাজরীর বুক ঠেলে যেন একটা জ্বলন্ত আক্রোশের স্বর ঠিকরে পড়ে।—যে কারণে স্ত্রীর পক্ষে স্বামীর হাত ধরবার কোনই অর্থ হয় না···সব মিথ্যে হয়ে যায়···সেই কারণ। চোখের উপর রুমাল চেপে ধরে কাজরী।

মাত্র এক মিনিটের মত একটা স্তব্ধতা যেন কাজরীর জন্মদিনের উৎসবের এই কেবিনের ভিতরে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকে। তারপরই ব্যস্তভাবে উঠে দাঁড়ায় অসিত—চলুন তা'হলে।

কাজরী বলে—তার পর আমাকে সোজা চন্দননগরে পৌঁছে দিয়ে আসবেন।

অসিত।—নিশ্চয়।

কাজরীর যে-যে-কথা বলবার ছিল, সে-কথা বলা হয়নি। বলবার সুযোগ কি আর পাওয়া যাবে?

কাজরীর সঙ্গে আর দেখা হয়নি, যদিও অফিসের ছুটির পর রোজই দুর্বার এক অভ্যাসের টানে সেই ক্যামাক ষ্ট্রীটেরই ফ্ল্যাটের ভিতরে ঢুকে, শূন্য নীড়ের একলা পাখির মত রাতের পর রাত পার করেছে অতীন। সেই যে জন্মদিনের উৎসবের টানে চলে গেল কাজরী, তার পর ক্যামাক ষ্ট্রীটের অভিশপ্ত নীড়ের কাছেও আর উঁকি দিতে আসেনি। মনে হয়েছিল অতীনের, কাফে মেটকাফের একটি কেবিনের মধ্যে পেটে খিল ধরিয়ে দেওয়া হাসির জোয়ারে ভেসে গিয়েছে কাজরীর জীবন। কিন্তু ভাঁটার টান কি দেখা দেবে না? ভয় পেয়ে, ভুল বুঝতে পেরে; কোন মতে, অন্তত ওর মেয়েলি শরীরের গর্বটুকু বাঁচিয়ে ফিরে আসতে পারবে না কি কাজরী? না, সত্যিই কাদাজলের মধ্যে নাকানি-চুবানি খেয়ে মরেই গেল কাজরী?

এক-দু'টো দিন নয়; পর পর সাতটা দিন আর রাত অতীন বিশ্বাসের শুকনো মনটা সত্যিই যে কাজরী নামে এক নারীর আত্মনিষ্ঠুরতার ভয়ানক রকম দেখে আতঙ্কে কেঁপেছে আর বেদনায় টলমল করেছে। কোথায় আছে কাজরী? নিজের মনের এই প্রশ্নটাকেও ঘৃণা করে অতীন; এবং নিজেও আশ্চর্য হয়ে লজ্জা পেয়েছে, বুকের ভিতরে যেন একটা অদ্ভুত বেহায়াপনা চোরের মত মুখ লুকিয়ে এখনও কাজরীর ফিরে-আসা আশা করছে।

হ্যাঁ, সত্যিই যে একটা চোরা আশা এখনও মরে যায়নি। সতটা দিন ও রাতের যন্ত্রণাময় ভাবনার পর কাজরীর খবর শুনতে পেয়েছে অতীন। সিন্‌হা সাহেবের বেয়ারা এসে ভাগবতকে ডেকে নিয়ে গেল। টেলিফোনে ভাগবতকে কে যেন ডেকেছে। এবং

ভাগবত ফিরে এসেই খবর দিল, কয়লাঘাটের অফিস থেকে মা টেলিফোন করলেন। মা এখন চন্দননগরে আছেন, চন্দননগরেই থাকবেন।

—আর কি বললেন?

—বললেন, চিঠিপত্র যা আসবে, সবই যেন সিন্‌হা সাহেবের মেয়েকে দিয়ে ঠিকানা কাটিয়ে চন্দননগরের ঠিকানায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখতে পায় অতীন, সিন্‌হা সাহেবের মেয়ে আশ্চর্য হয়ে এই ফ্ল্যাটের দিকে তাকিয়ে আছে। যেন আগুন লেগেছে এই ফ্ল্যাটে; সিন্‌হা সাহেবের মেয়ের চোখে সেইরকমের একটা আতঙ্কিত আশ্চর্য।

চন্দননগরে আছে কাজরী। থাকুক। খবর শুনে অতীন বিশ্বাসের বুকের ভিতরে সেই বেহায়া চোরা আশাটা যেন হঠাৎ খুশি হয়ে ওঠে। এবং অনেকদিন পরে আজ এই প্রথম ঘরের চারিদিক তাকিয়ে মনে হয় অতীনের, এই শূন্যতা বোধহয় সারা জীবনের শূন্যতা নয়। কাজে যাবার জন্য ফ্ল্যাটের ঘর ছেড়ে বাইরে বের হবার সময়ও মনে হলো, মাথার ভিতর সেই যন্ত্রণার কামড়টা আর নেই। ক্যামাক ষ্ট্রীটের জারুল গাছের ছায়াগুলিও মন্দ নয়। আর, পার্ক ষ্ট্রীটের অটোমোবিল শো-রুমের কাছে এসে দাঁড়াতেই কাজ করবার উৎসাহটা আবার সঞ্জীব হয়ে ওঠে।

অটোমোবিল শো-রুমের মালিক অতীনের উপর একটু প্রসন্ন হয়েছেন। কিন্তু মাইনে বাড়িয়ে দিয়েছেন; সেই সঙ্গে কাজের দায়ও কিছুটা বড় ক'রে দিয়েছেন। আজকাল অতীনকে বেশ কিছুটা হিসাব লেখার কাজও করতে হয়। তাই লেজার খাতাটাকে কাছে টেনে নেয় অতীন, এবং কলম হাতে তুলে নেবার আগে বেয়ারাকে ডাক দিয়ে বলে, এক কাপ চা নিয়ে এস।

এবং চা-এর কাপ হাতে তোলবার আগে টেলিফোনের একটা

ডাক ক্রিং ক্রিং ক'রে ওঠে। কে জানে কোন কাস্টমারের কমপ্লেন এলো ?

টেলিফোনের রিসিভারের চোঙ্গাতে কান পেতে আর মুখ এগিয়ে দিয়ে অতীন বলে···হ্যাঁ, আমি অতীন বিশ্বাস কথা বলছি।

টেলিফোন বলে—আমি সত্যকিংকর চ্যাটার্জি, অ্যাডভোকেট।

—বলুন।

—আপনাদের দাম্পত্য বিবাদটা মিটিয়ে নিন মিষ্টার বিশ্বাস। কেন বৃথা আদালতের কাছে এসব অভিযোগ টেনে নিয়ে গিয়ে···।

—একটু স্পষ্ট ক'রে বলুন। বুঝতে পারছি না।

—আপনার স্ত্রী ডাইভোর্স চেয়ে আদালতে দরখাস্ত করতে চান। দুর্ভাগ্যের বিষয় তিনি আমার ওপর তদ্বিরের ভার দিয়েছেন। এবং প্রফেশনের খাতিরে আমি অস্বীকারও করতে পারি না। তবে কি জানেন···।

—বলুন।

—এ তো বুঝতেই পারছি ; বাই অ্যারেঞ্জমেন্ট, অর্থাৎ সহজে ডাইভোর্স পাওয়ার জন্য নিজেদেব মধ্যে পরামর্শ ক'রে আপনারা এমন একঠি ছুতো ধরেছেন যে···।

—কি বললেন ?

—এমন সাংঘাতিক একটা কারণ দেখিয়ে ডাইভোর্স নেবার দরখাস্ত করা হয়েছে, যাতে ডাইভোর্স মঞ্জুর না হয়েই পারে না।

—আপনার কথার অর্থ কিছু বুঝতে পারছি না।

—আপনার স্ত্রী বলেছেন যে, আপনার পক্ষে স্বামী হবার আসল যোগ্যতাটুকুই নেই।

—এইবার বুঝলাম।

—কিন্তু অভিযোগটা কি সত্যি ?

—হ্যাঁ।

—আমার সন্দেহ হচ্ছে ; একটা ছুতো।

—না।

—তাহলে তো আপনি নিজেকে ডিফেণ্ড করবেন না বলে মনে হচ্ছে।

—না, এক্ষেত্রে নিজেকে ডিফেণ্ড করবার কোন অর্থ হয় না।

—তা ঠিক। আচ্ছা, নমস্কার।

মাতালের মত হো হো ক'রে হেসে উঠতে গিয়েই চুপ হয়ে যায় অতীন। যেন বুকে-পিঠে চোখে-মুখে ও মাথায় হাজার চাবুকের আঘাত বর্ষন হচ্ছে। পেয়ালার গরম চা জুড়িয়ে ঠাণ্ডা জল হয়ে গিয়েছে ; লেজার খাতার উপর কনুই রেখে মাথাটাকে আঁকড়ে ধরে বসে থাকে অতীন।

ফ্যান ঘোরে, কপালের ঘাম তবু শুকোতে চায় না। অতীনের সুন্দর চেহারার সেই অহংকেরে পৌরুষ যেন হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে তপ্ত ধুলোর উপর পড়ে মুখ ঘষছে।

টেবিলের উপরে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়তে ইচ্ছা করে। ঘুমিয়ে পড়ে অতীন। এবং অবার ঘর্মাক্ত কপালটা টেবিলের উপর থেকে তুলে দেয়ালের ঘড়ির দিকে তাকায়। মাত্র দুপুর। বিকেল হতে যে এখনও আরও চার ঘণ্টা।

চোখ দুটো সেঁতসেঁতে হয়েছে, তবু জ্বলছে, রক্ত ঝরছে না তো? রুমাল দিয়ে চোখ মোছে অতীন। না, রুমালটা লাল হয়ে যায়নি, চোখের জলটা এখনও সাদা আছে।

দারোয়ান এসে খোঁজ নেয়—আপনার তবিয়ৎ খুব খারাপ মালুম হচ্ছে অতীন বাবু।

অতীন—হ্যাঁ।

দারোয়ান—তাহ'লে বাড়ি চলে যান।

বাড়ি? হ্যাঁ বাড়ি নামে একটা অনেক দূরের, জীবনের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে একটা অন্য জগতের ছবি চোখের সামনে ভাসে।

দারোয়ান চলে যেতেই আবার টেবিলের উপর কপাল নামিয়ে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে অতীন।

ঘুম নয়, বোধ হয় একটা স্নিগ্ধ স্বপ্নকে খুঁজছে অতীনের জ্বালা-ভরা চোখ। কিংবা স্বপ্নের মধ্যে পথ খুঁজছে।

এভাবে মুখ গুঁজে আর চোখ বুঁজে বসে বসে পথ খুঁজে লাভ কি? উঠে দাঁড়াতেই তো হয়। তারপর ঐ তো পথ। একটা ট্যাক্সি নিয়ে সোজা এই পথ দিয়েই ছুটে গিয়ে শ্যামবাজারের পাঁচ মাথার মোড়। তারপর ডাইনে ঘুরে বেলগাছিয়ার হাসপাতাল পার হয়ে, যশোর রোডের ধুলো উড়িয়ে দিয়ে, নতুন মতুন কারখানা আর কলোনির অপরাহ্নের ছায়া পার হয়ে আবার ডাইনে ঘুরে যেতে কতক্ষণ লাগে? লোনা বাগজলায় আজও লাল পানা ভাসে নিশ্চয়; আর খালের জলে খড়ের পাহাড় নিয়ে বড় বড় নৌকা ভেসে যায়। আর, রসিকপুরের রাজবাড়ির দেউড়ির ধ্বংসস্তূপের মধ্যে আলকুশীর ঝোপের ভিতর থেকে সেই খাটাসের সুন্দর মুখটা বোধ হয় আজও উঁকি দিয়ে তাকিয়ে থাকে। দক্ষিণের বগানে কি এখনও শিমুল ফোটেনি? পুকুরের পাশে কনকচাঁপা?

ঢিপ ঢিপ করে বুকটা। ঢিপ ঢিপ করে অতীন বিশ্বাসের বুকের একটা সখ? কেমন আছে কেতকীর ছেলে? কত বড় হলো? স্বপ্ন নয়, স্বপ্ন নয়, চোখ মুছে ছটফট করে অতীন। সত্যিই যে মনে হলো, একটা বাচ্চা ছেলের নরম শরীর এতক্ষণ ধরে গা ঘেঁষে খেলা করছিল।

কেতকীর সিঁথিটা সাদা। কিন্তু অতীনের হৃৎপিণ্ডের ভিতরে কি রক্ত নেই? এখনি কি ছুটে চলে যাওয়া যায় না, আর কেতকীর ঐ সাদা সিঁথিটাকে হাজার চুমো দিয়ে রঙীন ক'রে দেওয়া যায় না?

বোধ হয় এই স্বপ্নের ঘোরেই ঘোর মাতালের মত টলতে টলতে উঠে দাঁড়ায় অতীন। কি যেন ভাবে। ব্যস্তভাবে ঘড়ির দিকে

তাকায়। সাতটা বাজে। পার্ক ষ্ট্রীটের সন্ধ্যা আলোয় ভরে গিয়েছে। আরও ব্যস্ত হয়ে হাতের কাছে কাগজ টেনে নিয়ে একদিনের ছুটি চেয়ে একটা দরখাস্ত লিখে টেবিলের উপর রেখে দেয় অতীন।

ক্ষমা চাইবে অতীন। আশ্চর্য হয়ে যাবে কেতকী। হেসে মিষ্টি হয়ে যাবে কেতকীর মুখ। এক পেয়ালা চা এগিয়ে দিয়ে অতীনের এই শ্রান্ত ক্লান্ত বঞ্চিত মূর্খ ও উন্মাদ জীবনটাকে মিষ্টি ক'রে দেবে। কমল বিশ্বাস আর সুধাময়ী, জীর্ণ শীর্ণ ঐ তুটি মানুষের পা ছুঁয়ে আজ বলে দিতে পারবে অতীন—গল্পটা বিশ্বাস করেছি বাবা। এই ভাঙ্গা-বাড়ির বুকের ভিতরে সোনা লুকিয়ে আছে।

আর পা টলে না। ব্যস্তভাবে ঘর ছেড়ে বাইরে এসে পথের দিকে তাকিয়ে ট্যাক্সি খোঁজে অতীন বিশ্বাস। ছুটে আসছে একটা ট্যাক্সি, এ কি আশ্চর্য, ট্যাক্সিটা যেন অতীন বিশ্বাসের জীবনের এই তুর্বার ব্যাকুলতার দাবিটা আন্দাজ ক'রে নিয়ে একেবারে অতীনের চোখের কাছে এসে আপনিই থেমে যায়।

—হাউ ডুই ইউ ডু মাই ডিয়ার বয় ?

পার্ক ষ্ট্রীটের সন্ধ্যার এই মধুর-চঞ্চল ও আলোকময় রূপটাকে যেন কলুষিত ক'রে দিয়ে অজয় মাতালের চিৎকার বেজে ওঠে।

—প্যারাডাইস লস্ট ! ঢেঁকুর তুলে আবার চেঁচিয়ে ওঠে অজয়।

সিগারেট ধরায় অজয় মাতাল, এবং হাতের ফোস্কায় ফুঁ দিয়ে হেসে ওঠে।—কেতকী ইজ গন উইথ দি উইণ্ড। বুঝতে পারলেন কি স্যার ?

অতীন বলে—না।

অজয়—তারে চিনিতে পারনি, তারে বুঝিতে পারনি। সে তোমার চেয়ে অনেক চালাক।

অতীন—কে ?

অজয়—কেতকী, তোমার পরিত্যক্তা সেই মহীয়সী।

অতীন—কি হয়েছে কেতকীর ?

অজয় হাসে—একটি চমৎকার স্বামী হয়েছে। রেলওয়ের অডিটার শ্রীযুক্ত নির্মলকান্তি রায়।

হঠাৎ যেন একটু দুঃখিত হয়ে যায় অজয় মাতালের হাসিটা। —সব চেয়ে প্যাথেটিক ব্যাপার কি হয়েছে জান ?

অতীন—না।

অজয়—স্বয়ং তোমার পিতৃদেব আশীর্বাদ ক'রে বিয়েটা ঘটিয়েছেন। এবং বিচিত্র নাতিটাকেও কৃত্রিম বাবার কোলে তুলে দিয়েছেন। যাক্, তুমি এখন কোন্ অভিসারে যাচ্ছিলে বল দেখি ভায়া ?

অতীন—জানি না।

অজয়—সে কি ? তোমার মত এমন একটি খাসা মাইডিয়ার মানুষের সন্ধ্যাবেলা কোন এনগেজমেণ্ট নেই, এ কি সম্ভব ?

চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে অতীন। অজয় বলে—আমার সঙ্গে যাবে ?

অতীন—না।

অজয় মাতাল চলে যায়। অনেকক্ষণ নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার পর চোখ মোছে অতীন, এবং ভেজা রুমালের দিকে তাকিয়ে মনে হয়, রুমালটা লাল হয়ে গিয়েছে। চোখ থেকে কি সত্যিই রক্ত ঝরছে ? নইলে চোখের সামনে এই রাস্তাটাকেই বা স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না কেন ?

মাসটা অঘ্রাণ; কিন্তু হঠাৎ একটা অকাল তুফানের রাগ পথের উপর ধুলোর আঁধি ছুটিয়ে দিয়েছে।

খড়দহতে রামকানাই বাবুর বাড়ীতে কেতকীর মাথার সিঁদুরের দিকে তাকিয়ে হেসে হেসে বিদায় নেবার সময় কেতকীর বেবিকে

একবার বড় শক্ত ক'রে বুকের উপর জড়িয়ে ধরেছিলেন বুড়ো কমল বিশ্বাস। দুরন্ত বেবিও বড় বেশি ছটফটিয়ে আর হাত-পা ছুঁড়ে বুড়োমানুষকে নাকাল করেছিল। বেবির জুতোপরা পায়ের ছোট্ট একটা লাথি কমল বিশ্বাসের পাঁজরের উপর খট্ ক'রে বেজে উঠেছিল। বেশ ব্যথাও পেয়েছিলেন কমল বিশ্বাস।

সেই ব্যথাটাকেই যেন একটা দুর্লভ উপহারের মত পাঁজরের আড়ালে লুকিয়ে রেখে আরও খুশি হয়ে হাসতে হাসতে চলে এলেন কমল বিশ্বাস। পাঁজরের উপর ভুলেও একবার হাত বোলান নি।

রসিকপুরে রাত্রির ঘুটঘুটে অন্ধকারে সেই গলিত পলিত রাজবাড়ির সব কুশ্রীতা ঢাকা পড়ে যায়। জমাট মেঘ ছিঁড়ে ছিঁড়ে বিদ্যুতের জ্বালা ঝিলিক হানে। গরগর করে আকাশটা। ঝরঝর ক'রে বৃষ্টিও ঝরে পড়ে। আর, মাঝ মাঝে অঘ্রানের অকাল তুফানের আক্রোশ ছুটে এসে বাগানের গাছপালার উপর মড়মড় ক'রে ভেঙ্গে পড়ে।

ভাঙ্গা বাড়ির বুড়ো আর বুড়ি তেমনই বারান্দার উপর মাদুর পেতে বসে থাকে, রাত জাগে, আর চক্রান্ত করে। দুটি ক্লান্ত জীবনের চক্রান্ত। সুখ নিয়ে টানাটানি করবার, দুঃখ নিয়ে রাগারাগি করবার চক্রান্ত নয়। শুধু চুপচাপ বিলীন হয়ে যাবার চক্রান্ত। বাঁচাটা যখন সুখের হলো না, অন্তত মরাটা সুখের হোক।

পাঁজরের উপর সেই ব্যথাটা একটু একটু ক'রে ফিকে হতে হতে যেদিন একেবারে ফিকে হয়ে গেল, সেদিনই পাঁজরের উপর হাত বুলিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন কমল বিশ্বাস।—সব শূন্য হয়ে গেল সুধা। আর কোন বেদনাও নেই যে ভুগি। তবে আর কেন? এবার সরে পড়লেই তো হয়।

সুধাময়ীও স্বীকার করেন।—হ্যাঁ।

এই চক্রান্তের মধ্যেও একটা সাধ আছে। যেন দু'জনে একসঙ্গে একই সময়ে দু'জনের মুখের দিকে শেষবারের মত তাকিয়ে চিরকালের মত চোখ বুঁজে ফেলতে পারেন। যেন আগে পরে না হয়। ঠাকুর কি এই সাধ পূর্ণ করবেন?

হঠাৎ হেসে ওঠেন কমল বিশ্বাস—ঠাকুর তোমার সাধ পূর্ণ করবেন, এ সাধ ছেড়ে দাও সুধা। ঠাকুরের ইচ্ছার উপর নির্ভর করলেই ঠকবে।

সুধাময়ী—নির্ভর করলে ক্ষতি কি?

কমল বাবু—লাভও তো নেই।

সুধাময়ী—এ যে ঠাকুরেরই ওপর অবিশ্বাসের কথা হলো।

কমল বাবু—অবিশ্বাস নয়, বিশ্বাসও নয়। ঠাকুর হলো তোমার এই রাজবাড়ির মাটিতে পোঁতা পাঁচ কলস সোনার মত। হয়তো আছে, হয়তো নেই। থাকলেই বা কি, না থাকলেই বা কি? বিশ্বাস করলে লাভ নেই, অবিশ্বাস করলে ক্ষতি নেই।

সুধাময়ী—থাক এসব কথা। শর্মাজী চিঠির কোন উত্তর দিয়েছেন?

কমল বাবু—দিয়েছেন।

সুধাময়ী—কবে আসবেন শর্মাজী?

কমল বাবু—মনে হচ্ছে, কাল সকালেই আসবেন।

বদরীনাথের পাণ্ডা শর্মাজী প্রতি বছর কলকাতায় এসে তীর্থ-যাত্রী যোগাড় করেন। আজ দশ বছর ধরে, প্রতি বছরের একটি দিনে এসে রসিকপুরের কমল বিশ্বাসের সঙ্গে দেখা করতে ভুলে যাননি শর্মাজী। শর্মাজীর আবেদন শুধু চুপ ক'রে শুনেছেন আর হেসেছেন কমল বিশ্বাস। বদরীনাথ দর্শনের পুণ্য বাখান করে কত কথা বলেছেন শর্মাজী। দেখিয়ে হিমলকি শোভা, করিয়ে স্নান মন্দাকিনী অওর অলকনন্দাকে নীরমেঁ; কিতনা সাধুসঙ্গ হোবে, কিতনা পুণ হোবে; নতুন বল পাইবে জীবন!

শর্মাজীর এসব কথার আবেদন কমল বিশ্বাসের মন গলাতে পারেনি। কিন্তু এইবার যে কথা বলে চলে গিয়েছেন শর্মাজী, সে-কথা শোনবার পর কমল বিশ্বাসের মন লুব্ধ না হয়ে থাকতে পারেনি। সুধাময়ীরও মনে হয়েছে, শর্মাজী যে সত্যিই পরম সৌভাগ্যের কথা বলে চলে গেলেন। মহাশয় বুড়া হোয়েছেন, মহাশয়াভি বুড়া হোয়েছেন। অওর শরীরভি কমজোর হোয়ে গিয়েছে। এহি তো আঁখ মুদনেকা লগন হ্যায় কমল বাবু। আমার খুব মনে হোচ্ছে, যদি দুইজনে তীরথ করেন, তবে বদরীবিশালজী দুই জনকেই কিরপা করবেন। ফিরনেকা দুর্ভাগ আর হোবে না কমল বাবু।

শর্মাজীর এইবারের আবেদন কমল বিশ্বাসের মনে ধরেছে। সুধাময়ীর শীর্ণ মুখটাও হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। তীর্থের পথে যেতে যেতে একদিন দু'জনে দুজনের হাত ধরে ধুলোর উপর লুটিয়ে পড়বে, আর উঠতে হবে না। ভাবতে যে সত্যিই ভাল লাগে।

কমল বাবু বলেন—দক্ষিণ দরজার বাগানের কাঠা পাঁচেক জমি বেচে দিতে হবে; বাস্, যা পাওয়া যাবে তাই যথেষ্ট। দু'জনের বাবদ শর্মাজী তিন শো টাকা পেলেই খুশি। হরিদ্বার পর্যন্ত পথের খরচটা অবিশ্যি ঐ তিন শো টাকার বাইরে।

অঘ্রানের অকাল তুফানের আক্রোশ হঠাৎ থেমে গিয়েছে। গাছপালা আর মড়মড় করে না; আকাশে বিদ্যুতের ঝিলিকও নেই। বৃষ্টিও নেই।

রাতের অন্ধকার যদিও একটু ফিকে হয়েছে, কিন্তু বোঝা যায় না, রাত ফুরোতে এখন কত বাকি? আকাশের মেঘ কেটে এসেছে, কিন্তু তারার ঝিকিমিকি দেখেও আন্দাজ করা যায় না, মাঝরাত পার হয়ে গিয়েছে কি যায় নি।

কমল বিশ্বাস আবার হেসে ওঠেন—কি-রকম মনে হচ্ছে জান?

সুধাময়ী—কি?

কমল বিশ্বাস—মনে হচ্ছে, দু'জনে হয় মরেও বেঁচে আছি, নয় বেঁচেও মরে আছি।

সুধাময়ীও হাসেন—একই ব্যাপার।

কমল বিশ্বাস—তার চেয়ে এখান থেকে সরে যাওয়াই ভাল নয় কি ?

সুধাময়ী—নিশ্চয়। আর কিসের জন্য থাকবো ?

দু'জনে আবার যেন একেবারে নিরেট একটা সমাধির মধ্যে একেবারে নীরব হয়ে জাগা চোখের ক্লান্তি নিয়ে বসে থাকেন। গুঁড়ো বৃষ্টিও বোধ হয় ফুরিয়েছে। সারা বাগানের গাছপালা জোনাকীতে ছেয়ে গিয়েছে।

কমল বিশ্বাস বলেন—আমি কোন দিন নিজের জন্য সুখ চাইনি সুধা! বরং চেয়েছি, কে কত ঘা দিবি দে ; ঘা খাওয়াই আমার জীবন। কিন্তু এখন যে সবই ফাঁকা। জ্বালাবার, কষ্ট দেবার, পাঁজরে লাথি মারবারও কেউ নেই।

কমল বিশ্বাসের গলার স্বর ফুঁপিয়ে উঠেছে। সুধাময়ী বলেন —চুপ কর। সব বুঝেও কেন অবুঝপনা কর।

গলা কাশেন কমল বিশ্বাস—ঠিক কথা সুধা। কি নিয়ে বেঁচে থাকবো, এ প্রশ্ন যখন আর থাকে না, তখন বেঁচে থাকবার চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে বরং মরে যাবার চেষ্টা করাই উচিত।

সুধাময়ী—আগে সরে তো যাই।

কমল বিশ্বাস—ও কি ? আবার ওখানে ছায়া ঘুরে বেড়ায় কেন ?

অন্ধকারটা বোধ হয় একটু ফিকে হয়েছে। ঠাকুরদালানের দিকে তাকিয়ে দেখতে পান সুধাময়ী, একবার এদিকে আর একবার ওদিকে ঘুরে ঘুরে যেন ছটফট করছে একটা ছায়া। দপ্ ক'রে দেশলাই-এর আলো জ্বলে উঠলো। আবার যেন চমকে তিন পা পিছনে সরে গেল ছায়াটা।

কমল বিশ্বাস বলেন—ঐ দেখ, আবার এগিয়ে আসছে।

সুধাময়ী—কি সন্দেহ করছো তুমি ?

কমল বিশ্বাস—সোনাচোর। আশ্চর্য ?

আশ্চর্য হবারই কথা। প্রায় এক মাস ধরে রোজই রাতে সোনাচোরের ছায়া ঠাকুরদালানের কাছে ঘুরঘুর করছে। কত-বার এই বারান্দাতেই রাতজেগে বসে ছায়াগুলির আনাগোনা লক্ষ্য করেছেন কমল বিশ্বসে। ঠাকুর দালানের ভিতর আর থামের ফাটলগুলির উপর শাবলের আঘাত আছড়ে আছড়ে পড়ে শব্দ করছে, তাও শুনতে পেয়েছেন কমল বিশ্বাস। শুধু ছুটি চোখের শান্ত ক্লান্ত দৃষ্টি তুলে অন্ধকারের মধ্যে সোনাচোরের ছায়ায় ছটফধানি লক্ষ্য করেছেন, কিন্তু একটু বিচলিত হননি কমল বিশ্বাস। একবার একটা ঠাট্টার কাশিও কাশেন নি।

যেদিন পাঁচুর কাছে শুনতে পাওয়া গেল, সাপের কামড়ে অজ্ঞান হয়ে হাসপাতালে গিয়েছে যুধিষ্ঠির, সেদিন হঠাৎ একবার হেসে ফেলেছিলেন কমল বিশ্বাস। এবং তারপর থেকে রাতের অন্ধকারে সোনাচোরের উপদ্রব আর দেখা দেয়নি। কিন্তু, সত্যিই যে আবার সেই উপদ্রব শুরু হলো মনে হচ্ছে।

সুধাময়ী বলেন—ঘরে চল এবার।

কমল বিশ্বাস—না।

সুধাময়ী—কেন ?

কমল বিশ্বাস—ছায়াটা এদিকে আসছে বলে মনে হচ্ছে।

রসিকপুরের ভাঙ্গা রাজবাড়ির ছেলে অতীনেরই ছায়া।

পার্ক ষ্ট্রীটের সন্ধ্যার আলোকিত পথের উপর দিয়ে যখন বৃষ্টি-ভেজা বাতাসের ঝড় ছুটতে আরম্ভ করেছে, তখন পথ চলতে শুরু করেছে অতীন। অনেক হেঁটেছে, অনেকবার রিক্সা ধরছে, কয়েকবার ট্যাক্সি। শ্যামবাজারের চা-এর দোকানে বসে রাত দশটা ক'রে দিয়েও যখন বৃষ্টি থামলো না, তখন আবার পথে

নেমেছে অতীন। হেঁটে হেঁটেই নাগের বাজার; তারপর ডাইনে ঘুরে কাঁচা কাদাটে সড়ক ধরে রসিকপুরের রাজবাড়ির ভাঙ্গা দেউড়ির ইটের স্তূপের কাছে এসে যখন দাঁড়িয়েছে অতীন, তখন মেঘ কেটে গিয়ে একটু ফিকে হয়েছে অন্ধকার। আর, আলকুশীর ঝোপের জোনাকীগুলি ছটফটিয়ে উঠতেই বুঝতে পেরেছে অতীন, একটা খাটাসের মুখ উঁকি দিয়েছে।

থামেনি; এগিয়ে এসেছে অতীন। ফিকে অন্ধকারে দেখতে পাওয়া যায়, পথের উপর ছড়িয়ে রয়েছে আসশেওড়ার সাদা ফুল। কিন্তু ঠাকুর দালানের কাছে এসেই থমকে দাঁড়াতে হয়েছে। পথটা আর বোঝা যায় না, খুঁজেও পাওয়া যায় না।

ঠাকুর দালানের বারান্দার ফাটলধরা থামের মাথা থেকে ধপ্ ক'রে মাটির উপর লুটিয়ে পড়লো সোনা-সোনা রং-এর একটা চকচকে নরম পিণ্ড।

কাতরে উঠলো পিণ্ডটা। দেশলাই জ্বেলেই দু'পা পিছনে সরে গেল অতীন। সাপটা ফণা তুলে তাকিয়ে রইল। সাপটা খুব বুড়ো হয়েছে নিশ্চয়ই; আঁশগুলি জ্বলছে।

শুধু কি সাপটা? বার বার দেশলাই জ্বেলে দেখতে পায় অতীন ঠাকুর দালানের বারান্দার বড় বড় ফাটলের ভিতর থেকে আরও কত সোনালী চেহারা রাগ ক'রে উঁকি দিয়ে রয়েছে। এক একটা সোনাগাদা গোসাপ, টাটকা হলুদের মত রং।

হেসে ফেলে অতীন। অতীনের পায়ের শব্দ বোধ হয় ওরা কেউ পছন্দ করছে না।

এত বড় একটা ঝড় হয়ে গেল, তবু কি আরামে পাতায় পাতা জুড়ে দিয়ে ঘুমিয়ে রয়েছে ভিতরের আঙ্গিনার দিকে যাবার পথের উপর এই আমরুলটা! একটা বুনো লতা কি শক্ত করে আমরুলের ডাল শত শত আঁকড়ি দিয়ে জড়িয়ে ধরে ররেছে। এত বড় একটা ঝড়ও লতাটাকে কাদার উপর নামিয়ে দিতে পারেনি।

দেশলাই জ্বেলে পথটা ভাল করে ঠাহর ক'রে নিয়ে এগিয়ে যায় অতীন। পথটা যে ঘাসে ছেয়ে গিয়েছে। রসিকপুরের অদ্ভুত রাজবাড়ির মধ্যে কি তবে আর কোন মানুষের প্রাণ বাস করে না? চলে গিয়েছে, সরে গিয়েছে সবাই?

এক রাতের মধ্যে দু'দুবার বৃষ্টিতে ভিজে চবচবে হয়ে আবার এতক্ষণ পরে একটু শুকিয়েছে অতীন বিশ্বাসের কামিজ আর ট্রাউজার, গলার টাই আর পায়ের জুতো। এগিয়ে যেতে যেতে আর একবার থমকে দাঁড়িয়ে মনে মনে কথা বলে যেন নিজেকেই প্রশ্ন করে অতীন, কিসের জন্য এভাবে এখানে একটা বদ্ধ পাগলের মত অকারণ মেজাজের আর ইচ্ছার তাড়ায় ছুটে এসেছে অতীন? কি দেখতে?

কোন উদ্দেশ্য নেই, কারও উপর রাগ নেই, কাউকে ধরবার আশা নেই, তবে এত মরিয়া হয়ে ছুটে আসাই বা কেন?

তবে কি পুরনো ফুলশয্যার ঘরটাকে নতুন ক'রে দেখবার লোভ জেগেছে অতীন বিশ্বাসের বুকের এক কোণে? সত্যিই কি পাগলের মত কল্পনা করছে অতীন, কেতকী চলে গেলেও কেতকীর একটা ছায়া অন্তত ঘুমিয়ে পড়ে আছে সেই ঘরের খাটের উপর? সেই ছায়াতে কেতকীর সেদিনের ঢাকাই শাড়ির গন্ধটাও আছে বুঝি?

বারান্দার উপর উঠে আস্তে আস্তে সেই ঘরেরই দিকে এগিয়ে যেতে থাকে অতীন, যে-ঘরে একদিন এমনই এক গভীর রাতে কেতকী নামে এক নারীর শরীরের দিকে তাকিয়ে একটা কাঙ্গাল লোভের আবেগে পাগল হয়ে গিয়েছিল অতীন, আর ভয়ানক এক মূর্খতার ভুলে সেই কাঙ্গাল লোভটাকেই পৌরুষের অহংকার বলে মনে করেছিল। কিন্তু এখন আর মনেমনে এই ভালমানুষী বিলাপ সেধে লাভ কি? অতীনের জীবনে ভালমানুষী বিলাপ শোনবার অপেক্ষায় আশার তপস্বিনী হয়ে এখানে আর পড়ে নেই কেতকী।

—অতু ?

রসিকপুরের ভাঙ্গা-বাড়ির বিনিদ্র অন্তরাত্মার অন্ধকারটাই যেন ডেকে উঠেছে। বুক কাঁপে অতীনের, কিন্তু সেই সঙ্গে চোখ দুটোও যেন ভিজে যেতে চায়। কি আশ্চর্য, সেই দুটি জীর্ণ শীর্ণ মানুষ কি আজও রাত জেগে চক্রান্ত করছে? আর কিসের চক্রান্ত ?

—কি মনে ক'রে হঠাৎ এভাবে এসময়ে আবার এবাড়িতে ঢুকলি অতু ? কমল বিশ্বাসের কোঠরগত চোখের কঠিন দৃষ্টিটা দেখা যায় না, কিন্তু গলার ঘড়ঘড়ে স্বরের চাপা ধিক্কারটা শোনা যায়।

অতীন বলে—তোমরা এখনও জেগে বসে আছ কেন বাবা? একটা আলো জ্বেলেও রাখনি কেন ? মা কথা বলছো না যে ?

আলো জ্বালেন সুধাময়ী। এবং এইবার দেখা যায়, কমল বিশ্বাসের কোটরগত চোখের মধ্যে একটা করুণ বিস্ময়ের চাহনি কোমল হয়ে ঢলঢল করছে। অতীনের মুখে এরকম নতুন ভাষা আর অতীনের গলায় এরকম নতুন স্বর শুনতে পাবেন বলে যে কল্পনাও করেননি কমল বিশ্বাস। কমল বিশ্বাসের পক্ষে আশ্চর্য হবারই কথা।

সুধাময়ী কি-যেন বলতে চান, এবং বলতে গিয়ে তাঁর গলার স্বর প্রায় গলে পড়তে চায়—খেয়ে-টেয়ে এসেছিস তো অতু ?

অতীন—না। কিন্তু একটুও ক্ষিদে নেই।

সুধাময়ী—শরীর খারাপ নয় তো ?

অতীন—না ··কিন্তু তোমরা রাত জেগে বসে শরীরটাকে শেষ করছো কেন ? যাও, এবার ভিতরে গিয়ে শুয়ে পড়।

কিন্তু ওঘরের দিকে তাকায় কেন অতীন ? দেখতে পাচ্ছে না কি, ওঘরের দরজার কড়ায় যে মস্তবড় একটা বন্ধ তালা ঝুলছে ?

তবু সেই ঘরের দিকে এগিয়ে যায় অতীন। বুড়ো কমল

বিশ্বাসের শীর্ণ পাঁজরের আড়ালে হঠাৎ একটা প্রচণ্ড মায়ার হৃৎপিণ্ড যেন ভয় পেয়ে কেঁপে ওঠে। চোখের কোটরটাই ছলছল ক'রে ওঠে। ডুকরে ওঠেন কমল বিশ্বাস—ওদিকে যাসনি অতু। ওঘরে কেউ নেই।

হেসে ফেলে অতীন—জানি।

সুধাময়ী আশ্চর্য হন—শুনেছিস তা'হলে।

অতীন—হ্যাঁ, সবই শুনেছি। খুব ভাল হলো মা। এরকম হওয়াই উচিত ছিল।

কমল বিশ্বাস যেন মুগ্ধ হয়ে অতীনের মুখটাকে দেখছেন। রসিকপুরের এই অভিশপ্ত এক ভাঙ্গা-বাড়ির ছেলের মনটা কি হঠাৎ সোনা কুড়িয়ে পেয়ে বড়লোক হয়ে গেল? কেমন ক'রে পেল?

অতীন বলে—তোমরা আমার জন্যে দুঃখ না করলেই আমার আর কোন দুঃখ নেই।

কমল বিশ্বাস—সত্যি বলছিস তো অতু?

অতীন হাসে—হ্যাঁ বাবা। আর মিথ্যে কিছু বলতে ইচ্ছে হয় না।

সুধাময়ী—কেতকীর কথা ভেবে যদি মনে কোন দুঃখ…।

অতীন—হ্যাঁ, ভাবতে শুধু এই দুঃখ হয় যে, মানুষটা বড় বেশি ভাল ছিল। এত ভাল হওয়া উচিত হয়নি।

কমল বিশ্বাস চেঁচিয়ে ওঠেন—অতুকে আর বেশি কথা বলিও না সুধা। ওকে এখন একটু জিরোতে দাও।

অতীন বলে—ওঘরের চাবিটা দাও মা।

রসিকপুরে মেঘলা অঘ্রানের সকালবেলার কাক ভেজা-ভেজা স্বরে অনেক ডাক ডেকেছে। অতীনেরও ঘুম ভেঙ্গেছে। এবং ঘুম ভাঙ্গতেই ঘরের ভিতরে সব দিকেই দু'চোখের দৃষ্টি ঘুরিয়ে

ফিরিয়ে বার বার তাকিয়েছে। তার পর বিছানা থেকে উঠে আল-মারিটার ভিতরেও উঁকি দিয়ে দেখেছে।

না, কোন স্মৃতির চিহ্ন রেখে যায়নি কেতকী। কেতকী বড় চালাক। ঘরটাকে যেন একেবারে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার ক'রে রেখে দিয়ে সরে গিয়েছে। আলনাটা শূন্য, আলমারিটা শূন্য, ছোট টেবিলটাও শূন্য। ভুল ক'রে একটা ছেঁড়া রুমালও রেখে যায়নি কেতকী।

কিন্তু একটা বাচ্চা ছেলের ছোট্ট একটা ফটোও কি রেখে যেতে ভুলে গেল কেতকী? কেতকীর কি একবার সন্দেহও হয়নি যে, কেতকীর ছেলের অন্তত ফটোটা দেখবার অধিকার একজনের আছে। এবং সে মানুষটা একদিন এসে এই ঘরের ভিতরে ঢুকে অন্তত সেই ছোট্ট ফটোটা চোখে দেখতে না পেলে মনের দুঃখে ছটফট ক'রে উঠতে পারে।

আলমারির দেরাজটাকে একবার ভাল ক'রে হাতড়াতে গিয়ে অতীনের হাতটা শুধু পুরনো ধুলোয় মাখা হয়ে কাঁপতে থাকে। না, কিছু নেই। কী সুন্দর প্রতিশোধ নিতে জানে কেতকী! মিথ্যা সোনার গল্প বলে যাকে এই বাড়িতে আনা হয়েছিল, যার গায়ের সব সোনা কেড়ে নেওয়া হয়েছিল, তাকেই শেষে এই বাড়ির রক্তের সোনা ঘুষ দিয়ে বিদায় দিতে হয়েছে। ভালই হয়েছে।

পাঁচু এসে দরজার কাছে দাঁড়ায়, আর খুশি হয়ে এক গাল হাসি হেসেই আবার কাঁচুমাচু হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। অতীনের হতাশ চোখের অপেক্ষাটা কি পাঁচুর চোখেও ধরা পড়ে গেল?

পাঁচু বলে—মুখ ধুয়ে নিন আর চা খেয়ে নিন দাদাবাবু।

অতীন হাসে—চা তৈরী করলে কে? তুই?

পাঁচু হাসে—আর কে করবে বলেন?

পাঁচুর হাসিটা হাসি বলে হয় না। হাসতে গিয়ে গেঁজেল

পাঁচুর লাল চোখ দুটো যেন মিটমিট ক'রে কাঁদুনি চাপতে চেষ্টা করছে।

চলে গেল পাঁচু। পাঁচুকে আর জিজ্ঞেসা করা গেল না; কত বড়টি আর দেখতে কেমনটি হয়েছে তোর বউ দিদির ছেলেটা? তোরই তো কোলে কোলে ঘুরেছে ছেলেটা! খুব দুষ্টু, না খুব শান্ত? ওরা চলে যাবার সময় তোরা কি খুব কেঁদেছিলি, না ওরা কেঁদেছিল? ছেলেটা কাঁদেনি তো?

এই প্রশ্নগুলিও যে অসার বিলাপের বিলাস মাত্র। ঘর থেকে বের হয়ে আর চোখ মুখ ধুয়ে যখন চা-খাবার খায় অতীন, তখন রসিকপুরের কাকের ভেজা-ভেজা স্বরও বেশ শুকনো আর কর্কশ হয়ে উঠেছে। বেলা হয়েছে মনে হয়।

জানালার কাছে দাঁড়িয়ে দেখা যায়, পুকুরটা কানায় কানায় জলে ভরে গিয়েছে। আর এক পশলা বৃষ্টি হলেই জল উছলে পড়ে বাঁশবাগানটাকে ভাসাবে। মাছগুলিও পালাবে। সত্যিই মাছ আছে কি? একটা ছিপ যোগাড় করলে কেমন হয়? পাঁচুটা গেল কোথায়?

পাঁচুকে ডাকবার জন্য বারান্দার দিকে এগিয়ে আসতেই অচেনা গলার স্বর শুনে আশ্চর্য হয় অতীন। মানুষটার ভাষাও অদ্ভুত। ঠিক বোঝা যায় না, কোন বাঙ্গালী ভদ্রলোক হিন্দী বলছে, না হিন্দুস্থানী ভদ্রলোক বাংলা বলছে।

—কে কথা বলছে পাঁচু?

পাঁচু বলে—শর্ম্মাজী এয়েছেন।

ব্যস্তভাবে হেঁটে কমলবাবুর ঘরের কাছে এসে দাঁড়াবার পর অতীনের ধাঁধা ভাঙ্গে। গেরুয়া রং-এর পাগড়ি, কপালে তিলক বেশ প্রশান্ত ও সৌম্য চেহারার এক হিন্দুস্থানী ভদ্রলোক লম্বা একটা খাতা খুলে কি-যেন লিখছেন। তারপরেই খাতা গুটিয়ে উঠে দাঁড়ালেন।—বাস্, এখন শুধু নাম লিখাই হয়ে রহিল। হামার

লোক একেবারে ঠিক ঠিক পহেলা ফাগুনকে পঁহুছে যাবে। আপনাদিগকে হরিদ্বার তক্ নিয়ে গিয়ে হামার ধরমশালায় পঁহুছাই দিবে। সরকারী পিলগ্রিম আফিস থেকে রাস্তার বরফ গলনেকি বার্তা আসিয়া পড়তেই আপনাদিগকে প্রথম যাত্রী দলের সাথে রওয়ানা করিয়ে দিব। জয় বদরিবিশাল!

চলে গেলেন শর্মাজী। অতীনও কিছুক্ষণ নীরব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপরেই রাগ করে চেঁচিয়ে ওঠে।—এ কি কাণ্ড করছো তোমরা?

কমল বিশ্বাস—কাণ্ড বলছিস কেন অতু?

অতীন—নিশ্চয় বদ্রিনাথ যাবার ব্যবস্থা করছো?

কমল বিশ্বাস—হ্যাঁ।

অতীন—তার মানে মরবার ব্যবস্থা করছো?

হেসে ওঠেন কমল বাবু—তোরও কি তাই বিশ্বাস?

অতীন—নিশ্চয়। এই শরীরে বদ্রিনাথ গেলে যে তোমাদের আর ফিরতে হবে না।

কমল বিশ্বাস—নাই বা ফিরলাম। ফিরে আসবার দরকারই বা কি? আমাদের যে এদিকের সব কাজ ফুরিয়েছে অতু?

চমকে ওঠে অতীন। ফ্যালফ্যাল ক'রে কমল বিশ্বাসের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। কমল বিশ্বাসের কোটরগত চোখের চাহনিকে জীবনে এত ভয় কোন দিন পায়নি অতীন। আত্মহত্যার প্রতিজ্ঞাও এত সহজে হেসে হেসে বলতে পারে মানুষ?

সুধাময়ী বলেন—তোর দুঃখ করবার বা রাগ করবার কিছু নেই অতু।

অতীন—আমাকে শাস্তি দেবার জন্যেই বোধ হয় এই সব কাণ্ড করছো।

সুধাময়ী—ছিঃ, কি বলছিস রে বোকা ছেলে?

অতীন— তা না হলে এরকম কাণ্ড করছো কেন? আমি

এলাম, আর তোমরাও চললে?

কমল বিশ্বাস হাসেন—আমাদের যেতে হচ্ছে বলেই তুই এসে পড়েছিস অতু। যার থাকা উচিত সে থাকবে; আর আমরা, যাদের আর থাকবার কোন মানে হয় না, তারা চলে যাবে, এই তো নিয়ম রে বাবা।

অতীন—না, তোমরা যেতে পারবে না।

কমল বিশ্বাস—ওকথা বলিস না, বলতে নেই অতু।

অতীন—কেন? কোন্ দুঃখে চলে যাবে তোমরা?

কমল বিশ্বাস—কোন্ সুখে থাকবো বলতে পারিস?

অতীনের মুখরতার আবেগ হঠাৎ একটা ধাক্কা খায় যেন! কুণ্ঠিত ভাবে বলে—পুরনো কথা ছেড়ে দাও। যা হবার হয়ে গিয়েছে। এখন ইচ্ছে করলেই সুখে থাকতে পার।

কমল বিশ্বাস—কেমন ক'রে?

অতীন—আমার চাকরির মাইনে এখন মন্দ নয়। আমি তোমাদের টাকা পাঠাবো। তোমাদের কোন অসুবিধা হবে না।

কমল বিশ্বাসের চোখের চাহনিতে একটা করুণ কৌতুক ফুটে ওঠে।—কিন্তু টাকা পাঠাবি কেন অতু? আমরা তো কোন সুবিধা চাইছি না।

অতীন—তবে কি চাইছো?

কমল বিশ্বাস—কতবার বলবো রে বাবা। আর থাকতেই চাই না।

অতীন—কেন চাও না?

কমল বিশ্বাসের কোটরগত চোখে যেন পুরনো আগুণের ছায়া হঠাৎ কেঁপে ওঠে।—কি নিয়ে থাকবো?

কমল বিশ্বাসের রূঢ় প্রশ্নটা যেন হাতুড়ির শক্ত আঘাতের মত অতীনের বুকের উপর আছাড় দিয়ে পড়ে। রসিকপুরের ভাঙ্গা-বাড়ির সেই ভয়ানক বুড়োর জীবনের এই শেষ প্রশ্নের উত্তর দেবার

সাধ্যি নেই অতীনের। সত্যিই তো, কি নিয়ে থাকবে মানুষটা?

কিন্তু কি নিয়ে থাকতে চায় মানুষটা? সুধাময়ীর নিরুত্তর মুখেও যেন একটা প্রশ্ন চমকে উঠেছে। যেন বলতে চাইছেন সুধাময়ী, শুধু বাচবার জন্য বেঁচে থেকে লাভ কি? কারও জন্য, কিছুর জন্য বেঁচে থাকবার আর আশা আছে কি? দরকার হবে কি?

অতীন বলে—আমার ইচ্ছা এবার বাড়িতেই থাকি, যদিও অফিসটা অনেক দূর হয়ে যাবে, যাওয়া আসা করতে সময় লাগবে অনেক বেশি।

সুধাময়ী—বেশ তো। নিজের বাড়িতে থাকবি। আমরাও তো তাই চাই।

কমল বিশ্বাস—কিন্তু তাই বলে আমাদের যাওয়াটা বন্ধ করবার দরকার হয় না।

কিছুক্ষণ কি-যেন ভাবে অতীন। তার পর সন্দিগ্ধ হয়ে তাকায়। হঠাৎ প্রশ্নও করে ফেলে—কেতকী থাকলে বোধ হয় চলে যেতে চাইতে না?

কমল বিশ্বাস অদ্ভুতভাবে হাসেন—না, ঠিক তা নয়; কেতকীকে চলে যেতে দিতে আমাদের একটুও কষ্ট হয়নি।

কমল বিশ্বাসের হাসির সঙ্গে যেন একটা জ্বলন্ত বেদনাও হাসছে। অনেকক্ষণ একটা অবুঝ বিস্ময়ে চোখ ভার ক'রে তাকিয়ে থাকে অতীন। তারপর বোধ হয় এতক্ষণে বেশ স্পষ্ট ক'রে বুঝতে পারে বলেই কেঁপে ওঠে অতীনের বুকটা। আস্তে, আস্তে, যেন যন্ত্রণাময় একটা ভীরুতায় কাতর হয়ে অতীনের মুখে আর একটা প্রশ্ন দুরুদুরু করে।—কেতকীর ছেলেটা থাকলে বোধ হয় তোমরা চলে যেতে চাইতে না।

উত্তর দেন না কমল বিশ্বাস। জিরজিরে বুকের ভিতর থেকে তাঁর শেষ জীবনের অভিমানের ভাষা শুধু দুটো জলের ফোঁটা হয়ে

ছ'চোখ থেকে এক সঙ্গে টপ্ ক'রে ঝরে পড়ে।

সুধাময়ী—এসব কথা তুই না জিজ্ঞেসা করলেই ভাল করতিস অতু।

স্তব্ধ হয়ে আর মাথা হেঁট ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে অতীন। এই ভাঙ্গা বাড়ির জীর্ণ বুকের বেদনা যে অভিশাপের কাঁটা হয়ে অতীনেরই বুকের ভিতর বিঁধছে। কেতকীর ছেলেটা এলই যদি, তবু তাকে এখানে ধরে রাখা গেল না কেন? এ যে অতীনেরই জীবনের ভুল, অতীনেরই অপরাধ। কিন্তু···সে-জন্য এই ছটি মানুষ তাদের নিজের নিজের জীবনের উপর এত নিষ্ঠুর হয়ে ওঠে কেন? বেঁচে থাকবার ইচ্ছাটাকেই মেরে ফেলেছে কেন? যা নিয়ে বেঁচে থাকবার শখ আছে মনে, তাই নিয়ে বেঁচে থাকবার আশা এখনই ছেড়ে দেবারই বা কি অর্থ হয়? এমনও হতে পারে তো···।

অতীনের মাথার জ্বালায় অতীনের মুখের ভাষাও যেন ভুল ক'রে সব লজ্জা ভুলে যায়। সুধাময়ীর মুখের দিকে তাকিয়ে কথাটা বলেই ফেলে অতীন।—আমি যদি বলি, তোমাদের এতটা হতাশ হওয়া উচিত নয়? যদি বলি, যা নিয়ে থাকতে চাও, তা একদিন পেয়ে যাবে, তবে?

সুধাময়ী—একদিন মানে কোন্ দিন? কবে?

সুধাময়ীর মুখের একটা সামান্য প্রশ্ন; এবং খুবই আস্তে আস্তে ক্লান্ত স্বরে কথাটা বলেছেন সুধাময়ী; কিন্তু এমন সামান্য ও ক্লান্ত স্বরে বলা প্রশ্নটাও যেন ঠাট্টার বজ্রনাদ হয়ে অতীনের কানের কাছে বেজে ওঠে। এই প্রশ্নের উত্তর দেবার সাহস অতীনের বুকের নিঃশ্বাসের মধ্যেও আজ আর নাই। অতীন যে আজ তার এই শরীরটাকেই বিশ্বাস করে না। কাজরীর ধিক্কার যে নিতান্ত মিথ্যা ধিক্কার নয়। অতীন আজ শুধু একটা পুরুষের চেহারা মাত্র, পুরুষ নয়। অতীন বিশ্বাসের রক্তের অহংকার মাটি হয়ে গিয়েছে। শাড়ির আঁচলের ছায়া চোখে পড়লে বুক কাঁপে। নারীর মুখের

হাসির শব্দ শুনলে কানের দু'পাশে ঠাণ্ডা ঘামের ধারা সিরসির করে। অসম্ভব, অতীন বিশ্বাসের জীবনে নতুন ক'রে বাসরঘরের উৎসব জাগিয়ে তোলা আর সম্ভব নয়। রসিকপুরের ভাঙ্গা রাজ-বাড়ির বুড়ো-বুড়ি আবার ভয়ংকর এক চক্রান্ত ক'রে অতীনের জীবনের কাছ থেকে যে প্রতিশ্রুতি আদায় করতে চায়, সে প্রতিশ্রুতি দেবার শক্তি হারিয়েছে অতীন বিশ্বাস।

সুধাময়ী বলেন—মনে হচ্ছে, বিয়ে করতে চাইছিস।

অতীন—না।

সুধাময়ী—কেন ?

অতীন—অসম্ভব।

কমল বিশ্বাস হেসে ওঠেন—অতুকে আর বিরক্ত করো না সুধা। যার যা সাধ্যি নয়, তার কাছে তাই দাবি করা উচিত নয়।

কি ভেবে কথাটা বললেন কমল বিশ্বাস, এবং কেনই বা বলতে গিয়ে হেসে ফেললেন ? রসিকপুরের ভাঙ্গা-বাড়ির ইঁট-পাথরের জরাও কি অতীন বিশ্বাসকে ধিক্কার দিতে গিয়ে হেসে ফেলেছে ? কেতকীর সেই আর্তনাদের জ্বালা যদি এখনও এই বাড়ির বাতাসের বুকের ভিতরে কোথাও নীরব হয়ে লুকিয়ে থেকে থাকে, তবে সেই জ্বালাও বোধ হয় প্রতিশোধের তৃপ্তিতে নীরবে হেসে উঠেছে।

আর এক মুহূর্ত এখানে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে ইচ্ছে করে না ; দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না অতীন। শরীরটা যেন নিজেরই অসারতার আর ভীরুতার লজ্জায় বার বার টলে উঠছে।

অতীন বলে—আমি যাই।

সুধাময়ী—কোথায় ?

অতীন—যাই, অফিসে কতগুলি জরুরী কাজ আছে।

সুধাময়ী—এখনই যাবি ?

অতীন—হ্যাঁ। সময়মত পৌঁছতে হলে এখনই রওনা হতে হয়।

সুধাময়ী—এবার কি এখানে থেকেই···।

অতীন—না, এখানে থেকে অফিস করতে এখন অনেক অসুবিধা আছে।

সুধাময়ী—তা হলে…।

কমল বিশ্বাস তেমনই শান্তভাবে আর হেসে হেসে সুধাময়ীকেই অনুরোধ করেন—তুমি আবার কোন নতুন কথা বলে অতুকে অসুবিধায় ফেলবে না সুধা। যাচ্ছে যাক, যেতে দাও।

সুধাময়ী—আমরা চলে যাবার আগে অন্তত একবার যদি আসিস, তবে …।

কমল বিশ্বাস—আঃ, তুমি কেন বাজে কথা বলে অতুকে বিরক্ত করছো সুধা?

জোর ক'রে চোখ তুলে, আর মনের আশাটাকে যেন শেষ সাহস দিয়ে একটু সজীব ক'রে নিয়ে কমলবাবুর মুখের দিকে তাকায় অতীন।—তোমরা কি সত্যিই চলে যাবে?

কমলবাবু হাসেন—নিশ্চয়।

অতীন—যেও না।

কমলবাবু—না যেয়ে কি করবো?

অতীন—কি আর করবে? যতদিন বেঁচে আছ ততদিন এখানেই থাকবে।

সেই ভয়ানক জিজ্ঞাসা আবার কমল বিশ্বাসের কোটরগত চোখের হাসিতে ঝিলিক দিয়ে চমকে ওঠে—কি নিয়ে থাকবো?

মাথা হেঁট করে অতীন। আস্তে আস্তে হেঁটে এগিয়ে যেয়ে বারান্দার প্রান্তে এসে দাঁড়ায়। ভাঙ্গা সিঁড়ির শেষ ধাপে নেমে একবার থামে। তারপর আসশেওড়ার বাসি ফুল মাড়িয়ে বাগানের পথ ধরে আস্তে আস্তে হেঁটে চলে যায়।

দারোয়ান বলে—আপনার চেহারা দেখে মালুম হচ্ছে আপনার

ভবিষ্যৎ আউরভি খারপ হয়েছে। ছুটি নিয়েও অফিসে আসলেন কেন?

মালিক বলেন—বহুত ধন্যবাদ অতীনবাবু। আমার বড়ো চিন্তা হয়েছিল, আজকের দিনে আপনি গরহাজির হলে এতো কাজ সামলাবে কে? দেখছেন তো কাস্টমারের রাশ্। আজ সকালবেলাতেই টেলিফোনে ত্রিশ-চল্লিশটা এনকোয়ারী এসেছে। নেপালবাবু একা সামাল দিতে পারছেন না।

হ্যাঁ, পার্ক ষ্ট্রীটের এই অটোমোবিল শো-রুমে এত অনুসন্ধানীর ভিড় কোনদিন হয় নি। কালকেই জাহাজ থেকে খালাস করবার কথা ছিল জার্মানীর যে চালান, নিউ মডেলের যে দশটা নানা রং-এর নমুনা গাড়ি, সেগুলি বোধ হয় কালই যথাসময়ে খালাস করা হয়েছে। এবং নিয়ে এসে শো-রুমের ভিতরে ঠাঁই ক'রেও দেওয়া হয়েছে। তাই এত এনকোয়ারী আর এত দর্শকের ভিড়। নেপালবাবু সত্যিই তাল রাখতে পারছেন না। টেলিফোনের এনকোয়ারীকে শান্ত করতে এলে ওদিকে দর্শকের এনকোয়ারী বিরক্ত হয়ে ওঠে।

নেপালবাবু রাগ ক'রে বলেন—আপনি দয়া ক'রে ঐ মহামানবের সাগরতীরে গিয়ে একটু দাঁড়ান আর ভিড়টাকে তোয়াজ করুন তো মশাই। ও কর্ম্ম আমার হাড়ে সম্ভব নয়। এত আর্য অনার্য দ্রাবিড় ও চীনের সমাগম, উঃ, শুধু কয়েকটা নিউ মডেল দেখবার জন্য!

শো-রুমের ভিতরে এগিয়ে যায় অতীন। ভিড়টাকে একটা আন্তর্জাতিক সমাবেশের মতই দেখায়। যেমন হরেক রকম বেশভূষার আর চেহারার বৈচিত্র্য; তেমনই হরেক রকম ভাষার মুখরতা। পুরুষ আছেন, মহিলা আছেন, দম্পতি আছেন। কেউ কেউ একেবারে সপরিবারে এসেছেন। কেউ দাম জিজ্ঞেসা করেন। কেউ কিস্তি খরিদের নিয়ম জানতে চান। কেউ প্রশ্ন করেন,

গ্যালনে কত মাইল যায় ?

এক তরুণী চেঁচিয়ে ওঠেন, আঃ, লাভলি। কী সুন্দর সীট আর কুশন !

গাড়ির দরজা খুলে দিয়ে অতীন হাসে—আপনি কাইণ্ড্লি একবার বসে দেখুন। তা হলে আরও ভাল ক'রে বুঝতে পারবেন যে···।

তরুণী খিল খিল ক'রে হেসে নিউ মডেলের সীটের উপর বসেন এবং বসে বসে শরীরটাকে নাচিয়ে স্প্রিং-এর দোলানি টেস্ট করেন।

অতীন বলে—এক একটি সীটের কুশন ত্রিশটা স্প্রিং-এর সেট এর উপর বসানো।

—হ্যালো সেলসম্যান। একজন কালো সাহেব ডাক দেন।

এগিয়ে যেয়েই অতীন বলে—দেখুন স্যার, কী অদ্ভুত গীয়ার সিস্টেম আর কী সুন্দর ফুটব্রেক। একটুও জার্ক নেই। ভেরি স্মুথ পিক-আপ, গুড ট্রাকশন, এফিসিয়েণ্ট ব্রেকিং, আর খুব চমৎকার শক অ্যাবজর্পশন।

—ইঞ্জিনের শব্দ ?

—ও, নো নয়েস, ইট ইজ সিম্প্লি মিউজিক। আর দেখুন, কী সেনসিটিভ সেল্ফ্স্টার্টার !

গাড়ির ভিতরে ঢুকে সেল্ফ্-স্টার্টার টিপে ইঞ্জিনের গুঞ্জন শোনায় অতীন।

এক বাঙ্গালী ভদ্রলোক একটা বাচ্চা ছেলের হাত ধরে এগিয়ে এসে বলেন—পেট্রল কম খায়, আর ইঞ্জিনের জোর ভাল, এরকম একটা নিউ মডেল যদি থাকে···।

অতীন—নিশ্চয় আছে।

কয়েক পা এগিয়ে যেয়েই অতীন বলে—আপনি যা খুঁজছেন, এই টুরারের কাছে তাই পাবেন। গ্যালনে পঁচিশ মাইল যাবে। ফার্স্ট গীয়ারে বড় বড় চড়াই এক দমে পার হয়ে যাবে। তা

ছাড়া, বডির ফিটিংসগুলি দেখুন। বেস্ট ওক উড, স্টেনলেস স্টীল, আর আনব্রেকব্‌ল্‌ গ্লাস।

ভদ্রলোক—হর্নের আওয়াজটা কর্কশ নয়তো?

—টেস্ট ক'রে দেখুন তা হ'লে? বলতে বলতে বাচ্চা ছেলেটাকেই কোলে তুলে নিয়ে স্টীয়ারিং-এর কাছে বসে অতীন; বাচ্চাটারই হাত দিয়ে একটা প্লাগ চেপে ধরে। মৃদু ও মিষ্টি-গম্ভীর একটা শব্দ বেজে ওঠে। ভদ্রলোক হেসে ফেলেন।—না, আওয়াজটা ভালই।

অতীন আশান্বিতহয়ে বলে—এটা আপনার পছন্দ হয়েছে বলে মনে হচ্ছে।

ভদ্রলোক—দামটা জানবার পর পছন্দ হবে।

অতীন—ক্যাটালগ প্রাইস ষোল হাজার; যদি কিস্তিতে নিতে চান তবে…।

ভদ্রলোক—না, নগদ কিনতে চাই।

অতীন খুশি হয়ে বলে—তা হ'লে তো আর কথাই নেই; শতকরা দশ ডিসকাউন্ট অর্থাৎ একহাজার ছ'শো টাকা বাদ যাবে।

ভদ্রলোক—তা হ'লে নিয়ে ফেলি, কি বলুন?

অতীন—নিশ্চয়। আমাকে যদি বিশ্বাস করেন, তবে একটা কথা বলতে পারি।

ভদ্রলোক—কি?

অতীন—আপনি সবচেয়ে খাঁটি জিনিসটি পছন্দ ক'রে ফেলেছেন। এই মডেলের উপরের বাহার কম বটে, কিন্তু ভিতরটা চমৎকার।

ভদ্রলোক খুশি হয়ে বলেন—তা হ'লে কি করতে হবে বলুন?

অতীন—একহাজার টাকার চেক দিয়ে বুক ক'রে যান। বাকি পেমেণ্ট অন ডেলিভারি। গাড়িটাকে চেক ক'রে সাতদিনের

মধ্যেই আপনাকে ডেলিভারি দেওয়া হবে।

ভদ্রলোকের সঙ্গে গল্প করতে করতে অফিস ঘরের ভিতরে ঢোকে অতীন। তারপর, চেয়ারের উপর বসতে গিয়ে এতক্ষণ পরে যেন হুঁস হয় অতীনের, বাচ্চাটাকে তখন পর্যন্ত দু'হাতে জড়িয়ে বুকের কাছে তুলে রেখেছে অতীন।

ভদ্রলোক বলেন—ওকে ছেড়ে দিন এবার ; আপনার কাজের অসুবিধা হবে।

অতীন বলে—কোন অসুবিধা হবে না।

বাচ্চাটাকে কোলের উপর বসিয়ে রেখে টেবিলের উপরের একটা রেজিস্টার ধরে টান দেয় অতীন। ভদ্রলোকও চেক লিখতে শুরু ক'রে দেন।

কলম হাতে নিয়ে ভদ্রলোকের মুখের দিকে অতীন জিজ্ঞাসু-ভাবে তাকাতেই ভদ্রলোক বলেন—হ্যাঁ, লিখুন।...নির্মলকান্তি রায়, অডিটর ; রেলওয়ে অ্যাকাউণ্টস অফিস, হাওড়া।

কলমের উপরে অতীনের মাথাটা হঠাৎ অবশ হয়ে ঝুঁকে পড়ে। কিন্তু সামলে নিয়েই মুখ তুলে নির্মলকান্তি রায়ের মুখের দিকে একবার তাকায়। তার পরেই কলম নামিয়ে রেখে পকেট থেকে রুমাল বের ক'রে কপালটাকে জোরে জোরে ঘষতে থাকে।

ভদ্রলোক বলেন—ওকে আমার কাছে দিন, কিংবা ঐ চেয়ারে বসিয়ে দিন—কিংবা ছেড়ে দিন, একটু ছুটোছুটি করুক।

অতীন বলে—থাকুক না কেন, আমার কোন অসুবিধা হচ্ছে না।

বলতে বলতে অতীনের সারা চোখে-মুখে যেন হঠাৎ বিদ্যুতের আভার মত অদ্ভুত এক মায়া-জ্বালার হাসি চমকে ওঠে। বাচ্চাটার মুখের দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে অতীন—বাঃ, কেমন চুপটি ক'রে বসে আছে। বড় শান্ত মনে হচ্ছে। বাঃ!

হঠাৎ ; যেন একটা আদুরে লোভের চমক লেগে লুব্ধ হয়ে

ছটফট ক'রে ওঠে অতীন। বাচ্চাটার মাথা বুকে চেপে ধরে। চোখ দুটোও যেন অগাধ তৃপ্তির আবেশে অলস হয়ে তারপর একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। এবং চোখের পাতা ভিজে যাবার ভয়ে আবর চমকে চোখ মেলে হেসে ওঠে অতীন।—আপনার ছেলে?

ভদ্রলোক—হ্যাঁ···আমারই ছেলে।

—বাঃ, বেশ ছেলে। বলতে বলতে ভদ্রলোকের কোলে বাচ্চাটাকে তুলে দিয়ে আবার কলম হাতে তুলে নেয় অতীন।

লেখা শেষ হয়। রসিদ লেখাও শেষ হয়। চেকটা হাতে নিয়ে ভদ্রলোককে অশেষ ধন্যবাদ জানিয়ে আবার ব্যস্তভাবে চলে যায় অতীন। শো-রুমের ভিতর গিয়ে মানুষের ভিড়ের যত প্রশ্ন হাসি কৌতুহল আর মুখরতার সঙ্গে ছুটোছুটি করতে থাকে।

ভাগবত চলে গিয়েছে অনেকক্ষণ। ক্যামাক ষ্ট্রীটের সন্ধ্যার আলো অঘ্রানের কুয়াশায় বেশ ঝাপসা হয়ে উঠেছে। আর সিন্‌হা সাহেবের গ্রেট ডেন বোধহয় এই কুয়াশার উপরে রাগ ক'রে চিৎকার ক'রে চলেছে।

ঘরের ভিতরের চেয়ারের উপর অতীনও মাথা কাত ক'রে আর চোখ বন্ধ ক'রে বসে থেকে প্রায় ঘুমিয়ে পড়েছিল। হ্যাঁ, আমারই ছেলে; বাঃ; কি অদ্ভুত, কি চমৎকার, কি সুন্দর একটা মিষ্টি ঠাট্টার কথা বলছে নির্মলকান্তি রায়। তবু এই বাচ্চাটারই মাথা বুকের উপর চেপে ধরতে অতীনের নিঃশ্বাসের স্বাদ যে হঠাৎ বদলে গেল। অন্তত এক মিনিটের জন্য অতীনের এই ভীরু শরীরের স্নায়ু আর শিরা মুগ্ধ হয়ে বুঝে ফেলেছে; এই ছোঁয়াটুকু পাওয়ার জন্যই তো পুরুষ হওয়া। নইলে রক্তে আর জলে যে কোন প্রভেদ থাকে না। নইলে···।

অতীনের ঘুমন্ত চোখের পাতা যখন ভিজে ভারি হয়ে যায়,

তখন ধড়ফড় ক'রে নড়ে বসে অতীন। চোখ মোছে আর চোখ মেলে তাকায়। আর, সেই মুহূর্তে আতঙ্কিতের মত চমকে ওঠে।

এবং পর মুহূর্তে সেই আতঙ্ক আর সেই চমকের কঠোরতা যেন নতুন বিস্ময়ের ছোঁয়ায় ভিজে গিয়ে নরম হয়ে যায়।

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে বিজয়া। জলে ভরে গিয়ে ছলছল করছে বিজয়ার চোখ। হাত জোড় করেছে বিজয়া। —অতীনবাবু, ক্ষমা করুন।

—ক্ষমা কিসের? আমার কাছে আপনার ক্ষমা চাইবার কি আছে?

দুঃসহ অস্বস্তিতে যেন ছটফট ক'রে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় অতীন; আর সন্দেহও করে, দৃশ্যটা স্বপ্নের ঘোরে দেখা একটা দৃশ্য নয় তো?

বিজয়া—আপনি জানেন, কেন ক্ষমা চাইছি।

অতীন বিব্রতভাবে বলে—জানি, বুঝতেও পারছি; কিন্তু বুঝতে পারছি না, আপনি এত দুঃখিত হলেন কেন?

বিজয়া—শুধু দুঃখিত হইনি অতীনবাবু; নিজেকে কেমন যেন পাগল-পাগল মনে হচ্ছে।

অতীন—যাকগে; ছেড়ে দিন; ভুলে যান ওসব কথা।

বিজয়া—ভুলতে পারা যায় না যে?

অতীন হাসে—ভুলতে হবে, নইলে যে আরও পাগল-পাগল হয়ে যাবেন।

বিজয়া—তার চেয়ে মরে যাওয়াই কি ভাল নয়?

এইবার ভয় পায় অতীন। —না না, আপনি আপনার একটা অপরাধের, তার মানে একটা ভুলের দুঃখকে এরকম ভয়ানক ক'রে তুলবেন না। ওতে কোন লাভ নেই। এবার থেকে ভবিষ্যতে···।

বিজয়া করুণ ভাবে হাসে—আপনি আদালতের মত প্রথম

অপরাধের আসামীকে ভবিষ্যতের জন্য সাবধান ক'রে দিচ্ছেন অতীনবাবু! কিন্তু মনে মনে ক্ষমা করতে বোধ হয় পারলেন না।

অতীন—কিভাবে ও কি ক'রে ক্ষমা করতে হয় জানি না। শুধু বলতে পারি……।

বিজয়া—কাজরীকে তো বেশ ক্ষমা করেছেন।

চেঁচিয়ে ওঠে অতীন—না। আপনি বাজে তর্ক করবেন না। আপনাকে ক্ষমা করতে পারি, কিন্তু কাজরীকে ক্ষমা করতে পারবো না।

ভীত ও আড়ষ্ট চোখে তাকিয়ে বিজয়া ভয়ে ভয়ে যেন আবেদন করে—কাজরী আপনার স্ত্রী, তাকে ক্ষমা করাই তো উচিত অতীন বাবু।

অতীন—না, আপনার বান্ধবী আমার স্ত্রী নয়।

বলতে বলতে টেবিলের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে আজকেরই একটা খবরের কাগজ খিমচে ধরে বিজয়ার হাতের উপর ছুঁড়ে দিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে অতীন।—আজকের আদালতের রিপোর্ট পড়ে দেখুন দয়া করে; তবেই বুঝবেন, আপনার বান্ধবী আপনার চেয়েও কত বেশি ভয়ানক।

ভয় করে আর হাতও কাঁপে বিজয়ার; তবু যেন জোর ক'রে চোখ বুলিয়ে খবরের কাগজে আদালতের রিপোর্ট খোঁজে; এবং তারপরই থরথর করে কেঁপে ওঠে বিজয়ার চোখ। খবরের কাগজটা বিজয়ার শিথিল হাতের ছোঁয়া থেকে খসে ঝুপ ক'রে পড়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে দু'হাতে মুখ ঢেকে বিজয়াও ঝুপ ক'রে মেঝের উপর বসে পড়ে। বিজয়ার সাদা সিল্কের শাড়ির আঁচলটাও যেন একটা নির্মম বিস্ময়ের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে একেবারে মাথা লুটিয়ে দিয়ে মেজের উপর ছড়িয়ে পড়ে।

বিজয়াকে যে সত্যিই পাগল-পাগল মনে হয়। কিসের জন্য কার জন্য এরকম ক'রে মেজেতে লুটিয়ে বসে দু'হাতে মুখ ঢেকে

ফুঁপিয়ে উঠলো বিজয়া ? বিজয়ার কোন্ সর্বনাশ হলো ? বিজয়া হঠাৎ এসে যেন একটা থিয়েটারী কাণ্ড বাধিয়ে তুলেছে। অতীনের মনের অস্বস্তিও এইবার যেন বিরক্ত হয়ে ছটফট করে। অতীন বলে—আপনি এসব কি কাণ্ড আরম্ভ করলেন ?

ব্যস্তভাবে উঠে দাঁড়ায় বিজয়া। রুমাল তুলে একটা ঘষা দিয়ে চোখ-মুখ মুছে ফেলে, সিল্কের শিথিল আঁচলটাকে চটপটে হাতের এক টানে টেনে আর কোমরের চারদিকে শক্ত ক'রে একপাক জড়িয়ে নিয়ে গুঁজে দেয়। মনে হয়, বিজয়ার চেহারাটা যেন হঠাৎ একটা স্বপ্নের তাড়া খেয়ে এই পাগল-পাগল অবসাদের ঘুম থেকে জেগে উঠেছে।

শুকনো চোখ, খুবই শান্ত গলার স্বর, শুধু বুকটা যেন একটা তপ্ত নিঃশ্বাসের দৌরাত্ম্যে হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে কাঁপে, বিজয়া সোজা অতীনের মুখের দিকে তাকিয়ে বলে—কি ভেবেছে কাজরী ?

অতীন—কি বললেন ?

বিজয়া—এরকম একটা ভয়ানক মিথ্যে কথা বলে সেরে যাবে কাজরী ?

অতীন—মিথ্যে কথা নয়।

বিজয়ার চোখে যেন একটা বিদ্যুতের জ্বালা ঝিক ক'রে ওঠে। —আপনি মিছিমিছি মিথ্যে কথা বলবেন না।

অতীন—তার মানে ?

বিজয়া—আমাকে আপনি মিথ্যে কথা বলে কি বোঝাতে চাইছেন ? ভুলে যাচ্ছেন কেন, আমিই যে সাক্ষী ? আপনি পুরুষ না হলে কাজরী আমার কাছে যেত না, আর আমাকেও পাগল হয়ে, খুনী হয়ে···ক্ষমা করুন অতীন বাবু···বিশ্বাস করুন, কাজরী আমাকে আগে বলেনি যে আপনার মত ছিল না, নইলে, কাজরী আমাকে মেরে ফেললেও আপনার আশা আমি নষ্ট করতাম না অতীন বাবু।

হয় ক্ষমা চাইবার জন্য, নয় শাস্তি নেবার জন্য বিজয়ার চেহারাটা আবার পাগল-পাগল হয়ে অতীনের কাছে এগিয়ে যায় ; মাথাটা অলসভাবে ঝুঁকে পড়ে।

—ক্ষমা করেছি, বিশ্বাস করুন। আপনার ওপর রাগ করবার কোন অর্থ হয় না। বলতে গিয়ে অতীনের গম্ভীর গলার স্বরও যেন অদ্ভুত এক বেদনার আবেশে কোমল হয়ে যায়। ক্ষমা করতে গিয়ে যেন সান্ত্বনা দিয়ে ফেলেছে অতীন।

মুখ তুলে যখন আবার অতীনের মুখের দিকে তাকায় বিজয়া, তখন অতীন আশ্চর্য হয়ে হেসে ফেলে—আপনি সত্যি একটা কাণ্ড করলেন !

বিজয়ার পাগল-পাগল চেহারাটা যেন এক মুহূর্তের মধ্যে মরে গিয়ে আর ভুতুড়ে ছায়া হয়ে কোথায় পালিয়ে গিয়েছে। বিজয়ার সারা শরীরটাই দুর্বার খুশির আবেগে খিল-খিল ক'রে হেসে ওঠবার জন্য ছটফট করছে।

—আর যতই বকুনি দিন আপনি, আর একটুও ভয় নেই। বলতে বলতে ঘরের ভিতরে এদিকে-ওদিকে ছটফটে প্রজাপতির মত ঘুরে-ফিরে বেড়াতে থাকে বিজয়া। হাতঘড়ির দিকে একবার তাকায়। তার পরেই চেঁচিয়ে হেসে ওঠে।···আমার আর একটা মতলব আছে অতীনবাবু।

অতীন—বলুন।

বিজয়া—আপনাকে এখনি আমার সঙ্গে একবার বাইরে নিয়ে যাব।

অতীন—কোথায় ?

বিজয়া—আমাদের বাড়িতে।

অতীন—কেন ?

বিজয়া—চা খাওয়াতে, আর বাবার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে।

উত্তর না নিয়ে অপলক চোখের এক নতুন বিস্ময়ের অস্বস্তি চেপে রাখতে চেষ্টা ক'রে বিজয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে অতীন।

বিজয়া—আমাকে সন্দেহ ক'রে আপনার কোন লাভ হবে না অতীনবাবু। হ্যাঁ, যদি বলেন, এই ঘরের ভিতরে একটা চেয়ারের উপর মাথা কাত ক'রে আর ভেজা চোখ নিয়ে বসে থাকতে এখনও আপনার ভাল লাগে, তবে…।

অতীন—কি বললেন ?

বিজয়া…যদি এই ঘরের জন্য আপনার মনে কোন মায়া থেকে থাকে…।

চেঁচিয়ে ওঠে অতীন—তার মানে ?

বিজয়া—যদি কাজরী আসবে বলে আশা ক'রে অপেক্ষায় থাকতে…।

ভ্রুকুটি ক'রে তাকায় অতীন—আপনি অনর্থক কতগুলি অবান্তর কথা বলে যাচ্ছেন।

বিজয়া—মামলাতে নিজেকে ডিফেণ্ড করবার ইচ্ছা যদি থেকে থাকে…।

—চুপ করুন। চেঁচিয়ে ওঠে অতীন।

চুপ করে বিজয়া। অতীন বলে—আজই উকীলকে দিয়ে আদালতে জানিয়ে দেবার ব্যবস্থা ক'রে এসেছি ; আমি নিজেকে ডিফেণ্ড করবো না।

বিজয়া বলে—তা হ'লে চলুন।

বিজয়ার দু'চোখের চাহনিতে অদ্ভুত এক আবেদন নিবিড় হয়ে ফুটে উঠেছে। গলার স্বরের ব্যাকুলতা আরও নিবিড়। আর, সাজ-পোষাকের এত ধবধবে সাদাও যেন চূর্ণ হয়ে একেবারে সাত-রঙা হয়ে ঝলমল করছে।

অতীন বলে—চলুন।

প্রস্তুত ছিল না অতীন, এবং কল্পনাও করতে পারেনি যে, আজই এই রাতে এণ্টালির নিভৃতে লতা-পাতায় ঢাকা একটা শান্ত বাড়ির ঘরে চা খেতে এসে এমন একটা বিস্ময়ের সম্মুখে পড়তে হবে। এই বিস্ময় সহ্য করতে গিয়ে একটুও খুশি হয়নি, বরং ভয় পেয়েছে অতীন। বিস্ময়টা যেন অতীনের বুকের ভিতরের একটা ভীরুতাকে কঠোর বিদ্রূপের আঘাত হেনে শিউরে দিয়েছে।

চা-খাবার সামনে রেখে দিয়ে বিজয়া সেই যে অন্য ঘরের ভিতরে গিয়ে ঢুকেছে, আর এই ঘরে আসেনি। চা-খাওয়া শেষ হবার পর অনেক গল্প করলেন বিজয়ার বাবা নবগোপালবাবু। এবং উঠে যাবার আগে যে কথা বললেন নবগোপালবাবু, সে-কথা শোনবার পর বুঝতে পেরেছে অতীন, আর একমুহূর্তও এখানে না থেকে এবং কাউকে কোন কথা না বলে চুপচাপ ছুটে পালিয়ে যাওয়াই উচিত।

নবগোপালবাবু বলেন—আমার জীবনে আর কোন দুঃখ ছিল না অতীন, শুধু ঐ এক দুঃখ। মেয়েটা বিয়ে করবে না বলে অনর্থক একটা প্রতিজ্ঞা ক'রে বসেছিল।...যাক্, আজ যখন আমার কাছে এসে নিজের মুখে স্পষ্ট ক'রে বলেই ফেলেছে বিজয়া, তখন আমার ...দুঃখ তো দূর হয়ে গেছেই, শুনে নিশ্চিন্ত হয়ে গিয়েছি অতীন। বলতে বাধা নেই, তোমাকে দেখেও বড় খুশি হয়েছি অতীন। আমার কোন আপত্তি নেই। সুখী হও তোমরা।...আচ্ছা আমি এখন উঠি।

নবগোপালবাবু ঘরের ভিতরে চলে গেলেন; এবং হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে অতীন ছটফট ক'রে উঠতেই ঘরের ভিতরে এসে দাঁড়ায় বিজয়া, আর, যেন একটা লজ্জাহীন দুঃসাহসের উৎসাহে একেবারে স্বচ্ছন্দে এগিয়ে এসে অতীনের পাশে একই সোফার উপর বসে।

অতীন বলে—আপনি ভুল ক'রে আপনার বাবার কাছে ভয়ানক একটা অন্যায় কথা বলে ফেলেছেন।

বিজয়া—অন্যায় কথা হলেও সত্যি কথা বলেছি অতীনবাবু।

অতীন—তার মানে ?

বিজয়া—আমার মন যা চায়, তাই বলেছি।

অতীন—কি চায় আপনার মন ?

বিজয়া—বাবা আপনাকে যা বললেন।

অতীন—আমাকে বিয়ে করতে চান আপনি ?

বিজয়া—হ্যাঁ।

অতীন—হঠাৎ এরকম মন হলো কেন আপনার ?

বিজয়া—হঠাৎ আপনাকে ভালবেসেছি বলে।

অতীন—মিথ্যে কথা।

বিজয়া- একটুও মিথ্যে নয়।

অতীনের চোখের দৃষ্টী হঠাৎ কুৎসিত হয়ে ওঠে—সব মিথ্যে ; সব ঠাট্টা।

বিজয়া—এ সন্দেহ কেন করছেন ? আমার কথাগুলি বড় স্পষ্ট আর বড় নির্লজ্জ বলে ?

অতীন—আপনি ভালবাসবেন কেমন ক'রে। আপনার পক্ষে সেটা সম্ভব নয়, সেটা সম্ভব হবে কি ক'রে ?

বিজয়া শান্ত ও অবিচল স্বরে বলে—এসব কথা কেন বলছেন অতীনবাবু ?

অতীন—আমি জানি, আপনি পুরুষের ছায়া ছুঁতে ঘেন্না করেন। আপনি একটা বাচ্চা ছেলেকে কোলে তুলে নিতেও ঘেন্না করেন। আপনি দেবী হতে পারেন, মানবী নন। আপনি নিজেকে মেয়েমানুষ বলেই মনে করেন না। ভালবাসতে জানলে অনেক-দিন আগেই বিয়ে করতেন।

বিজয়া—আপনি ঠিকই বলেছেন অতীনবাবু। বিজয়া ডাক্তা-রের নামে যে-গল্প শুনেছেন, সে-গল্প একটুও মিথ্যে নয়। কিন্তু…।

অতীন—কি ?

বিজয়া—সে গল্প আজ আর একটুও সত্য নয়।

অতীন—কেন ?

বিজয়া—একদিন এক পুরুষমানুষের আশা নিজের হাতে নষ্ট ক'রে দেবার পর পাগল-পাগল হয়ে গেলাম, আর নিজের কাছেই ধরা পড়ে গেলাম।

অতীন—কি বললেন ?

বিজয়া—মনে-প্রাণে মেয়ে-মানুষ হয়ে যেতে ইচ্ছে হলো অতীনবাবু।

অতীন বিরক্ত হয়ে বলে—আপনি ডাক্তার, আপনি ফিজিও-লজির রোমান্স বোঝেন। আমাকে বৃথা ওসব বোঝাবার চেষ্টা করবেন না।

বিজয়ার ছু'চোখে যেন তুর্মর এক জেদের জ্বালা ঝকঝক করে—আপনাকে না বুঝিয়ে যে আমার উপায় নেই।

অতীন—কি বুঝবো ?

ডাক্তার বিজয়ার ছু'চোখের জেদের জ্বালা হঠাৎ গলে গিয়ে জল হয়ে যায়, আর ঝরঝর ক'রে ঝরে পড়ে।—আপনার ক্ষতি মিটিয়ে দিতে চাই।

চমকে ওঠে অতীনের বিস্ময়—কি বললেন ?

বিজয়া—সত্যিই কি বুঝতে পারছেন না ?

অতীন—না।

বিজয়া—আপনার আশার জিনিস আপনাকে পাইয়ে দিয়ে শান্তি পেতে চাই। জানি না, আমার এই অদ্ভুত জেদকে ভালবাসা বলে মেনে নেয় কিনা আপনাদের মনের বিজ্ঞান ; কিন্তু আমি যে বিশ্বাস করি······

অতীন—কি।

বিজয়া—আমি আপনাকে ভালবেসছি। জানি না, পৃথিবীতে এভাবে কেউ কাউকে ভালবেসেছে কিনা।

বিজয়া—অন্যায় কথা হলেও সত্যি কথা বলেছি অতীনবাবু।

অতীন—তার মানে ?

বিজয়া—আমার মন যা চায়, তাই বলেছি।

অতীন—কি চায় আপনার মন ?

বিজয়া—বাবা আপনাকে যা বললেন।

অতীন—আমাকে বিয়ে করতে চান আপনি ?

বিজয়া—হ্যাঁ।

অতীন—হঠাৎ এরকম মন হলো কেন আপনার ?

বিজয়া—হঠাৎ আপনাকে ভালবেসেছি বলে।

অতীন—মিথ্যে কথা।

বিজয়া—একটুও মিথ্যে নয়।

অতীনের চোখের দৃষ্টী হঠাৎ কুৎসিত হয়ে ওঠে—সব মিথ্যে ; সব ঠাট্টা।

বিজয়া—এ সন্দেহ কেন করছেন ? আমার কথাগুলি বড় স্পষ্ট আর বড় নির্লজ্জ বলে ?

অতীন—আপনি ভালবাসবেন কেমন ক'রে। আপনার পক্ষে সেটা সম্ভব নয়, সেটা সম্ভব হবে কি ক'রে ?

বিজয়া শান্ত ও অবিচল স্বরে বলে—এসব কথা কেন বলছেন অতীনবাবু ?

অতীন—আমি জানি, আপনি পুরুষের ছায়া ছুঁতে ঘেন্না করেন। আপনি একটা বাচ্চা ছেলেকে কোলে তুলে নিতেও ঘেন্না করেন। আপনি দেবী হতে পারেন, মানবী নন। আপনি নিজেকে মেয়েমানুষ বলেই মনে করেন না। ভালবাসতে জানলে অনেক-দিন আগেই বিয়ে করতেন।

বিজয়া—আপনি ঠিকই বলেছেন অতীনবাবু। বিজয়া ডাক্তা-রের নামে যে-গল্প শুনেছেন, সে-গল্প একটুও মিথ্যে নয়। কিন্তু…।

অতীন—কি ?

বিজয়া—সে গল্প আজ আর একটুও সত্য নয়।

অতীন—কেন ?

বিজয়া—একদিন এক পুরুষমানুষের আশা নিজের হাতে নষ্ট ক'রে দেবার পর পাগল-পাগল হয়ে গেলাম, আর নিজের কাছেই ধরা পড়ে গেলাম।

অতীন—কি বললেন ?

বিজয়া—মনে-প্রাণে মেয়ে-মানুষ হয়ে যেতে ইচ্ছে হলো অতীনবাবু।

অতীন বিরক্ত হয়ে বলে—আপনি ডাক্তার, আপনি ফিজিও-লজির রোমান্স বোঝেন। আমাকে বৃথা ওসব বোঝাবার চেষ্টা করবেন না।

বিজয়ার ছ'চোখে যেন দুর্মর এক জেদের জ্বালা ঝকঝক করে—আপনাকে না বুঝিয়ে যে আমার উপায় নেই।

অতীন—কি বুঝবো ?

ডাক্তার বিজয়ার ছ'চোখের জেদের জ্বালা হঠাৎ গলে গিয়ে জল হয়ে যায়, আর ঝরঝর ক'রে ঝরে পড়ে।—আপনার ক্ষতি মিটিয়ে দিতে চাই।

চমকে ওঠে অতীনের বিস্ময়—কি বললেন ?

বিজয়া—সত্যিই কি বুঝতে পারছেন না ?

অতীন—না।

বিজয়া—আপনার আশার জিনিস আপনাকে পাইয়ে দিয়ে শান্তি পেতে চাই। জানি না, আমার এই অদ্ভুত জেদকে ভালবাসা বলে মেনে নেয় কিনা আপনাদের মনের বিজ্ঞান; কিন্তু আমি যে বিশ্বাস করি......

অতীন—কি।

বিজয়া—আমি আপনাকে ভালবেসেছি। জানি না, পৃথিবীতে এভাবে কেউ কাউকে ভালবেসেছে কিনা।

স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকে অতীন। তারপরেই আস্তে আস্তে মাথা হেঁট করে। অতীনের হৃৎপিণ্ডটা যেন একটা যন্ত্রণার সঙ্গে লড়াই করতে করতে ক্লান্ত হয়ে আসছে। অতীন বিশ্বাসের শরীরের ভীরু রক্তমাংস যেন লজ্জার জ্বালায় পুড়ে পুড়ে অঙ্গার হয়ে যাচ্ছে। ভুল করেছে বিজয়া, ভয়ানক ভুল; নিতান্ত দু'চোখের একটা মায়ার আবেশে মুগ্ধ হয়ে অতীন বিশ্বাস নামে পুরুষের একটা ছবিকে সত্যিই জ্যান্ত পুরুষ বলে মনে ক'রে ফেলেছে। অতীনের জীবনের অভিশাপের খবর রাখে না বিজয়া, তাই অনর্থক পাগল-পাগল হয়ে ভালবেসে···।

চেঁচিয়ে ওঠে অতীন—অসম্ভব। আমাকে মাপ করবে বিজয়া।

বিজয়ার বেদনাহত মুখটা আবার যেন পাগল-পাগল হয়ে ওঠে।—সত্যিই কি আমাকে একটুও বিশ্বাস করলে না অতীন?

অতীন—তোমাকেই বিশ্বাস করছি বিজয়া। নিজকে বিশ্বাস করছি না, তাই মাপ চাইছি।

বিজয়া– বুঝলাম না অতীন।

পকেট থেকে রুমাল বের ক'রে চোখ দু'টো ঘষে নিয়ে অতীন বলে—তুমি আমাকে ভালবেসেছ, কেন ভালবেসেছ, সবই বুঝেছি আর বিশ্বাস করেছি বিজয়া। তোমাকে ভালবাসতে ইচ্ছা করে, একথাও জোর ক'রে বলতে পারি। কিন্তু ··তবু অসম্ভব বিজয়া। বিয়ে হতে পারে না।

বিজয়া—কেন?

অতীনের সুন্দর মুখের সব আভা একমুহূর্তে নিভে গিয়ে যেন কালি হয়ে যায়।—কাজরী আমার নামে আদালতে যে অভিযোগ এনেছে, সেটা কি তুমি ভুলেই গেলে?

বিজয়া—মিথ্যে অভিযোগ! একটা অপবাদ। একটা ছুতো।

অতীন—না। মিথ্যে নয়।

বিজয়া—নিশ্চয় মিথ্যে। একশো বার মিথ্যে। একেবারে নিরেট মিথ্যে।

যেন হঠাৎ একটা পাগল-পাগল ঝড়ের ঝাপটা লেগে বিজয়ার শরীরটা অতীনের বুকের উপর এসে লুটিয়ে পড়ে। ফুঁপিয়ে ওঠে বিজয়ার সিল্কের শাড়ির সাদা। কিন্তু অতীন বিশ্বাসের শরীরটা তবু যেন সেই ভীরুতায় আড়ষ্ট হয়ে আর নিঃস্পন্দ হয়ে থাকে। কথা বলতে গিয়ে অতীনের গলার স্বর কাতর হয়ে কেঁপে ওঠে—ছিঃ বিজয়া! তুমি কেন অনর্থক···কিসের আশায়···।

বিজয়া—তোমার ছেলেকে ভালবেসে বাঁচিয়ে রাখবো, এই আশায় ···। দু'হাতে শক্ত ক'রে অতীনের গলা জড়িয়ে ধরে অতীনের মুখের উপর মুখ নামিয়ে দেয় বিজয়া।

হঠাৎ ঢেউ তুলে একটা উত্তাপময় মুগ্ধতার জোয়ার ছুটে এসে অতীন বিশ্বাসের হৃৎপিণ্ডের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। কি আশ্চর্য, অতীনের ভীরু বুকের হিমাক্ত গর্ব যেন তরল আগুনের মত উথলে উঠছে। বিজয়া নামে এই নারীর প্রাণটাকে বুকের উপর বরণ ক'রে নেবার জন্য অতীনের হাত দুটো মত্ত হয়ে ওঠে।

সারা ঘর যেন কিছুক্ষণের একটা মূর্ছামর আবেশে নীরব হয়ে থাকে।

অতীনের কানের কাছে নিঃশ্বাসের বাতাস ভাসিয়ে দিয়ে আস্তে আস্তে কথা বলে বিজয়া—আর মিথ্যে কথা বলবার সাধ্যি নেই তোমার।

অতীন—না, সাধ্যি নেই বিজয়া।

পৌষ গেল, মাঘও যে যায় যায়। চন্দননগরের গঙ্গার বুকে আর কাদাটে জলের ঢেউ দোলে না। ঝকঝক করে পরিষ্কার শান্ত আর ঠাণ্ডা জল। কিন্তু কাজরীর মনের একটা উদ্বেগ আজও

শান্ত হতে পারেনি। দিনের মধ্যে অনেকবার এবং বিশেষ ক'রে সন্ধ্যাবেলায় মনের ভিতরে একটা অস্বস্তির জ্বালা ছটফট ক'রে ওঠে। আর কতদিন ? আদালত মুখ খুলবে কবে ?

চাকরির জীবন যেমন চলছিল, তেমনই চলছে। অসিত দত্তের নতুন গাড়িটা কাজরীকে চন্দননগরের এই বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে কয়লাঘাটের জাহাজ-অফিসে পৌঁছে দিতে, এবং আবার ফিরিয়ে দিয়ে যেতে কোনদিন ভুলে যায় না। অসিতের এই নতুন গাড়ির ড্রাইভারও খুব ভদ্র। রোজই তিনবার সেলাম জানিয়ে বলে, আপনার কোন তকলিফ হলো না তো মেমসাব ?

কাজরীও হেসে ড্রাইভারের ভদ্রতার উত্তরে ভদ্রতা করে—না, একটুও না।

ড্রাইভার বলে—আমার উপর সাহেবের হুকুম আছে, আপনি যেখানে বেড়াতে যেতে চান সেখানেই আপনাকে নিয়ে যেতে হবে।

কাজরী—না, আজ আর দরকার নেই। দরকার হলে বলবো।

কাজরীদের চন্দননগরের এই বাড়ির ঠিক পিছনের রাস্তার বাঁকের কাছে একটা ল্যাম্পপোস্ট আছে, যেটার মাথাটা ভাঙ্গা, আলো জ্বলে না, জ্বালানো সম্ভবও নয়। এরকম একটা ল্যাম্প-পোস্ট রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে থেকে শুধু রাতের অন্ধকারকেই সাহায্য করে। এটা রাস্তারই একটা বাধা। ওটা সরে গেলেই রাস্তার জীবনটা যেন হালকা হয়, মুক্তিও পায়। তা ছাড়া, ওটা সরে না যাওয়া পর্যন্ত ঐ জায়গাতে একটা নতুন ল্যাম্পপোস্ট কেমন ক'রেই বা দাঁড় করায় মিউনিসিপ্যালিটি ? একটা মাথাভাঙ্গা অপদার্থ পোস্টের পাশেই একটা ঝকঝকে নতুন পোস্ট ; কোন মানে হয় না, দেখতেও কি কুৎসিত !

কয়লাঘাটের জাহাজ অফিসের এঘরে আর ওঘরে কাজরীর

নামে যে সব আলোচনা ফিসফাস করে, তার শব্দ কাজরীর কানে কিছু কিছু পৌঁছেও যায়। কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইতরতা কাজরীর অকপট জীবনের ইচ্ছাটাকে শ্রদ্ধা করতে পারছে না, শ্রদ্ধা করবার শক্তিও ওদের নেই। কিন্তু একদিন লিফটের অপেক্ষায় দু'মিনিট চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকতে গিয়ে ক্যান্টিনের একটা উচ্চকিত তর্কের ভাষা নিজের কানেই শুনতে পেয়েছে কাজরী। সে ভাষা অভিনন্দনের ভাষা। কে যেন বেশ জোর গলায় চেঁচিয়ে উঠেছে—যাই হোক, অঞ্জনা সরকারের ন্যাকামির চেয়ে কাজরী বিশ্বাসের এই সৎসাহস ঢের ঢের ভাল।

ভালই হয়েছে; আদালতে দরখাস্ত করা একটুও ভুল হয়নি। স্বামীর সঙ্গে সত্যি ক'রে কোন সম্পর্ক নেই, স্বামীর কাছ থেকে দূরে সরে গিয়ে ভিন্ন হয়ে থাকতে হয়; তবু, শুধু একদিন আইনমত বিয়ে হয়েছিল বলেই একটা অকেজো বন্ধনের গিঁট রেখে দিয়ে সিঁথিতে সিঁদুর নিয়ে ঘুরে বেড়াতে হবে, কয়লাঘাটের জাহাজ অফিসের অঞ্জনা সরকার এরকম অদ্ভুত জীবন সহ্য করতে পারলেও কাজরীর পক্ষে সহ্য করা সম্ভব নয়। এমন কপটতার দরকার কি?

অসিত জীমূত আর গাঙ্গুলী আসে মাঝে মাঝে। কয়েকটা রবিবারের সকাল বেলায় এই বারান্দাতেই বসে ওরা চা খেয়ে গিয়েছে। ওরাও বেশ বিরক্ত হয়ে উঠেছে। অনর্থক দেরি করছে আদলত। ওরা খোঁজখবর করছে, চেষ্টাও করছে, যাতে আদালতের রায় একটু তাড়াতাড়ি বের হয়।

কম দিন তো নয়; দু'মাসেরও বেশি সময় পার হয়ে গেল। ওরা তিনজন যখন এসে গল্প করে, শুধু তখন, মাত্র দু'তিন ঘণ্টার জন্য কাজরীর জীবনটা সেই প্রশস্তির কলগুঞ্জন নতুন ক'রে শুনতে পায় আর আশ্বস্ত হয়। কিন্তু তারপর? বিশেষ ক'রে সন্ধ্যা হবার পর এই বারান্দায় যখন চেয়ারের উপর একেবারে একলা

হয়ে বসে থাকতে হয়, তখন কাজরীর মনের ভিতরটা যেন কামড়াতে থাকে, সেই সঙ্গে শরীরটাও। যেন একটা শূন্যতা গায়ে জড়িয়ে এখনও বসে থাকতে হচ্ছে। উপোস ক'রে ক'রে মরে যাচ্ছে কাজরীর জীবনের সান্ধ্য নিঃশ্বাসের আশা। কাজরীর প্রাণময় অস্তিত্বের রক্তকণাগুলি যেন অনাদরের বেদনায় ছটফট করে, অভিমান করে।

রোজ যেমন, সেদিনও তেমনি, সন্ধ্যা হতেই বারান্দার উপর একলাটি হয়ে চেয়ারের উপর বসে সেই কথা ভাবতে গিয়ে কাজরীর মনটা বিরক্ত হয়ে ছটফট করতে থাকে। কবে মুখ খুলবে আদালত?

চন্দননগরের সন্ধ্যা শীতের বাতাসে সিরসির করে। কিন্তু টকটকে লাল ফ্ল্যানেলের ওভারকোট আর বেশিক্ষণ গায়ে রাখতে ইচ্ছা করে না কাজরীর। কপালটা একটু ঘেমে উঠেছে। টকটকে লাল ফ্ল্যানেলের চেয়ে মনের উদ্বেগটাকেই বেশি গরম মনে হয়।

তারপরেই পর-পর তিনবার টেলিফোনের আহ্বানে সাড়া দেবার জন্য কাজরীকে পর-পর তিনবার ব্যস্ত হয়ে উঠতে হয়। বারান্দার চেয়ার ছেড়ে ঘরের ভিতরে ছুটে যেতে হয়। দশ মিনিট পর পর তিনটে ডাক। তিন জনের ডাক। সেই আহ্বানে কান পাততে গিয়ে কাজরীর দু'চোখের আলো নতুন হয়ে চমকে ওঠে। কথা বলতে গিয়ে মুখটাও নতুন হাসি হেসে ওঠে। আর মনের ভিতর থেকে সব উদ্বেগের ভার নেমে যায়।

প্রথম ফোন এল অসিতের কাছ থেকে। দ্বিতীয় ফোন জীমূতের তৃতীয় ফোন গাঙ্গুলীর। কনগ্র্যাচুলেশন! অভিনন্দন। আজই আদালত রায় দিয়েছে। এই মাত্র আধঘণ্টা হলো, টেলিফোন ক'রে খবরটা জানিয়েছে সত্যকিংকর।

কাজরীর কানের কাছে প্রথম টেলিফোনের আহ্বানে অসিত দত্তের গলার স্বরের একটা উচ্ছ্বাস হেসে ওঠে। কাল একটা মুক্তিদিবস সেলিব্রেট করতে চাই মিস কাজরী চৌধুরী।

কাজরীও টেলিফোনের উপর মুক্ত ঝরণার মত একটা কলকল স্বরের হাসি লুটিয়ে দিয়ে বলে—মুক্তিদিবসই বটে। কথাটা নেহাৎ মিথ্যে নয় অসিত বাবু। আপনারও মনের উপর এতদিন ধরে যে উদ্বেগ…।

অসিত—উদ্বেগ বললে কম বলা হয়। বললে বিশ্বাস করবেন কি-না জানি না, আমি এতদিন দস্তুরমত একটা আতঙ্কে কষ্ট পেয়েছি।

কাজরী—যাই হোক, মুক্তিদিবস সেলিব্রেট করুন বা নাই করুন ··।

অসিত—না না, ওকথা বলবেন না। মুক্তিদিবস সেলিব্রেট করবোই, আপনি কথাটাকে ওভাবে তুচ্ছ করবেন না।

কাজরী—বেশ তো, কাল না হয় মুক্তিদিবস করবেন, কিন্তু আজ··· ।

অসিত—বলুন।

কাজরী—আজ কি একবার দেখা হতে পারে না ?

অসিত দুঃখিতভাবে বলে—আজ এখনই যে অত্যন্ত জরুরি কাজের ঝঞ্ঝাট আছে। আমাকে একবার আসানসোল যেতে হবে।

কাজরীও দুঃখিতভাবে বলে—তা'হলে ?

অসিত—আপনার কি বিশেষ কোন দরকারের কথা আছে ?

কাজরী—হ্যাঁ, অসিতবাবু।

অসিত—কাল সকালে যদি যাই ?

কাজরী—বেশ কাল সকালে ঠিক আটটার সময়। মাত্র আধঘণ্টার জন্য, ন'টার আগেই আপনাকে ছেড়ে দেব। আপনার আর এক মিনিটও সময় নষ্ট করবো না।

অসিত—বেশ।

কাজরী—নিশ্চয় তো ?

অসিত—নিশ্চয়।

জীমূতের টেলিফোনের ডাকে সাড়া দিতে গিয়ে কাজরীই আগে খিল খিল ক'রে হেসে ওঠে।—জানি, আপনি কি বলতে চান ?

জীমূত—তা হ'লে এরই মধ্যে শুনে ফেলেছেন ?

কাজরী—হ্যাঁ, অসিতবাবু এই তো মাত্র দশ মিনিট আগে ফোন ক'রে জানিয়েছেন।

জীমূত—আমার মনটা এতদিনে একটা শাস্তির জ্বালা থেকে মুক্তি পেল।

কাজরী—বাস্তবিক, জ্বালাই বটে।

জীমূত হাসে—সুতরাং, কাল একটা মুক্তিদিবস সেলিব্রেট ক'রে শান্তি পেতে চাই।

কাজরী হাসে—বেশ তো ; কিন্তু তার আগে যে একবার দেখা হওয়া উচিত ছিল।

জীমূত—বলুন, কখন দেখা করবো ?

কাজরী—আজ বোধ হয় এতদূর আসতে আপনার অসুবিধা আছে।

জীমূত—হ্যাঁ, মিস চৌধুরী।

কাজরী—কাল সকাল ন'টায় আসুন।

জীমূত—বেশ।

কাজরী হাসে—ন'টার আগে নয়, আর দশটার পরেও নয়।

জীমূত—বেশ বেশ। তাই হবে।

গাঙ্গুলীর টেলিফোনের ডাক শুনে কাজরীই আগে চেঁচিয়ে হেসে ওঠে।—মুক্তিদিবস সেলিব্রেট করবার ব্যবস্থা করুন।

গাঙ্গুলী—অ্যাঁ ? সুখবর পেয়ে গিয়েছেন তাহ'লে ?

কাজরী—হ্যাঁ।

গাঙ্গুলী—কিন্তু সত্যিই মুক্তিদিবস সেলিব্রেট করবো ; কথাটা

অবিশ্বাস করবেন না। এরই মধ্যে অসিত আর জীমূতের সঙ্গে টেলিফোনে একটা পরামর্শও করেছি, প্ল্যানও ক'রে ফেলেছি।

কাজরী—বেশ; সে ব্যাপার তো কাল সন্ধ্যার আগে আর হচ্ছে না?

গাঙ্গুলী হাসে—না, সন্ধ্যার আগে হ'লে বিরস ব্যাপার হয়ে যাবে।

কাজরী—তার আগে আপনার কাছে যে বিশেষ একটা কথা ছিল।

গাঙ্গুলী—বলুন।

কাজরী—কাল সকাল দশটার সময় এখানে একবার আসতে পারবেন কি?

গাঙ্গুলী—খুব পারবো।

কাজরী—তা হ'লে অবশ্যই আসবেন। হ্যাঁ, দশটার পরেই আসবেন। কেমন?

গাঙ্গুলী—তথাস্তু।

ঘন নীল ফ্ল্যানেল গায়ে জড়িয়ে বারান্দার চেয়ারের উপর চুপ ক'রে বসে থাকে কাজরী। শীতের সন্ধ্যার বাতাস কাজরীর কপালের উপর সিরসির করে। কাজরী চৌধুরীর দুই চোখের শাণিত হাসিটাও সন্ধ্যার আলোতে ঝিকঝিক করে।

আর কি? মনে পড়তেই কাজরী চৌধুরী দু'চোখে একটা স্বপ্নময় আবেশ নিবিড় হয়ে ওঠে। আর মুখটাও হেসে ওঠে। আজকের এই রাতটুকু পার হয়ে যাবে, আর দিনটা কাজরীর জীবনের একটা নতুন দিন হয়ে হেসে উঠবে। কাজরীর প্রাণ যেন এখনই আগামী কালের আহ্বানের ভাষা আর শব্দ শুনতে পেয়ে একটা লাজুক বিস্ময়ের উৎপাত চুপ ক'রে সহ্য করতে থাকে। খুবই সত্যি কথা, অস্বীকার করে না কাজরী, কালকের দিনটাই কাজরীর জীবনের মুক্তিদিবস।

কাজরী আজ ইচ্ছে ক'রে ওদের তিনজনের জন্যই শুভ সুযোগের লগ্ন ভাগ ক'রে দিয়েছে। কাজরীর কাছে একলা বসে মনের কথা বলবার সুযোগ। ওরাও কি না বলে আর থাকতে পারবে ?

অসিত আসবে সবার আগে। মনে হয়, অসিতেরই হাতে হাত সঁপে দিতে হবে। তারপর আর……জীমূত আর গাঙ্গুলীর মনের কথা শোনবার দরকারও হবে না। বরং ওরাই দু'জনে অসিত আর কাজরীর বিয়েব ইচ্ছার ঘোষণা শুনতে পেয়ে খুশি হয়ে, আর, আরও এক কাপ চা বেশি খেয়ে চলে যাবে।

—আজ তো আর কোন বাধা নেই কাজরী। এবার আমার চিরকালের আপন হয়ে যেতে তোমার কোন আপত্তি করা উচিত নয়। আমি যে তোমার স্বামী হবার সৌভাগ্য এতদিন নীরবে কামনা করেছি।

ধড়ফড় ক'রে নড়ে বসে কাজরী। রুমাল তুলে চোখ মুছে একটা স্বপ্নালু কল্পনার আবেশ মুছতে থাকে। কি আশ্চর্য, অসিতের গলার স্বরটা স্পষ্ট শোনা গেল !

জীবনের শুভদিনে যেমন ক'রে সাজা উচিত ঠিক তেমন করে সেজেছে কাজরী। কিন্তু স্বীকার করতে হয়, জীবনের কোন শুভদিনে এবং এর চেয়েও বেশি সুন্দর সাজে কাজরীর মুখটাকে এত বেশি সুন্দর দেখায়নি। টকটকে লাল ফ্ল্যানেলের ওভারকোট কাজরীর কাঁধের উপর আলগা হয়ে পড়ে রয়েছে ; সন্দেহ হতে পারে, কাজরীর মুখের রক্তিমতা বোধহয় ঐ টকটকে লাল ফ্ল্যানেলের প্রতিচ্ছায়া। কিন্তু না, ভুল সন্দেহ। গাড়ির হর্ণের শব্দ শুনতে পেয়েই ব্যস্ত হয়ে কাঁধের উপর আলগা হয়ে পড়ে থাকা টকটকে লাল ফ্ল্যানেলের ওভারকোট চেয়ারের কাঁধের উপর

ফেলে রেখে দিয়ে যখন ঘরের দরজার কাছে এগিয়ে যায় কাজরী, তখন কাজী চৌধুরীর মুখটা যেন তপ্ত হয়ে আরও নিবিড় রক্তিমতায় গনগন করে।

কিন্তু কাজরী চৌধুরীর কল্পনাও যেন হঠাৎ আহত হয়, আর সারা মুখে একটা সাদাটে বিস্ময়ের প্রলেপ ছড়িয়ে পড়ে। মুখের হাসিটাও একটু ফিকে হয়ে যায়।

ওরা তিনজনেই এসেছে। অসিত, জীমূত আর গাঙ্গুলী।

একই গাড়িতে এই সকাল আটটার প্রথম মুহূর্তে কাজরী চৌধুরীর বাড়ির ফটকের কাছে ওরা একই সঙ্গে দেখা দেবে, এরকম কথা ছিল না। কাজরী চৌধুরী টেলিফোনের অনুরোধের ভাষা কি স্পষ্ট ক'রে শুনতে পায়নি, কিংবা শুনেও স্পষ্ট ক'রে কিছু বুঝতে পারেনি ওরা? আজকের দিনেও কাজরী চৌধুরীর কাছে একটা ক্লাব হয়ে আসবার সময় ওদের মনে কি এই ছোট্ট খটকাও লাগেনি যে, না, এভাবে এলে ওরাই আজ মনের কথা মন খুলে বলবার সুযোগ পাবে না?

কিন্তু ওদের মুখের অবাধ হাসির উচ্ছ্বাস শুনে মনে হয়, ওরা এখনও বুঝতেই পারেনি যে, ওরা সত্যিই কোন ভুল করে ফেলেছে। যেন সাদা মনে কাদা নেই, রং-ও নেই; নিতান্ত একটা সাধারণ কৌতূহলের টানে, কাজরী চৌধুরীর বাড়ির মিষ্টি চা-এর স্বাদ নিয়ে সকালবেলার পিপাসাকে একটু মিষ্টি তৃপ্তি দেবার জন্য ওরা চলে এসেছে।

সত্যিই কি তাই? প্রশ্নটা কাজরীর মনের মধ্যে ছোট একটা ভাবনার ঘোর ঘটিয়ে তুলতো ঠিকই, যদি সেই মুহূর্তে ওরা তিন-জনে একই আগ্রহের সুরে একই প্রশ্ন না ক'রে উঠতো।—কি ব্যাপার বলুন তো? কি কথা বলতে চান আপনি? আমরা তো ভেবে একটু উদ্বেগই বোধ করেছি, কিন্তু ঠিক বুঝতে পারছি না, আজ আর আপনার চিন্তা করবার কি থাকতে পারে?

কাজরীরও আর বুঝতে অসুবিধার কিছু নেই। বিস্মিত হলেও বেশ ভাল ক'রে বুঝতে পারে কাজরী, ওরা আজ কাজরী চৌধুরীরই মনের কথা শোনবার আশা আর আশংকা নিয়ে ব্যস্তভাবে ছুটে এসেছে। ওরা কাজরী চৌধুরীর জীবনের বক্তব্য শুনবে বলে তৈরী হয়েছে, কাজরীর কাছে ওদের কারও মনের গভীরে কোন বিশেষ আশার বক্তব্য নেই।

কাজরী চৌধুরীর নিঃশ্বাসের আশা যেন হঠাৎ লজ্জা পেয়ে এলোমেলো হয়ে যায়। উৎসবের রঙীন ফানুসটা হঠাৎ যেন একটা খোঁচা লেগে চুপসে গেল। ওরা কি তবে সত্যিই কাজরী চৌধুরীর পার্সোনালিটিকে একটু করুণা করবার জন্য ছুটে এসেছে?

ব্যস্তভাবে ঘরের ভিতরে ঢুকে চা-এর টেবিল ঘিরে যখন বসে পড়ে সবাই, তখন আটটা বেজে এক মিনিট। চন্দননগরের গঙ্গার সাদা জল পুব আকাশের আভায় লাল হয়ে উঠেছে। অসিত বলে—টেলিফোনে আপনার কথার মধ্যে একটা···যাকে বলে ·· অর্থাৎ একটা বিষণ্ণ সুর শুনতে পেয়েই সন্দেহ হলো, আপনি বোধহয় আবার একটা চিন্তার সমস্যায় পড়েছেন।

জীমূত—আমারও তাই মনে হলো।

গাঙ্গুলী—সেই জন্যই তো আমরা তিন জনে শেষে একমত হয়ে ঠিক করলাম, তিনজনে একসঙ্গেই এসে আপনার বক্তব্য শুনবো।

অসিত—কারণ ·····।

জীমূত—কারণ, আমরা তিনজনে মিলে একমত হয়ে আপনাকে যে পরামর্শ দিতে পারবো, সেটাই ঠিক পরামর্শ হবে বলে আমার বিশ্বাস।

হেসে ফেলে কাজরী।—টেলিফোনে এত চেঁচিয়ে হাসলাম, তবু বিষন্ন সুর শুনতে পেলেন?

অসিত খুশি হয়ে বলে—তাই বলুন।

জীমূত—তাহলে আমাদেরই বুঝতে ভুল হয়েছে।

গাঙ্গুলী চেঁচিয়ে হেসে ওঠে।—তাহলে বলুন, আপনার কিছু বলবার নেই, শুধু এটুকু বলবার জন্যই আমাদের ডেকেছেন।

কাজরীর হাসিটাও কলকল ক'রে বেজে ওঠে।—তা ছাড়া আর কি?

কাজরী চৌধুরীর বাড়ির সকাল বেলার জীবনটা আজকের দিনেও সুন্দর একটি চা-এর আসর হয়ে গল্প করে। চা-এর কাপে একটা চুমুক দিয়েই অসিত একটা হাঁপ ছেড়ে বলে।—বন্ধন হলো বন্ধন। সুখের বন্ধন বলে কোন বস্তু সত্যিই সম্ভব নয়। বন্ধনের সুখ বললে তেমনিই একটা অর্থহীন হেঁয়ালির কথা বলা হয়। নয় কি?

কাজরী—আমাকে জিজ্ঞাসা করছেন?

অসিত—না, বিশেষ ক'রে কাউকেই জিজ্ঞাসা করছি না। আমাদের সবাইকে, আর নিজেকেও এই প্রশ্ন করছি।

জীমূত—এই সোজা সরল সত্যটুকু কোন প্রশ্ন ক'রে বোঝাবার দরকার হয় না। বন্ধন সব সময়েই বন্ধন। সেটা বিয়ে হোক, বা যে-কোন ই'য়ে হোক।

গাঙ্গুলী—আমি তো মনে করি, বিয়ের চেয়ে বেশি নিষ্ঠুর শাসন আর কমপাল্‌শন মানুষের জীবনে আর কিছু হতে পারে না। মানুষের পার্সোনালিটিকে পদে পদে বাধা দেয়; ছোট হয়ে থাকতে বাধ্য করে।

জীমূত—খুব সত্যি কথা। মেয়ে হোক বা পুরুষ হোক, প্রত্যেক জিনিয়াসের বিবাহিত জীবন অসুখী জীবন হতে বাধ্য হয়েছে।

গাঙ্গুলী—জিনিয়াস কখনও বিয়ে সহ্য করতে পারে না; আর বিয়েও জিনিয়াস সহ্য করতে পারে না।

অসিত—ঋষিরা বলেন, বিয়ে একটা ব্রত। মডার্নিস্টরা বলেন, বিয়ে একটা কনট্রাক্ট। আমি তো দেখতে পাই, ওটা একটা দাসত্ব।

জীমূত—একটা ড্রাজারি ; মানুষের স্পিরিটকে পোকার মত কুরে কুরে খায়।

অসিত—তবে হ্যাঁ, একটা কথা। বিয়েকে যারা একটা আদর্শ বন্ধুত্ব বলে মনে করে, তাদের অভিমত একেবারে যুক্তিহীন বলে মনে করতে আমারও বাধে।

জীমূত—তার মানেই তো এই যে, নারী ও পুরুষের একটা আদর্শ বন্ধুত্বকেই বিয়ে বলে মনে করা যায়।

গাঙ্গুলী—কোন সন্দেহ নেই। তাতে ঋষিরা যতই রাগ করুন, আর আইন যতই ভ্রুকুটি করুন ; কিন্তু মানুষের জীবনদেবতা যে তাই চান।

চা-এর কাপে শেষ চুমুক দিয়ে অসিত তার নিজেরই জীবনের, তার নিজেরই একটা নিতান্ত ব্যক্তিগত প্রতিজ্ঞার কথা একেবারে সঙ্কোচহীন মুখরতার আবেগে হঠাৎ বলে ওঠে।—আমি আজও বিয়ে করতে পারলাম না বলে আত্মীয়েরা আমার অনেক নিন্দে করে ; কিন্তু আমি কারও নিন্দের ভয়ে বিচলিত হবার মানুষ নই! বিয়ে সম্বন্ধে আমার এই, যাকে বলে, এই ফিলসফিক ঘৃণাকেই আমি ভালবাসি।

জীমূত মুখ টিপে হেসে ঠাট্টা করে।—আঙ্গুর বড় টক ব্যাপার নয় তো?

অসিত—তার মানে?

গাঙ্গুলী-নারীর মত নারীর সাক্ষাৎ পেলে বোধ হয় মত বদলাতে হতো।

অসিত—নারীর মত নারীর অর্থ কি?

জীমূত—যদি বলি, আমাদের সম্মুখে যাঁকে দেখছি, এই কাজরী চৌধুরীর মত নারী।

অসিত—কাজরী চৌধুরীর মত কেন, স্বয়ং কাজরী চৌধুরী হলেও অসিত দত্ত বিয়ে করতে রাজি হবে না।

গাঙ্গুলী—কাজরী চৌধুরীই বিয়ে করবে না।

অসিত সেটা আমি বিশ্বাস করি। ওঁর মত মানুষের পক্ষে ফ্রী লাইফ হলো বেস্ট লাইফ। কারও স্ত্রী হওয়া ওঁর মত মানুষের পক্ষে সাজে না।

জীমূত—তা ছাড়া, উনি জীবনে যে কঠোর শিক্ষা পেয়ে গিয়েছেন, তার পর আর ওঁর পক্ষে বিবাহ নামক ভুলটির দিকে এগিয়ে যাওয়াও অসাধ্য।

গাঙ্গুলী—খুব সত্যি কথা।

অসিত—সুখের বিষয়, আমরা যে ভুলের বিপদ থেকে মুক্ত আছি, উনিও আজ সেই ভুল থেকে মুক্ত হয়ে গিয়েছেন।…এ কি আপনার চা যে জুড়িয়ে জল হয়ে গিয়েছে; এক চুমুকও খাননি মনে হচ্ছে।

চমকে ওঠে কাজরী, তারপর হেসে ফেলে—হ্যাঁ, তাই তো দেখছি। আপনাদের কথা শুনে মুগ্ধ হয়ে যাবার শাস্তি।

অসিত—কথাগুলি অকপটভাবে বলেছি, কিন্তু একটুও মিথ্যে বলেছি কি?

আনমনার মত তাকিয়ে ঠাণ্ডা চায়েই চুমুক দিয়ে ক্লান্তভাবে একটা অলস হাসি হাসে কাজরী—না, ঠিক কথাই বলেছেন।

অসিত—শুনতে খারাপ লেগেছে আপনার?

কাজরী ছটফট ক'রে হেসে চেয়ার চেড়ে উঠে দাঁড়ায়—একটুও না।

তিনজনেই হাতঘড়ির দিকে তাকায় আর ব্যস্ত হয়ে ওঠে। অসিত বলে—এখন বের হতে হয়। আজ আবার ব্যাঙ্কের হিসেব নিয়ে অনেক বোঝাপড়ার ব্যাপার আছে।

জীমূত আর গাঙ্গুলী বলে—হ্যাঁ, এবার উঠতে হয়।

চা-এর আসর ভাঙ্গে। এবং আর এক মিনিট পরেই অসিত দত্তের গাড়ি চন্দননগরের সকাল বেলার বতাসে একটা চকিত হর্ষের শিহর তুলে চলে যায়।

সেই শিহর সকাল বেলার বাতাসের বুক থেকে সরে গেলেও কাজরী চৌধুরীর বুকের ভিতরে যেন রিমঝিম ক'রে বাজতেই থাকে। বারান্দার উপরে অনেক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে কাজরী। তার পর ঘরের ভিতরে ঢুকে সোফার উপর এলিয়ে পড়ে। একটা নতুন মুগ্ধতার আবেশ, না অবসাদ! ভাবতে গিয়ে ভাবনাগুলিই যেন এলোমেলো হয়ে যায়।

তবু সেই শিহরটা রিমঝিম ক'রে বেজে বেজে, আর নিঃশ্বাসের যত অসার ভয় ভেঙ্গে ভেঙ্গে কাজরী চৌধুরীর প্রাণটাকে যেন এক অবাধ হর্ষের সঙ্গীতে শুনিয়ে দিচ্ছে! মন্দ কি? ওদের কথাগুলিকে একটা ভয়ানক ফিলসফির খেয়াল বলে সন্দেহ ক'রে লাভ কি? ওরা কি সুখী নয়? কাজরী চৌধুরীও কেন সুখী হতে পারবে না?

অনেকক্ষণ বই পড়ে তারপর অনেকক্ষণ ধরে ঘুমিয়ে আবার যখন ধড়ফড় করে জেগে চোখ মেলে শীতের বিকালের রোদের দিকে তাকায় কাজরী, তখন মনে হয়, না ঘুম নয়, যেন একটা মূর্চ্ছার মধ্যে শরীরটা এতক্ষণ অসাড় হয়ে পড়েছিল। কাজরীর চোখ দুটোও যেন নেশাভাঙ্গা বেদনায় লাল হয়ে দপদপ করছে। এই মূর্চ্ছা এখনই ভাঙ্গতো না, যদি মাথাটা একটা প্রচণ্ড রাগের জ্বালায় জ্বলে না উঠতো। রাগটার দাউ দাউ শব্দ যেন কানে শুনতে পাচ্ছে কাজরী। পৃথিবীর একজনের উপর রাগ।

আজ এখন কোথায় আছে সেই লোকটা? আজও কি চলে যায় নি? আজকের খবরের কাগজে এত স্পষ্ট ক'রে ছাপানো সংবাদটা চোখে দেখেও অতীন বিশ্বাস কি এখনও ক্যামাক ষ্ট্রীটের নতুন বাড়ির ফ্ল্যাটের একটা ঘরের ভিতর বসে আশা করছে যে, কাজরী আবার ফিরে এসে ওকে ক্ষমা করে দেবে? কি নির্লজ্জ আশা?

তাড়াতাড়ি সাজ সারে কাজরী। আর, যেন একটা আক্রোশের

ঝোঁকে ছুটে এসে টেলিফোনের রিসিভার তুলে সিন্‌হা সাহেবের মেয়েকে ডাকে।—আমি কাজরী; আমার বাসার খবর কি মালতী?

সিন্‌হা সাহেবের মেয়ে বলে—আমি তো কিছু বলতে পারছি না। আপনার চাকর ভাগবতকে ডেকে দিচ্ছি।

ভাগবতের সাড়া শুনতে পেয়েই অদ্ভুত স্বরে চেঁচিয়ে ওঠে কাজরী—তোমার বাবুর খবর কি?

—ভাল আছেন।

—কোথায় আছেন?

—ঘরে। এখনি ফিরলেন।

—কোথায় গিয়েছিলেন?

—তা জানি না।

—কখন বের হয়েছিলেন?

—সকাল বেলা।

—ঘরে আর কেউ আছে?

—না।

—আচ্ছা, যাও।

টেলিফোনের রিসিভার নামিয়ে রেখে দেয়ালের ঘড়ির দিকে তাকায় কাজরী। তারপরই চেঁচিয়ে ডাক দেয়—হরিদাস।

-- আজ্ঞে?

—একটা ট্যাক্সি ডেকে নিয়ে এস। এখনই কলকাতায় যেতে হবে।

জারুল গাছের মাথা থেকে শীতের বিকালের শেষ রোদের মূমূর্ষু আভা ঝরে পড়ে গিয়েছে, আর সবেমাত্র সন্ধ্যার ফিকে অন্ধকারে আবছায়াময় ক্যামাক ষ্ট্রীটের চেহারাও একটু কালো-কালো হয়ে উঠেছে।

কাজরীর ট্যাক্সি ছুটে এসে ক্যামাক ষ্ট্রীটের যে বাড়ির যে ফটকের কাছে শব্দ বন্ধ ক'রে থেমে যায় ; সে বাড়ির সেই ফটকের কাছে থমকে দাঁড়িয়ে থাকা একটা গাড়ি শব্দ ক'রে স্টার্ট নিয়ে চলতে শুরু করে।

—বিজয়া ! চেঁচিয়ে ডাক দেয় কাজরী। চিনতে ভুল করেনি কাজরী, ঐ গাড়িটা বিজয়ারই সেই ধবধবে সাদা বডির গাড়িটা, যার ড্রাইভার হলো চাকর ভাগবতের কাকা দুর্গাপদ।

সাদা গাড়িটা থামে। কাজরীও ট্যাক্সি থেকে নামে। চলে যায় ট্যাক্সিটা। সাদা গাড়ির দরজা খুলে বিজয়াও নামে।

এদিক থেকে আস্তে আস্তে হেঁটে এগিয়ে যায় কাজরী। ওদিক থেকে আস্তে আস্তে হেঁটে এগিয়ে আসে বিজয়া। আবছায়াময় ক্যামাক ষ্ট্রীটের কালো বুকের উপর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দুই বান্ধবীর মুখ যেন হঠাৎ দেখাদেখির খুশিতে হেসে ওঠে।

কাজরী বলে—আমার আসতে আর একমিনিট দেরি হ'লে তোমার সঙ্গে দেখা হতো না।

বিজয়া—হ্যাঁ, আমি আর একমিনিট আগে চলে গেলে তোমার সঙ্গে দেখা হতো না।

কাজরী—তুমি বোধহয় জানতে না যে, আমি আজকাল এখানে থাকি না।

বিজয়া—জানতাম।

কাজরী—জানতে ? তবে···তবে তুমি এখানে, কি মনে ক'রে ···কি ব্যাপার বিজয়া ?

বিজয়া—তুমি যা সন্দেহ করছো, তাই।

কাজরী—অসম্ভব। বিশ্বাস করতে পারি না। আমি যাকে সরিয়ে দিতে বাধ্য হলাম···।

বিজয়া হাসে—আমি তাকে নিয়ে চললাম।

কাজরী—কোথায় সে ?

বিজয়া—গাড়ির ভেতরে।

কাজরী—ভুল করেছো বিজয়া।

বিজয়া—কিসের ভুল কাজরী ?

কাজরী—তুমি কি জান না বিজয়া, কেন আমি···।

বিজয়া—সব জানি কাজরী।

কাজরী—সব জেনেও কি তাকে বিয়ে করতে চাও ?

বিজয়া—বিয়ে হয়ে গেছে কাজরী।

কাজরী—কবে ?

বিজয়া—আজ।

কাজরী—যে মানুষ কারও স্বামী হ'তে পারবে না, তাকে বিয়ে ক'রে···।

বিজয়া হাসে—স্বামী হয়েই গেছে।

কাজরী—তার মানে ?

বিজয়া—তার মানে আমি গিয়ে তার স্ত্রী হ'য়ে গিয়েছি।

কাজরী—বুঝলাম না।

বিজয়া হাসে—একটু বুঝতে চেষ্টা কর।

কাজরী—এইবার বুঝলাম। ক'মাস ?

বিজয়া—দু'মাস।

কাজরীর চোখ দুটো দপদপ ক'রে হাসে—কিন্তু এ কি ক'রে সম্ভব ? তুমি তো একটা···তুমি যে নিজেকে মেয়েমানুষ বলেই মনে করতে না বিজয়া।

বিজয়া—ঠিক কথা। কিন্তু হঠাৎ একদিন মেয়েমানুষ হয়ে গেলাম।

কাজরী—কেমন ক'রে ?

বিজয়া—ইচ্ছে হলো।

কাজরী—কিসের ইচ্ছে ?

বিজয়া—একটা মানুষের আশাকে এই শরীরে পুষে রাখতে।

কাজরী—তারপর ?

বিজয়া—তারপর তাকে ভালবেসে বাঁচিয়ে রাখতে।

কাজরী—এমন চমৎকার ইচ্ছাটি কবে থেকে হলো ?

বিজয়া—সেই যে, যেদিন তুমি গিয়ে আমাকে বিরক্ত করলে··· আর জোর ক'রে আমাকে দিয়ে একটা কাণ্ড করালে।

হেসে ওঠে কাজরী—তাই বল।···কিন্তু কোথায় চললে এখন ?

বিজয়া—শ্বশুরবাড়ি।

কাজরী—এখন ?

বিজয়া—হ্যাঁ।

কাজরী—কেন ?

বিজয়া—শ্বশুর-শাশুড়ি অভিমান ক'রে তীর্থ করতে চলে যাচ্ছেন। তা'দের আটকাতে হবে।

কাজরী—কিসের অভিমান ?

বিজয়া—নাতিছাড়া জীবনের অভিমান।

কাজরী—একটা নাতি তো ছিল।

বিজয়া—সে নেই এখন। তার মায়ের সঙ্গে চলে গিয়েছে।

কাজরী—কেন ? কেতকী এখন কোথায় ?

বিজয়া—চলে গিয়েছে। কেতকীর বিয়ে হয়ে গিয়েছে।

কাজরীর হাসি আরও তরল হয়ে উল্লাসের ফোয়ারার মত কলকল ক'রে ওঠে।—বাঃ, বেশ ভাল-ভাল খবর শোনালে বিজয়া। বিজয়া ডাক্তারও তাহলে এবার থেকে স্বামী পুত্র শ্বশুর-শাশুড়ি নিয়ে একেবারে লক্ষ্মী বউটি হয়ে······বাঃ, সত্যি একটা ম্যাজিক কাণ্ড করেছ বিজয়া।

সিন্‌হা সাহেবের ফটকের আলো দপ ক'রে জ্বলে ওঠে, আর কাজরীর চোখ দুটোও একটা ধাঁধাঁর চমক সহ্য ক'রে এইবার স্পষ্ট ক'রে দেখতে পায়। হ্যাঁ, ম্যাজিকই বটে। বিজয়ার সিল্কের আঁচলটা সাদা নয়, পায়ের জুতো ধবধবে সাদা নয়, গায়ের জামাটাও

সাদা নয়। সবই রঙীন। কি অদ্ভুত সেজেছে বিজয়া। সাদা সিঁথিটার মধ্যেও সরু একটা লাল রেখা হাসছে। ফুলের মঞ্জরীর মত রঙীন হয়ে, নরম হয়ে আর লাজুক হয়ে বিজয়ার চেহারাটা মৃদু হাওয়ার দোলায় দুলছে।

বিজয়া বলে—চলি।

কাজরী—হ্যাঁ, যাও।

আস্তে আস্তে হেঁটে আবার সাদা গাড়ির দরজা খুলে যেন ভিতরের একটা নিবিড়তর রঙীন ছায়ার মধ্যে গিয়ে লুকিয়ে পড়ে বিজয়া। স্টার্ট নেয় বিজয়ার গাড়ি। কিন্তু চলতে গিয়ে হঠাৎ থেমে যায়। কারণ···।

কারণ, ক্যামাক ষ্ট্রীটের আলো আর অন্ধকারের ভিতর দিয়ে হুহু করে ছুটে এসে আর একটা গাড়ি একেবারে কাজরীর ছায়ার কাছে এসে থামে। গাড়ি থেকে নামে অজিত জীমুত আর গাঙ্গুলী।

অসিত বলে—চন্দননগরের বাড়িতে টেলিফোন ক'রে জানলাম, আপনি নেই, আপনি এখানে এসেছেন।

জীমূত—আপনি কি সত্যিই ভুলে গেছেন যে; আজ আপনার মুক্তিবিবস ?

গাঙ্গুলী—সেজন্য একটা সুন্দর উৎসরের আয়োজন করা হয়েছে, সেকথাও তো আপনি জানেন।

কাজরী হাসে--পলাতকা বলে সন্দেহ করছেন ?

অসিত—ছিঃ, কি যে বললেন ?

কাজর —কোথায় যাবেন এখন ?

অসিত—আমার নতুন বাগানবাড়িতে।

ক্যামাক ষ্ট্রীটের বুকের কালো পীচের উপর কাজরীর ছায়া; একটুও কাঁপে না সেই ছায়া। সেই ছায়াকে তিন দিক থেকে ঘিরে আরও তিনটে অনড় ছায়া; অসিত জীমূত আর গাঙ্গুলীর ছায়া। শুধু গাড়ির খোলা দরজাটা সাগ্রহ অর্ভ্যথনার ইঙ্গিত

হয়ে ঝকঝক করছে যে দিকে সেই দিকটাই খোলা ; সেদিকে কোন বাধা নেই, কোন ছায়া নেই।

কাজরী বলে—উৎসব মানে ?

অসিত—উৎসব মানে, আমরা তিনজন আর আপনি। চলুন।

তরতর করে হেঁটে আর এগিয়ে যেয়ে গাড়ির ভিতরে ঢুকে পড়ে কাজরী।

স্টার্ট নেয় অসিতের গাড়ি। চলন্ত গাড়ির চকিত হর্ষের সঙ্গে গলার স্বরের উল্লাস মিশিয়ে দিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে অসিত। বেশি দূরে নয়, যেতে বেশি সময়ও লাগবে না। এই তো···ল্যান্সডাউন পার হয়ে, থিয়েটার রোড ধরে এগিয়ে যেয়ে, বেলভেডিয়ার হাউসের প্রায় কাছাকাছি এসে একটু বাঁয়ে ঘুরে···।

বিজয়ার ড্রাইভার দুর্গাপদ বলে—এবার স্টার্ট করি দিদিমণি ?

বিজয়া—হ্যাঁ।

দুর্গাপদ—কোথায় যাবেন ?

অতীন বলে—সার্কুলার রোড ধরে সোজা শ্যামবাজার ; তারপর বেলগাছিয়া আর পাতিপুকুর পার হয়ে, যশোর রোড ধরে নাগের বাজার···তারপর একেবারে ডাইনে ঘুরে······।